যাঁহাদিগের

পুণ্য চরিত্র চিরদিনের জন্য

জীবনের আদর্শ-স্বরূপে

গ্রহণ করিতে চাহিয়াছি,

সেই

পুণ্যশ্লোক এবং পুণ্যশ্লোকাগণের

শ্রীচরণ-কমলোদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র নির্ম্মাল্যটুকু

হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

অর্পিত হইল।

বাগ্‌দত্তা

নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে চিলের অশ্রান্ত স্বর-লহরী ভাসিয়া আসিতেছে। দ্বিপ্রহরের তপ্ত হাওয়ায় ছোট ছোট চারাগাছগুলা নিতান্তই ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। ঝোপের মধ্যে নীল কাপড় পরা কচি মেয়েটির মতই অপরাজিতা ফুলকয়টি তাহাদের সবুজ বিছানার উপর যেন শ্রান্তদেহ এলাইয়া দিয়াছে,—বাতাস আসিয়া মধ্যে মধ্যে খেলার সাথীর মতই উঠাইবার জন্য, তাহাদের নাড়া দিয়া যাইতেছিল, কিন্তু নিদ্রাতুর ক্লান্ত চিত্ত ফুলগুলি সে আহ্বানে সাড়া ত দিতেই ছিল না, বরং তাহার তপ্ত শ্বাসে আরও শীঘ্র শুকাইয়া উঠিতেছিল।

মধ্যে শান বাঁধানো বৃহৎ পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর চারিধার ঘিরিয়া কলমের আম গাছ। গাছগুলায় এ বৎসর অজস্র মুকুল ধরিয়াছে। স্ফুটনোন্মুখ মুকুলদলে মধুপিপাসু মৌমাছিগুলার আনা গোনার অন্ত নাই। তাহাদের গুণ্‌গুণানি দূরশ্রুত সঙ্গীতের তানের মতই উচ্ছাস-মত্ত বাতাসের গায় ভাসিয়া ফিরিতেছিল।

সকাল হইতে বলয়-ঝঙ্কৃত কোমল কঠিন হস্তের আলোড়নের পর এই কিছুক্ষণ মাত্র পুষ্করিণীর জল একটু স্থির হইয়াছে। সমস্ত উদ্যান প্রকৃতিও সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠোত্থিত হাস্য রহস্য কোন্দল কোলাহল প্রতিধ্বনিত চঞ্চল দৃশ্যপটখানাকে অপসৃত করিয়া

একখানি শান্তির পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছিল। প্রভাতের কর্ম্মোদ্দীপনার পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মধ্যাহ্নের বিশ্রাম লক্ষ্মী যেন সমস্ত জগতের উপর একটি স্নিগ্ধ প্রশান্তি ঢালিয়া দিয়াছেন।

পুষ্করিণীর দক্ষিণ ধারে কেয়াবনের ঝোঁপের পরেই এক খণ্ড পাথরের উপর বসিয়া একটি বালক শুধু বসুন্ধরার এই বিশ্রাম নীতি অগ্রাহ্য করিয়া এক নিরীহ জীবরাজ্যে আকস্মিক বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল। বঁড়শি বাঁধা একগাছা ছিপ ফেলিয়া জলরাজ্যের অধিবাসী মৎস্যকুলকে ময়দার টোপে সে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ মৎস্যগণের নিকট বিমানবিক্ষিপ্ত লৌহ গোলক বা মেঘান্তরালস্থিত মেঘনাদের অস্ত্র-জালের মতই ইহা সাংঘাতিক পদার্থ বলিয়া পরিচিত; কেবল মূঢ়বুদ্ধি শিশুগুলাই তাহা জানে না। সেই মৎস্য দুর্ল্লভ খাদ্য আহরণ করিতে গিয়া মারা পড়ে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বালকের উৎসুক দৃষ্টি 'ফাৎনার' স্পন্দন পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া আসিল, একটি চুনা পুঁটিও তাহার সহিষ্ণুতার পুরস্কার দিতে আসিল না। মাছগুলাও নির্লোভ হইয়া উঠিল না কি! ঐ বুঝি, ফাৎনাটা নড়িয়া উঠিল, না! ঐ—ঐ যে মাছে টোপ গিলিতেছে!—ঐ যাঃ—ছাড়িয়া পলাইল!

বিরক্ত বালক ছিপগাছা আছড়াইয়া ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল। মৎস্যজাতির অকৃতজ্ঞতায় তাহার মনে ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। তপ্ত বাতাসে একবার পুষ্করিণীর সমুদয় জলটার সহিত পার্শ্বস্থিত স-কমল শৈবালদল কাঁপিয়া

উঠিল। ছায়াময় জলের স্থানে স্থানে, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া ঝিক্‌মিক করিতেছিল। চূর্ণ তরঙ্গে সেই রৌপ্য কিরণ ঝকমক করিয়া আরও খানিকটা রূপা ছড়াইয়া দিল। গাছের ডাল হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত একটা পাপিয়া অলস কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "পি-পি-পিউ কাঁহা?" ছিপটা আবার জলে নামিল।

এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল "সত্য!" ছিপধৃত হাতটার সহিত ছিপটাও নড়িয়া উঠিল,—টোপ গিলিতে উদ্যত মৃগেলশাবক চকিত হইয়া পলাইল। বিরক্তি পূর্ণ ক্ষোভে ছিপ-ধারী অধর দংশন করিয়া ছিপগাছা ভূমে আছড়াইয়া ফেলিল,—দিনটা নেহাৎই বৃথায় গেল! যে তাহাকে দূর হইতে ডাকিয়া-ছিল, সে ব্যক্তি বৃক্ষচ্ছায়াঘন তীর হইতে নামিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর ইতস্ততঃ চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "মাছ ধরে যে সুখে থাবে, তারও ত কোন লক্ষণ দেখিনে! সমস্ত দিন বসে বসে হল কি?" একে নৈরাশ্য, তাহার উপর অপমান! সত্যেন্দ্র এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কুঞ্চিত ভ্রূমধ্য হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার প্রশ্ন-কর্ত্তার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র; তারপর প্রশান্তভাবে পবন-সঞ্চালিত সলিলোপরিস্থ পদ্মপত্র-পর্য্যবেক্ষণে মনঃসংযোগ করিল।

আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া আগন্তুক ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "এত করে তোমায় বুঝিয়েও কিছু করতে পারলাম না! ছি, ছি, সত্য, তুমি নিজের ভবিষ্যৎটা একবারও ভেবে দেখচ না? চিরকাল কি এমন ছেলেখেলা করে কাটান সাজে?"

ভৎ‍র্সিত হইয়া সত্য উঠিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ ক্লান্তির সহিত গা ভাঙ্গিয়া আলস্যের স্বরে কহিল, "কেন, সকালে ত পড়েছি, কত আর পড়ব ? ঐ যাঃ, মোটে একটা বাটা মাছ পেয়েছিলুম, তাও দেখচি, চিলে না কিসে নিয়ে গেছে ! আহা-হা—"

"বেশ করেছে। ভারী খুসী হয়েচি! এখন আয় দেখি, গোটাকত অঙ্ক কষবি চল। ঐ কারা আসছেন, আমি যাই—দেরি করিসনে। আয়—"

বেলা পড়িয়া আসায় গ্রাম্য রমণীর দল কেহ কলসী কক্ষে, কেহ বা শূন্য কক্ষে দল বাঁধিয়া পুষ্করিণীতে গা ধুইতে আসিতেছিল। দূর হইতে তাহাদের চাবি, চুড়ি ও হাসির সাড়া পাইয়া মণীশ শশব্যস্তে এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সত্যেন্দ্রকে তাহার জ্যেষ্ঠের উপদেশ পালনের জন্য কিছুমাত্র ত্বরা করিতে দেখা গেল না। ছিপ প্রভৃতি মাছ ধরার সরঞ্জামগুলা নিকটস্থ কেয়াবনের ভিতর লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ সে প্রত্যাশিত নেত্রে আগন্তুক নারীদলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সেই রমণী দলের মধ্য হইতে একটি মেয়েও বহুদূর হইতে তাহার দিকে তাহারই মত উৎসুক দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল। হঠাৎ সে তাহাকে দেখিতে পাইয়া কালো আঙুরগুচ্ছের মত আপনার খাটো কোঁকড়া চুলের থর নাচাইয়া, চঞ্চল মৃগশিশুর মত সহর্ষ ধ্বনি করিয়া ছুটিয়া আসিল, "সতাদা, আজ কটা মাছ পেলে গা ?"

"ঐ রে,—পোড়ারমুখী ছিপ দেখতে পেয়েছে !" মেয়েটি একটু কাছে আসিলে সে মুখ ভার করিয়া কহিল, "তুই সারাদিনের

মধ্যে একবারও এলিনে কেন, বাঁদ্‌রি? যা মাছ ধরেছিলুম, সব চিলে নিয়ে গেল। আমি মাছ ধরব, না, চিল তাড়াব? আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'কটা মাছ পেলে গা'!"

মেয়েটির নাম বাঁদ্‌রি নয়;—গৌরী। গৌরী এই উচিত তিরস্কারে লজ্জিত হইল না, বরং সে ইহাতে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিল, বলিল, "আচ্ছা, বল দেখি, ক'টা মাছ চিলে নিয়েছে?"

এই অবজ্ঞার হাসি ও প্রশ্ন, কোনটীই আজিকার সমস্ত দিনের জলযুদ্ধে পরাজিত নায়কের ভাল লাগিল না। তখনই সে রুষ্ট তর্জ্জনের সহিত খিঁচাইয়া উঠিল।

"তবু বলই না, শুনি।"

"দশটা।"

"দশটা—ইঃ! দশ থেকে ১টা বাদ দিলে যা থাকে, তাই বুঝি? ঠিক বল দেখি, সত্যদা?"

সত্য ছিপটাকে লইয়া শূন্যে আস্ফালন করিয়া বেশ একটু জোরেই তাহা বিদ্রূপকারিণীর পৃষ্ঠে ছপাৎ করিয়া বসাইয়া দিল, "এই যে, দেখাচ্চি, কটা! আর চাই?"

যদিও এই কৃত্রিম কশা গৌরীক আপনার প্রভাব বেশ একটু জানাইয়া দিয়াছিল, তথাপি নিজের গৌরব-রক্ষার খাতিরে সে হাসিয়া উঠিয়া অম্লান স্বরে কহিতে লাগিল, "বেশ, বেশ, মারো না, যত খুসী, মারো,—আমার ত আর হাত নেই? আমি ত শোধ নিতে জানিনে? এক, দুই, তিন, চার,—আচ্ছা, তোলা রইল!"

এতক্ষণে অন্য রমণীগণ ঘাটের পাড়ের নিকট আসিয়া পৌছিয়া

ছিলেন—তাঁহাদের দলে সকলেই প্রায় প্রবীণা বা প্রৌঢ়া, যে দুই এক জন যুবতী ও বালিকা ছিল, তাহারা সকলেই দেশের 'ঝিউড়ি-ছেলে।' বসমের কোন অংশের সহিত মস্তকের কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়োজন তাহাদের ছিল না। যে দুইএকটি বধূ ছিল, তাহারও কিশোর বালক সত্যকে দেখিয়া বক্ষলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনের মাত্রা বর্দ্ধিত করিল না। কারণ পাড়ায় এমন কোন বধূ ছিল না, যাহার জন্য গাঙ্গুলিদের 'পাগ্‌লা সতু' একদিন না একদিন ফলটা আস্‌টা সওগাত সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একখানা লেচিভোর মাখা ময়দা, বা একটা পানের খিলি বা এমনই কিছু না কিছু সামগ্রী আদায় করিয়া আনিয়াছে। এই দলের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা ও বধূ ছিলেন। গৌরীর মাতুলানী তাঁহার ননন্দাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওগো দেখ, মেয়েটাকে চাবুক পেটা করে দিলে! যেমন দস্যি মেয়ে তা হবে না ত কি? বেশ হয়েছে।"

কথাটা সত্য এবং গৌরী দুই জনেরই কানে গেল। ফস্‌ করিয়া ছিপটা সত্যর হাত হইতে টানিয়া লইয়া, গৌরী তাহার ডগাটা দিয়া তৎক্ষণাৎ ধাঁ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর পৃষ্ঠে একটা গুরুরকম আঘাত বসাইয়া হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুট দিল। "কেমন মজা,—এখন? আমায় চাবুক পেটা করা অমনি মুখের কথা কি না!"

ছেঁড়া গেঞ্জির ভিতর দিয়া পিঠের উপর আঘাতটা বেশ ভাল করিয়াই পৌছিয়াছিল। আচম্‌কা আক্রান্ত হওয়ায় আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ সত্য নিতান্তই অপমানিত বোধ করিয়া রাগিয়া

গেল। পিঠে একবারমাত্র হাত বুলাইয়াই সে তাহার দিকে ছুটিল। "রোস্ ত বাঁদরমুখী, দেখাচ্ছি তোকে,—এত জোরে কি আমি তোকে মেরেছিলুম ?—কক্ষন না।"

ছুটীতে ছুটীতে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া গৌরী তর্জ্জন করিয়া উঠিল. "না, বই কি ! নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি,—বা—রে ছেলে !"

বাগানটাকে চক্র দিয়া যতক্ষণপারিল, দুইজনে ছুটিল ; তারপর গৌরী স্বেচ্ছায় শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবু, না হয়, তুমিও আমাকে তেমন জোরেই মার, তা হইলেই ত শোধ যাবে ?"

সত্য কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি আলেকজন্দরের চেয়ে কিছুমাত্র অল্প মহত্ত্ব প্রদর্শন করিল না। একটু পরে দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে যখন পুকুরধারে ফিরিয়া আসিল, তখন ছায়া-নিবিড় বন-বীথির উপর হইতে সশঙ্ক সান্ধ্য অন্ধকার মৃদু চরণে জলের উপর নামিয়া আসিতেছিল। পল্লী-কামিনীগণ ভরাকুম্ভে যে যাহার গৃহ-পথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কেবল আর্দ্র বসনে কুম্ভকক্ষে দাঁড়াইয়া একটী রমণী চারিদিকে উৎকণ্ঠাদিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছেন, "রাণি !"

সত্যর হাত ছাড়িয়া দিয়া গৌরী ছুটিয়া তাঁহার কাছে আসিল, "তুমি এখনও বাড়ী যাওনি মাসিমা ? গেলেই হত, সত্যদা না হয় আমায় পৌঁছে দিত।"

মাসিমা একটিও তিরস্কারের ভাষা প্রয়োগ না করিয়া সেই মৃগশিশু-চঞ্চলাকে আপনার কাছে টানিয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "চল মা, বাড়ী যাই দেরী হয়ে গেছে।"

২

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে গ্রামের 'মেরুদণ্ড' বলিয়া পাঁচজনে আখ্যা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি ছিল না। বিদ্যাবুদ্ধিতে ত বটেই, তাহা ছাড়া সহৃদয়তার জন্যই তাঁহার খ্যাতি দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামান্তরের যে কোন বিবাহ সভায় বা রোগশয্যা পার্শ্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্ভুল নিমন্ত্রণ হইত। সন্তান বিয়োগ কাতরা জননী ও সদ্য বিধবার সান্ত্বনার ভার যেন তাঁহারই ইজারা ছিল। দুঃখের কারণ ভুলাইয়া দুঃখকে দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া আশার দ্বারা দুঃখকে সহনীয় করিয়া তিনি দুঃখের মূল চিত্তটাকে শুদ্ধ উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সকল স্থানেই যে কিয়ৎপরিমাণে সফলও না হইতেন, এমন নহে।

আশ্রম নিয়ম যাহা ভারতবর্ষ হইতে বহু দিন বিদায় লইয়া কাল সমুদ্রের তরঙ্গে মিশিয়া লোপ পাইয়াছে, তাহারই পুনরাবর্ত্তন প্রয়াস করিয়া উমাকান্ত আপনার অধ্যয়ন কাল পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে কাটাইয়া অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার পর দূর পল্লীগ্রামের হরিকিঙ্কর ন্যায়তীর্থের কন্যা গঙ্গামণিকে বিবাহ করিয়া যখন গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তখন সরস্বতীর পাশে গৃহলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠাই করা হইল মাত্র, গৃহ যে লক্ষ্মীহীন সেই লক্ষ্মীহীনই হইয়া রহিল। অভাব পূর্ণ হইল না, বরং কিছু বাড়িল।

তখনও দেশ হইতে পাণ্ডিত্যের আদর এতখানি কমিয়া যায় নাই। বিবাহে, উপনয়নে, আদ্য এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়টা গৃহস্থগণ তখন বিশেষ কল্যাণকর মনে করিতেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেজন্য অর্থাভাব ছিল না, বরং নূতন বস্ত্র ও

পিতলের ঘড়ায় ছোট কুঠ্‌রিটি সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। কিন্তু যখনই কোন গরিব পিতার কন্যাদায়ে অথবা পুত্রের পিতৃ-কর্ত্তব্য পালনে অনাটনের সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইত, তখনই টোলবাড়ীর ছেলেদিগকে ভাতে-ভাত খাইয়া দিন গুজরান করিতে হইত। অধিকাংশ দিনই পাক-কারিণী গঙ্গামণির জন্য হাঁড়িতে একটি ভাতের দানাও অবশিষ্ট থাকিত না।

রাজগৃহ হইতে সভাপণ্ডিতের পদ ও বিদ্যালয় হইতে অধ্যাপকত্ব গ্রহণের জন্য বার কয়েক আহ্বান আসিয়াছিল। সে সব পূর্ব্বেকার কথা। এখন উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রবীণ হইয়াছেন। ব্রহ্মতেজে দীপ্ত শরীর যদিও এখনও জরার করস্পর্শে হীনতেজ হয় নাই, শরীরের মত মনের উপরও অবসাদ বা ক্লান্তি তাহার সর্ব্বনাশি ছায়াপাত করিতে সাহস না পাইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, তথাপি উপযুক্ত পুত্রের হস্তেই এখন তিনি নিত্য অধ্যাপনার ভার দিয়া পর হিত সাধনের অবসরই বাড়াইয়া লইয়াছেন!

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভক্তিনাথ পিতৃ-নির্দ্দেশানুসারে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ৺কাশীধাম হইতে ন্যায়ের প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ও পিতৃ-প্রদর্শিত মার্গ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত সমাজে বরণীয় হইয়াও উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ছোট ছেলে শচীকান্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্ম লইলে যে ভাগ্য বহন করা এ দেশের ঋষি-গঠিত আইনের আদেশ এবং যে বিলাস বর্জ্জিত সহজ সরলতার বলে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেণীর উর্দ্ধে আসন বিস্তার করিয়াছিলেন, শচীকান্তের স্বভাবের মধ্যে সেই জিনিস-

টারই সব চেয়ে অভাব ছিল। ভোগ সুখটাতেই পরমার্থবোধ থাকাতে উচ্চ পদে ও উত্তম আহার-বিহারে যে একটা প্রবল স্পৃহার আবির্ভাব হয়, সেইটুকু জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াই সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

ছেলে বেলা হইতেই ভক্তিনাথ বিনীত, স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতি এবং কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু শচী কোন মতেই দারিদ্র্য-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিত না। মোটা চাল চলনে চলিতে সে একেবারেই নারাজ। ইহা লইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইতে কোন দিনই সে কুণ্ঠিত ছিল না। ইহার ফলে জীবনযাত্রার পাথেয় সংগ্রহে সে যে অধিকতর সফল হইয়াছিল, তাহাও নহে। খাটো রাঙ্গা পেড়ে শাড়ীর অঞ্চলে চোখের জল নিঃশব্দে মুছিয়া ফেলা ভিন্ন গঙ্গামণির আর ইহাতে কিছুই লাভ হইত না। শচীর জন্য একটা অতৃপ্তি তাঁহারও মনের মধ্যে সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিত। বড় হইয়া শচী বলিল, সে সংস্কৃত পড়িবে না, ইংরাজী পড়িবে; এবং ইহার স্বপক্ষে এমনই জিদ ধরিয়া পড়িয়া রহিল, যে নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পিতাকে অবশেষে সম্মতি প্রদান করিতে হইল। প্রসন্ন মুখ ঈষৎ চিন্তাগ্রস্ত করিয়া তিনি কহিলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে.—অনাচারী অব্রাহ্মণ হয়েই যখন জন্মেছে, তখন তাকে কে বাধা দেবে? যাক্, ওর প্রারব্ধের পথেই ও যাক্।"

ইংরেজি পড়া চলিল। গ্রামের পর নিকটবর্ত্তী সহরে, এবং পরে কলিকাতায় সে বিদ্যা ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। এখন সে কলিকাতার মেসে কলেজের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী ইতঃমধ্যেই তাঁহার প্রবেশদ্বার মুক্ত করিয়া এই ভক্তটিকে

আপনার কনক মন্দিরে ডাকিয়া লইয়াছিলেন। চোখে সোণা বাঁধানো চশমা এবং ঘরের মধ্যে একটি বক্স হারমনিয়মই তাহার সৌখীনত্বের যথেষ্ট পরিচয় নহে, মরক্কো চামড়ায় বাঁধা সোণার জলে নাম ছাপান ছোট খাতাখানির প্রতি পৃষ্ঠা নূতন ছন্দে ও ভাবে পূর্ণ হইয়া এক দিকে তাহার সুভব্য রুচি ও অপর দিকে কবি-যশঃপ্রার্থী হৃদয়েরও সন্ধান বলিয়া দেয়। শচীকান্ত আধুনিক হরি, মধু, বিপিনের মত নিতান্ত নিরাশ-কবিও নয়; বন্ধু মহলে তাহার কাব্যাদি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিত; এবং তাহার মত একজন ক্ষমতাশালী বন্ধুলাভে যে তাহারা গৌরবান্বিত, এমন কথাও সদাসর্ব্বদা তাহারা উচ্ছ্বসিত চিত্তে ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করিত না।

তাহার স্বভাবগুণে গঙ্গামণি বা তাঁহার কন্যারাও তাহাকে একটু বিশেষভাবে দেখিতেন। ঘরের ছেলেটির সহিত তাহাকে অনেকখানি তফাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। "ভক্তি 'দুধ্‌চেটে' আছে! গাই দুধ দেয়নি, 'পলা রত্তি' দুধ,—ও শচীকেই দাও ওর আর কাজ নেই।" মাও এই কথা বলিতেন। মার দেখাদেখি দিদিরাও বলেন, "ছেঁড়া নেপথান্ দাদার থাক্—শচীর কষ্ট হয়, নতুনটা ওকেই দি।" কাজেই সে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া বসিয়াছিল, সুখ এবং সৌভাগ্য যাহা কিছু, সে সব তাহারই পাওনা! যদি তাহার কোনটা পাইবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা ঘটে, তবে তাহা লোকের দোষ। পিতা কখনও তাহার সম্বন্ধে কোন বিষয়েই তদ্‌গত ছিলেন না, আজও নয়। ছেলে ভাবিত, সংস্কৃত জানা লোকের চিত্ত পৃথিবীর উচ্চ ভাবসমূহের ধারণায় অক্ষমতাহেতু

সঙ্কীর্ণ, এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহার উচ্চশিক্ষিত পুত্রকে ঠিক মত ধারণা করিতে পারেন না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে সহাধ্যায়ী মণীশ বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু শচীকান্ত এবার ছুটীর প্রথম দিকটায় আপনার সৌখীন বাসাঘরখানির মায়া ছাড়িতে পারে নাই। মণীশ আসিবার সময় অনেক বলিয়াছিল, সঙ্গে আনিতে পারে নাই।

মণীশ লোকটি আবার সকল বিষয়েই তাহার বন্ধুর বিপরীত। যদিও সে শিক্ষায় দীক্ষায় শচীকান্তের চেয়ে হীন ছিল না, তথাপি নিজের সেই সাধারণ দুর্ল্লভ শক্তিকে সে তাহার মত দর্পিত বিস্ময়ে বরণ করিয়া লইতে সক্ষম হয় নাই। বরং নিজের সহস্র ছোট খাট অক্ষমতার খুঁৎ টানিয়া আনিয়া তাহাতেই সে লজ্জায় খিন্ন হইত! এক দিকে যেমন সে পরোপকারী, সহৃদয়, অন্য দিকে আবার তেমনই মুখেচোরা লাজুক। তাহার এই নারী প্রকৃতি তাহার সঙ্গী সহচরদিগের নিকট পদে পদে তাহাকে অপ্রতিভ ও হাস্যাস্পদ করিবার বেশ একটু সঙ্গীন রকমের উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের অনেকের নিকট হইতে সে যে সকল পত্র পাইত, তাহাতে সম্বোধনপদে তাহার নামের ঈষৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া মণীশের পরিবর্ত্তে, 'মনীষা'—এই নারীজনোচিত পাঠ দেওয়া থাকিত। মণীশ ইহার বিরুদ্ধে দুই একটি ক্ষীণ প্রতিবাদ মাত্র তুলিয়াই নিরুপায়ে আরক্ত গণ্ডে চুপ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের বিদ্রূপকুশল লিপিযুদ্ধে সে নিরস্ত্র, নিরীহ,—পারিয়া উঠিত না। কাজেই নামটা বন্ধুমহলে ক্রমশঃ বিস্তার লাভই করিতেছিল। বলা বাহুল্য, এই কলির শিখণ্ডীপদে তাহাকে আরূঢ় করাইয়াছিল, তাহার আশৈশব-বন্ধু, কবি শচীকান্ত।

দ্বিপ্রহরের খর তীব্র রৌদ্রতেজে ঘরের ভিতর অবধি তাতিয়া উঠিয়াছিল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া রৌদ্রতপ্ত হাওয়া মধ্যে মধ্যে বকুল ফুলের ক্ষীণ গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। দেওয়ালের একটা বড় ফাটলের ভিতর হইতে কপোতের বিশ্রামকুজন স্বপ্নলোকের পার হইতে ভাসিয়া আসা ধ্বনির মতই শুনাইতেছিল। এমন সময় ছাতা মুড়িয়া কোঁচার কাপড়ে ঘাম মুছিতে মুছিতে শচীকান্ত মণীশের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া ডাকিল, "মণীশ আছিস ?"

মণীশ ঘরেই ছিল। জানালার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিল মুখ ফিরাইল "এস, এস,—কবে এলে ?"

"আজই। কি করচিস্ ? দপ্তরখানার দলিলের মত, কি ওগুলো ?"

মণীশ উঠিয়া ঘরের একমাত্র চৌকিখানা বন্ধুর দিকে সরাইয়া দিয়া মৃদু হাসির সহিত জবাব দিল, "ওগুলো দলিলই বটে। কাকা মেলাতে দিয়েছেন।"

শচী কহিল, "কল্‌কেতা গিয়ে তুই তবু বেঁচেছিস। কতকগুলো বাজে খাটুনি খাটতে হয় না।"

মণীশের সঙ্গে বন্ধুর এইখানেই বিরোধ। শচীকান্ত যে সমস্ত বিনয় বাধ্যতার গণ্ডী ছাড়াইয়া নিজের প্রতি সাহঙ্কার সহানুভূতিতে চাহিয়া দেখিত, মণীশকে তাহা শুধু আঘাত দিত, এমন নহে, আতঙ্কিতও করিত। বন্ধুর সমালোচনায় ঈষৎ ব্যথিত হইল এবং বলিয়া উঠিল, "ভালটা কি হয়েচে ? আমি থাকি না, সত্য ছেলে মানুষ, কাকার নিজেকেই সব করতে হয়।—তুমি এতদিন সেখানে বসে বসে কি করছিলে ?"

শচীকান্ত কহিল, “ছিপ ধরে দেখছিলুম, বঁড়সিতে মাছটা গাঁথে কি না!”

“সত্যর মত” তারপর কি হল? গাঁথল? না, বসে থাকাই সার হল।”

“গাঁথে-গাঁথে, এমন সময় দাদার জোর তলব গেল। আর গঁাথল না!”

মনীশ হাসিয়া কহিল, “সত্যও ঠিক এই কথা বলেছিল! না, না, সত্যি,—ব্যাপারখানা কি, খুলেই বল না। ছুটীতে বাড়ী আসতে ইচ্ছে হয় না? এ বড় আশ্চর্য্য!”

“আচ্ছা, বলছি, শোন। কিন্তু দেখো, এখন কাউকে কিছু বলে ফেলো না যেন। আমাদের মেসের দুটো বাড়ী উত্তরে একটা হল্‌দে রঙের বাড়ী আছে, দেখেচ?”

“হ্যাঁ, কোন্ এক ডাক্তারের বাড়ী সেটা, শুনেছি। নামটা কি, মনে নেই, কি যেন মুখুয্যে—?”

“নিখিল মুখুয্যে, ডাক্তার। তার একটি বোন আছে। মধ্যে মধ্যে জানালায়, বারান্দায়, সে কাপড় তুলতে বা রাস্তার কোন হুজুক দেখতে এসে দাঁড়ায়, দেখেছিস?”

মনীশ আরক্ত হইয়া উঠিল। কোন্ গৃহ-বাতায়নে কোন্ কুতূহলী ভদ্রমহিলা অবস্থিতি করিতেছেন, সে খপর সে কি দরকারে রাখিতে যাইবে?

“তবে তুই বুঝতেই পারবি নে।”

এই বলিয়া শচীকান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল! “সে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য-প্রতিমা! বিশ্বের সমস্ত

কবিকুঞ্জ ত্যাগ করে কাব্যলক্ষ্মী সেই ছোট্ট বাড়ীখানার মধ্যে তাদের কি পুণ্যে যে আবির্ভূতা হয়েছেন, তা ভেবেই পাইনে। এখন খুব মজা হয়েছে—সেই কথাই বলছিলুম—তার ভাই তাদের সেই কোহিনুরটিকে আমার হাতে দান করতে চায়। আর বুঝতেই পারছ, এমন হস্তিমূর্খ পৃথিবীতে কেউ নেই যে, করতলাগত রত্নকে ত্যাগ করে।"

মণীশ সবিস্ময়ে তাহার স্বপ্ন বিভোর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, পরে কহিল, "সে কি? তারা যে মুখুয্যে! নিশ্চয়ই তাহলে রাঢ়ী শ্রেণী হবে?"

"ধরে ফেলেছ? ঐ ত! ঐখানেই ত হচ্চে, মজা! ওরা মনে করেছে আমি রাঢ়ীশ্রেণী। তা হোক, তাতে ক্ষতিটাই বা কি? কেন, রাঢ়ীবারেন্দ্রে বিয়ে চলে, এটা কি সমাজের পক্ষে শুভ নয়?"

মণীশের মুখ অসাধারণ বিবর্ণ হইয়া আসিল,—সে কম্পিত অধরে উত্তর দিল, "শুভ বই কি। কিন্তু এ কি তাই? মিথ্যা দিয়ে এত বড় কাজটা তুমি করতে চাচ্ছ! যখন তারা জানতে পারবে যে তুমি তাদের ঠকিয়েছ—! উঃ, কি সর্ব্বনাশ! না, না, তুমি ঠাট্টা করচ, বোধ হয়? এত বড় জুয়াচুরি কি করতে আছে?"

শচীকান্ত এবার ঈষৎ বিরক্ত হইল, মণীশের এতটা বাড়াবাড়ি কোন দিনই তাহার ভাল লাগিত না, আজও লাগিল না। বিদ্রূপে বিরক্ত ভাব ঢাকিয়া সে বলিল, "জুয়াচুরি কি? জাহাঙ্গীর নুরজাহানের জন্য কি করেছিল?"

"সেই কি সাধুতার উদাহরণ?"

"না হোক, এতে ধর্ম্মতঃ কোন পাপ হয় না।"

মণীশ কিন্তু এ কথা কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে ভাবিয়া বলিল, "তোমার বাবা মত করবেন কি? তিনি ত কিছু লুকোবেন না। তার চেয়ে তাঁকেই কেন সব বল না। তিনি জ্ঞানী লোক উচিত বোধ হয়ত তাদের বুঝিয়ে মত করাতে পারেন। এ যদি হয়, তাতে সমাজেরও মঙ্গল বটে।"

শচীকান্ত আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কোঁচাটা ঠিক করিতে করিতে বিরক্তির সহিত হাসিয়া উত্তর দিল, "ক্ষেপেচ! তিনি কোন মতেই মত দেবেন না। বিয়ের পর তখন তাঁকে বলব। এখন ঘুণাক্ষরেও না। তারা জানে, আমার কেউ নেই। তা এখন আমি চল্লুম।"

মণীশ বিস্ময়বেদনাবিস্ফারিত দুই চক্ষু তীব্র ভর্ৎসনায় পরিপূর্ণ করিয়া বন্ধুর দিকে চাহিল, পরে ধিক্কারের সহিত কহিল, "ছি, শচি!"

৩

হরিনারায়ণ ও শিবনারায়ণ ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া দেশের লোক সবিস্ময়ে ত্রেতা যুগের রাম লক্ষ্মণ, ও দ্বাপরের পাণ্ডবগণকে স্মরণ করিত। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত নিতান্ত সামান্য নহে।

হরিনারায়ণ বয়সে বড় হইলেও উপার্জ্জনে শিবনারায়ণই বড় হইতে পারিয়াছিলেন। তাই বলিয়া যে হরিনারায়ণ তাঁহার কনিষ্ঠের চেয়ে জ্ঞানবুদ্ধিতে খাটো ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ইংরাজি বিদ্যা শিখেন নাই। ইহার গৌণ কারণ, ইংরাজি শিক্ষা এখনকার মত তখন গ্রামবাসীদিগের পক্ষে সহজ লভ্য ছিল না।

কিন্তু আসল কারণ, স্বদেশী ভাষার প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ। পাছে ইংরাজি শিখিতে গিয়া সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয়,—যেমন সে সময় অনেক নব্য ইংরাজিওয়ালাদের মধ্যে ঘটিতেছিল—সেই ভয়ে তিনি, কৌতূহল সত্ত্বেও ঐ জনমুগ্ধকারী অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার প্রয়াস পান নাই। কিন্তু শিবনারায়ণ যখন মস্তকে শিখা রাখিয়া ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া, "সংর্ঘেঘঃ" প্রভৃতি মুগ্ধবোধের সূত্র এবং "অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা যাত্রাকালে তু মধ্যমা" ইত্যাদি জ্যোতির্বচনাদি মুখস্থ করিতে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া ছিলেন, তখন জ্যেষ্ঠের আদেশ হইল, "কাল থেকে তুমি ইংরাজি পড়তে আরম্ভ কর।" এ আদেশ কনিষ্ঠ শিবনারায়ণের নিকট তেমন স্নেহ সম্ভাষণ বলিয়া মনে হয় নাই—তাই ব্যথিত বিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, দাদা ?"

"ভেবে দেখলাম, আজকালকার দিনে শুধু দেবভাষায় চলবে না। তোমার চিরদারিদ্র্যে থাকবার ব্যবস্থা আমি কেমন করে দেব ?" শিবনারায়ণ আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

হরিনারায়ণ নিজের অল্প আয় হইতে পয়সা বাঁচাইতে সুরু করিলেন। সামান্য ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজ তাঁহাদের ছিল, তাহার আয় হইতে মোটা ভাত কাপড়ের অনাটন পড়িত না। এমন কি সম্বৎসরের খরচ চালাইয়া বড় বধূর জন্য রূপার দুই গাছি পৈঁছা ও সোণার পাঁচনর একছড়াও গড়ান হইয়া গিয়াছে, দুইটি ঢেঁড়ি ঝুম্‌কা যা তাঁহার পাইতে বাকী।

কিন্তু এই সময় হঠাৎ বৌঠাকুরাণীর ঝুমকা পরার সাধে বাদ পড়িল। এমন কি পাঁচনর ছড়াও দেবদারু কাঠের সিন্দুকের

মধ্য হইতে বাহির হইয়া পোদ্দারের কাছে যাচাইয়ের জন্য চলিয়া গেল। কারণ শিবনারায়ণকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য হরিনারায়ণের কিছু মোটা টাকার প্রয়োজন।

যাহা হোক্ সস্ত্রীক অর্দ্ধাহারে থাকিয়াও দাদা ছোট ভাইকে পড়ার খরচ নিঃশব্দে জোগাইয়া চলিলেন, ইহার জন্য যতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল, একদিনের জন্যও ক্লান্তি বোধ করিলেন না; মনে একমাত্র আশা, শিবু মানুষ হইলে তাঁহার সকল দুঃখ ঘুচিবে।

এরূপ স্থলে সাধারণতঃ বিপরীত ফলই ফলে—কিন্তু হরিনারায়ণের সুকৃতির বল ছিল। ছোট ভাই শিবনারায়ণ পড়াশুনা শিখিয়া কৃতী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কৃতিত্বের যে প্রধান বিভূতি তাহা লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার না উঠিল চোখে চশমা, না পড়িল পেলিটির হোটেলে পায়ের ধূলা।—এমন কি দোলাই গায়ে, চটি পরা, পাড়াগাঁয়ে দাদা, ও হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া ব্যতিব্যস্ত মলিন বসনা বৌদিদির পায়ের ধূলা সগর্ব্বে মস্তকে লইতে তাঁহার এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ দেখা গেল না।

তখনকার দিনে পাশ করা ছেলেদের জীবনযাত্রা এখনকার মত সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়ায় নাই। শিবনারায়ণ বেশ মোটা মাহিনায় সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে একটা চাকুরি লাভ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল দাদা প্রথমে স্নেহের ভাইকে কিছুতেই স্নেহহীন দূর দেশে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু শেষে চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা দেবদেবীগণের মাঙ্গল্য ও নিজের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদের সহিত অশ্রুরুদ্ধ নয়নে শূন্য হৃদয়ে তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া

দিলেন। বৌদিদি ঠাকুরপোকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস না করিয়া তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে ঠাকুরপোর সংসার দেখিতে হয় নাই। শিবনারায়ণের বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তার পর সহসা একদিন হরিনারায়ণেরও ডাক পড়িল—কিন্তু তখন আর তাঁহার মনে সেই দ্রুত আহ্বানের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ জাগিল না। সোণার সংসার ধনে মানে যশে পূর্ণ হইয়া মা কমলার কৃপা কটাক্ষে উথলিয়া উঠিতেছিল। ঠাকুর দালানে প্রতি বৎসর মার মূর্ত্তি সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। বার মাসে তের পার্ব্বণ, কিছুই ফাঁক পড়িতেছে না। মেটে দালান কোটায় পরিণত,—বধূর অঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত। তবে আর কিসের কষ্ট? মণীশের মা প্রতি রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, 'কত দিন আর একা ফেলে রাখবে?' শুধু বালক মণীশ? তা সে ভাবনা তাঁহার নহে, শিবুর।

জাহ্নবী সলিলে রোগীর অধো-অঙ্গ আবৃত; চারিদিকে বন্ধুগণ তারক-ব্রহ্ম নাম ডাকিতেছে; শিবনারায়ণ কাঁদিয়া ডাকিলেন, "দাদা—"

"ভাই!"

"আমি যে কিছু জানিনে, দাদা, আমি কি করব?"

শোকাতুর ভ্রাতার হাত ধরিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে দাদা কহিলেন, "ভয় কি ভাই! আমার বদলে এই যে তোমার সার্ব্বভৌম মশায় রইলেন, তিনি তোমায় দেখবেন,—আর যিনি সবাইকে দেখেন, তিনি ত আছেনই। ভয় কি?"

পুত্র মণীশের কথা হরিনারায়ণ একবার মুখেও আনিলেন না।

বরং কোন সুহৃদ্ একবার ইহার উল্লেখ করিলে তিনি ঈষৎ উত্তক্ত চিত্তে কহিলেন, "ওদের খবরে আমার কাজ কি? সে শিবু বুঝবে। আমায় এখন খুঁজতে হবে, যে নৌকায় পা'র হব, তার কড়ির জোগাড় আছে কি না!"

বলা বাহুল্য, হরিনারায়ণ ভ্রাতার প্রতি যে বিশ্বাস পোষণ করিয়া নিজের সন্তানের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, সে বিশ্বাস কখনও ভঙ্গ হয় নাই। মণীশ ও সত্য করুণাময়ীর দুই কোলেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, শিবনারায়ণ ঘরে ফিরিয়া মণীশকে বুকে তুলিয়া লইলেন।

তারপর হইতে অল্প লোকেই জানিল যে মণীশ শিবনারায়ণের নিজের সন্তান নয়। এমন কি দূরস্থ প্রতিবেশিদের মধ্যে কেহ কেহ বাটী আসিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মণীশের চেয়ে কনিষ্ঠ সত্যর প্রতি অযত্ন দেখিয়া তাহাকেই হরিনারায়ণের পুত্র বোধে আড়ালে গিয়া বলাবলি করিয়াছে, "ওমা, এরই এত ধন্য, ধন্য! বুড়ো ছেলেকে ট্যাঁকে করে ঘুরচে,—কচি ছেলেটার পানে একবার তাকিয়েও দেখে না!" কানে কানে কথাটা করুণাময়ীর কানে উঠিলে ঈষৎ হাসিয়া তিনি শুধু মণীশকে চুম্বন করিলেন, কিছু বলিলেন না।

বড় হইয়া মণীশ দেখিল, সে তাহার ছোট ভাই সত্যর প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া ফেলিয়াছে। কাকাবাবু ও খুড়িমার বাৎসল্য রসের সবটুকু সে একাই ভোগ করিয়া লইয়াছে। বাড়ীর মধ্যে ভাল ঘরটা হইতে গাছের বড় আমটা পর্য্যন্ত সমস্ত ভাল জিনিষই তাহার পাওনা। সত্যর মায়ের কোল ও বাপের অবসরটুকু পর্য্যন্ত তাহারই ইজারা করা। মনে মনে সে একটু কুণ্ঠিত হইল। কিন্তু

কৃতজ্ঞতা কি জিনিষ, এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতা কেমন করিয়া জানাইতে হয়, এ বংশের সন্তান তাহা জানিত। মণীশ অন্তরের অন্তরে ভক্তি বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া, দেবোদ্দেশে সাধকের মত, তাহার জীবন্ত দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশে সহস্র বার প্রণাম করিল।

সে বেশী কথা জানিত না। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা বা শ্রদ্ধা ভক্তি রচনা জালের আশ্রয় অপেক্ষা করে না। আকাশঘেরা মেঘের মধ্য হইতেও দিনের আলো পাখীর ঘুমন্ত নীড়ে জগৎ-জাগানো গান পাঠাইয়া দেয়। শিবনারায়ণ ও করুণাময়ীও তেমনই এই শান্ত বিনীত বালকের ডাগর চোখের মৌন কৃতজ্ঞতার পাশে বালককে দিনে দিনে কঠিনতর বন্ধনে জড়াইয়া ফেলিতেছিলেন। শিশু মণীশ কৈশোর অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে এখন খুল্লতাতের সহকারী হইয়া উঠিয়াছিল। এত দিনে শিবনারায়ণ তাঁহার এই সুশিক্ষিত ভ্রাতুষ্পুত্রটির মধ্যে অপসৃত ভ্রাতার পুনরাবির্ভাব দেখিতে পাইয়া গভীর শোকে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। মণীশের বিনয় নম্র করুণ মূর্ত্তি তাঁহার চিত্ত দর্পণে তাঁহার দাদারই অন্তর্বাহ্য সদ্‌গুণাবলীর পূর্ণ ছবি ফুটাইয়া তুলিত; আর উচ্ছ্বাসে তাঁহার স্নেহ কাতর দৃষ্টি সহসা স্নেহাধারের মুখের দৃশ্যটুকুকে ঝাপ্‌সা করিয়া ফেলিত। শিবনারায়ণ সুগভীর নিশ্বাসের সহিত আপনার মনে কহিতেন, "আহা, আজ যদি দাদা বৌদি থাকিতেন!"

সত্যর সম্বন্ধে তাহার পিতা মাতা একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। শিবনারায়ণ জানিতেন, মণীশকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহার ইহসংসারের কর্ত্তব্যের বোঝা বহা শেষ হইয়া যাইবে। বাকী কাজগুলা মণীশ করিবে; সে দায়িত্ব তাঁহার নহে। করুণাময়ীর

মনেও এ বিষয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না, ভাস্বরপোর উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাস। দুরন্ত দাম্বাল শিশুকে যখন তাঁহার সাংসারিক কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, তখন ব্যস্ত হইয়া মণীশকেই তিনি ডাকিয়া বলিতেন, "বাবা মণি! তোমার ভাইটিকে একবার নিয়ে যাও ত ধন,—কোন কাজ করতে দেয় না।"

এখনও তাহার নামে যে সমস্ত নালিশ ফরিয়াদ করিতে হয়, শিবনারায়ণের পরিবর্ত্তে তাহা তিনি তাহারই নিকট করেন। মণীশও বরাবর তাহার সমস্ত উপদ্রব অত্যাচার অম্লান মুখে সহিয়া আসিয়াছে। 'ভাই মেরেছে, কাঁদতে নেই', কাজেই শিশু সত্যর নিষ্ঠুর প্রহারগুলা বালক ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া সহ্য করিয়াছে।

কিন্তু এখন আর শুধু সহিবার দিন নাই। মণীশ দেখিতেছিল, তাহার কলিকাতা বাসের সুযোগে সত্য পড়াশুনায় একান্ত অমনোযোগী হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার কাপড়ের কোঁচার অংশটাকে পালোয়ানের মত করিয়া জড়াইয়া, হাতে একগাছা বাঁখারি-চাঁছা ছিপ লইয়া কিম্বা ঘুড়ির লাটাই দুলাইতে দুলাইতে ও পাড়ার হরে যুগী বা মাধ্না তেলির সঙ্গে পুকুর ঘাটে কি ভুলুনির ডাঙ্গায় হৈ-হৈ করিয়াই দিন কাটাইয়া দেয়। দেখিলে মনে হয়, যেন সরস্বতীর সঙ্গে সে বৈমাত্রেয় সম্বন্ধের চেয়েও কোন দূরতর সম্পর্ক পাতাইবার মৎলব আঁটিয়াছে!

করুণাময়ী কহিলেন, "বাবা মণি, সতি হ'তে তোমাদের উঁচু মাথা হেঁট হবে। ও ছেলে আর মানুষ হ'ল না।"

মণীশের মনেও সংশয় জাগিতেছিল, কিন্তু তথাপি সে এই ভীষণ অভিযোগের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিল না। সবেগে

বলিয়া উঠিল, "না, না, খুড়িমা, তা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। দেখুন না, আমার পড়াটা একবার শেষ হয়ে যাক্।"

এইটুকু সান্ত্বনাতেই যথেষ্ট খুসী হইয়া করুণাময়ী মনে মনে হাঁফ ফেলিলেন। ছুটির সময়টা মণীশ স্নানাহার বাদ অবশিষ্ট অবসর সত্যকে লইয়া পড়িল। স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীতে আকস্মিক শত্রু-বিপ্লব ঘটিলে যেমন কাণ্ড হয়, দক্ষিণপাড়ার ছেলের দলের সর্দ্দার সত্য দাদার দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়াতে, তাহার দলের মধ্যে তেমনই একটা আতঙ্কপূর্ণ উত্তেজনা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইল। কোন সুযোগে দাদার হাত ছাড়াইয়া সত্য যখন আপনার সযত্ন স্থাপিত নিয়মাবলীর ছোট বড় বিশৃঙ্খলা চোখে দেখিত, তখন আইনভঙ্গকারী প্রজাদের উপর মন্ত্রী-সমাজের মতই সে ক্ষুব্ধ রোষে গর্জ্জিতে থাকিত। দাদার প্রতি যে মনটা খুব প্রসন্ন থাকিত, এমন কথাও ঠিক বলা যায় না। অল্প বিস্তর উপায়ে সে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। তাহার মনে বেশ দৃঢ়রূপেই এই কথাটা জাগিয়া থাকিত যে, নাদির সা বা তৈমুরলঙ্গের মতই তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য তাহার দাদা এখানে আসিয়া অকস্মাৎ অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে! কেন সে তাহার কলিকাতার বাসায় থাকিল না? সেখানে কত ট্রাম, গ্যাসের আলো, কত কি আছে। সে সব ফেলিয়া তাহাদের এই ছায়া ঢাকা বটের তলে, রৌদ্র-মাখা ঘাটের জলে সে তাহাকে হুমকি দিতে আসে কেন? আসে ত দুই দিন পরেই কি ফিরিয়া গেলে চলে না? কিন্তু বাহিরে স্পষ্ট করিয়া নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সাহস তাহার নাই। মিউটিনিয়ারদের মত

'গোরার' আড়ালে থাকিয়াই সে মনে জোর পায় কিন্তু চোখো-চোখি হইলেই মুস্কিল! এতটুকু সাধ্য থাকে না যে, সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। চোখে তাহার জল আসে, নাসারন্ধ্র ক্ষুব্ধ রোষে ফুলিতে থাকে, তথাপি কথা রাখিতে হয়।

এবার গ্রীষ্মের ছুটীতে মণীশ ভাইকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতঃমধ্যে শিবনারায়ণ একদিন তাহাকে ডাকিয়া কতকগুলি পুরাতন কাগজপত্র গুছাইতে ও তৈয়ার করিতে দিয়া বলিলেন, "কালকের মধ্যে এগুলো ঠিক হওয়া চাই।"

মণীশ নিজের পড়িবার ঘরে আসিয়া টেবিলের উপর কাগজের বাণ্ডিল লইয়া যেমন বিছাইল, অমনি পাশের ঘর হইতে সত্যর পড়ার শব্দ বন্ধ হইয়া গেল এবং এক মিনিট পরেই গুপ্ত স্থান হইতে ছিপ বঁড়সি বাহির করিয়া শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে পা টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া লম্বা পাড়ি দিলেন। কোন একটা কাজ হাতে লইলে দাদার যে আর হুঁস থাকে না, এই অতি সত্য সংবাদটুকু বিশেষরূপেই তাহার জানা ছিল বলিয়া সে খুব খোস মেজাজেই বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে মৎস্যযজ্ঞের মাঝখানে যজ্ঞভঙ্গকারী 'গণ'রূপে দাদার আকস্মিক আবির্ভাবে ঈপ্সিত আনন্দ ভোগ হইতে তাহাকে কিছু বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার পরদিন দুপুরবেলা সত্যকে অঙ্ক কষিতে দিয়া পাশের ঘরে মণীশ কাগজগুলা গুছাইতেছিল, এমন সময় বন্ধু শচী কান্ত আসিয়া হঠাৎ যেন এক পাতা নভেল শুনাইয়া দিয়া গেল!

শচীকান্ত চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ অবধি তাহার কথাগুলি কেমন যেন জটিল ছন্দে বেতালা সুরে মণীশের কানের তারে পুনঃ পুনঃ ঘা দিতে লাগিল। 'নুরজাহানের জন্য জাহাঙ্গীর কি না করিয়াছিল?' অপূর্ব্ব যুক্তি! ছি, ছি, এত লেখা পড়া শিখিয়া শচীকান্তর কি এই বিদ্যা হইল? এত বড় জুয়াচুরি দিয়া যে জীবনের গ্রন্থি বন্ধন হইবে, সে জীবনের পরিণাম কোথায়? নিজের পরিত্যক্ত আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধ শ্বাসটা সবেগে সে ভিতরের দিকে টানিয়া লইল। সেই সর্ব্বনেশে অধঃপতনের কাহিনী শ্রোতাকে এমনই অভিভূত করিয়া দিয়া গেল, যেন সে-ই-ই এই গূঢ় চক্রের চক্রী এবং সমস্ত অপরাধের দায়ী।

অনেকক্ষণ মণীশ সেইরূপ বিস্ময়বেদনাবিমূঢ় চিত্তে বসিয়া রহিল। এখন তাহার কি করা উচিত? সমুদয় জানিয়া শুনিয়া সে কি বন্ধুর বিশ্বাস-রক্ষার্থ ইহা চাপিয়া যাইবে, এবং চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে এত বড় অধর্ম্মের পথে চলিতে দিবে? না, তাহারই মঙ্গলার্থ এ সব কথা তাহার পিতার কর্ণগোচর করিয়া বন্ধুকে রক্ষা করিবে? মণীশ জানে, শচীকান্তর পিতা পুত্রের জুয়াচুরি বুদ্ধি কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। আচ্ছা, ভক্তিনাথকে গোপনে সংবাদটা দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলে হয় না? এই কথাই ভাল! ভক্তিনাথকে দিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিতে হইবে।

রৌদ্রের তেজ কমিতে কমিতে কখন এক সময় সূর্য্যকিরণ ছাদের আলিসা ছাড়াইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে পিছন দিক্‌কার প্রকাণ্ড আম বাগানে স্নিগ্ধতর বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। রৌদ্র তাপাহত ম্রিয়মান গাছপালা সেই বাতাসে রোগশয্যাত্যাগী

শিশুর মতই নবীন স্বাস্থ্য সম্পদলাভে সতেজ হইয়া উঠিয়া প্রচুর পুষ্প-ভূষণে দেহ সাজাইয়া তুলিতেছিল। বর্ণে গন্ধে চারিদিক আলোকিত পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। ধন্য মা প্রকৃতি! বিশ্ব বিমোহিনী,মায়াবিনী তুমি! এই না ভয়ঙ্করী রুদ্রাণী মূর্ত্তিতে সৃষ্টি দহন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? আবার ইহার মধ্যে কমল-কুমুদা-সনে আসীনা রাজরাজমোহিনী মূর্ত্তিতে বরাভয়করা হইয়া প্রসন্ন স্মিত হাস্যে সন্তপ্ত বিশ্বকে জুড়াইতেছ! করালিনী কমলার রূপ ধরিয়াছ! দশরূপা তুমি নহ মা, সর্ব্বরূপিনি! প্রতিক্ষণেই যে তোমার বিভিন্ন রূপ আমাদের অন্তর্বাহ্য ঘেরিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাই। যখনই জীব-জগতে বা অন্তর্জগতে কোনরূপ গ্লানির আবির্ভাব হইতেছে, তখনই আমরা তোমার বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতেছি। ওগো সর্ব্বশক্তিমতি! তোমার অসীম শক্তি-সমুদ্রের সহস্র বীচিমালা, —শীতের পর গ্রীষ্ম, বৃষ্টির পর রৌদ্র, দুঃখের পর শান্তি, ও সুখের অন্তে বিরাম মুহূর্মুহু আনিয়া দিয়া তোমারই অসীম আবির্ভাব জানাইয়া দিতেছে। মানব-চিত্তের অভ্যন্তরেও তোমারই ত্রিগুণ প্রতিক্ষণে আবির্ভূত তিরোভূত হইতেছে! ওগো ত্রিগুণময়ি! তোমার এই বহুল রূপের লীলা আমাদের সাধ্য কি যে বুঝিব? তাই শুধু বিস্ময়ে সম্ভ্রমে নীরবে চাহিয়া থাকি।

কাগজের তাড়া গুছাইয়া উঠিতেই মনে পড়িয়া গেল, বহুক্ষণ হইতে পাশের ঘরে পাঠের সাড়া পাওয়া যায় নাই। অনেকক্ষণ তাহার সাড়া না পাইয়া সত্য বোধ করি পলাইয়াছে। দরজা খুলিতেই সন্দেহ প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিল। সে ঘরে সত্য নাই! শুধু ঘরের মেজের ছড়ান কতকগুলী কুচানো কাগজ এবং দোয়াত

হইতে নিঃসৃত কালির স্রোত তথায় তাহার পূর্ব্বাবস্থিতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল।

৪

বলি বলি করিয়াও মণীশ কোনমতে ব্যক্তব্যটা ভক্তিনাথের কাছে ফুটাইতে পারিল না। কেমন করিয়াই বা হঠাৎ বলিয়া বসে, "ওগো, তোমার ভাই ঠকাইয়া বিবাহ করিতেছে।" সে ফিরিয়া আসিল। পথে চলিতে চলিতে ভাবিল, আচ্ছা শচী তামাসা করিয়াও হয়ত কথাটা বলিতে পারে! বোধ করি এ একটা রচা গল্প মাত্র। এই ক্ষুদ্র সন্দেহটুকুর ভিত্তির উপর বন্ধু-প্রেমের প্রকাণ্ড অট্টালিকা রচনা করিয়া মনে মনে সে লঘু নিশ্বাস ফেলিল। বন্ধুর প্রতি অবিচার করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহা মনে করিতেও সে লজ্জিত হইল। এবং সন্ধ্যাকাশ স্বর্ণছটায় রঞ্জিত করিয়া শুক্লপক্ষের চাঁদ পূর্ব্বাকাশে দেখা দিবামাত্র কামিজের উপর একটা চাদর ফেলিয়া বন্ধু গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

তরুণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বাহিরে সারা বিশ্ব হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু পশ্চিমের ঘরের ক্ষুদ্র জানালা তাহার সেই সুপ্রচুর কিরণের কণামাত্র লাভ করিয়া ঘরের ভিতরকার অন্ধকারকে কথঞ্চিৎ তরল করিতে পারিয়াছে মাত্র।

পঙ্করাশি-উদ্গত অদূর পুষ্করিণীর অসংখ্য মশককুল সে অন্ধকার গৃহে মহোল্লাসে মাতিয়া ঘুরিয়া উৎসবের বাদ্য বাজাইতেছিল। ঘরের মধ্যে মনুষ্য বাসের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। দ্বারের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া মণীশ সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকিল, "শচী ঘরে আছ?" সাড়া না পাইয়া আবার ডাকিল, "শচি—"

এবারও কোন সাড়া নাই। দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট ঘড়ি স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডের মত গভীর নিস্তব্ধতাকে আঘাত করিয়া টিক্ টিক্ করিতেছিল। ক্ষুদ্র জানালার ভিতর দিয়া বাতাসের আনাগোনা, অন্ধকারে কাহার দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতই শুনাইতেছিল।

শচী ঘরে নাই স্থির করিয়া মণীশ ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে ফিরিয়া হঠাৎ বিস্ময়ে চকিত হইয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িল। অন্ধকারের মধ্যে ঐ না একটা অন্ধকারতর পদার্থ ঈষৎ নড়িয়া উঠিল! হাঁ, হাঁ! একটা মনুষ্য-মূর্ত্তিই ত! কে? মণীশ ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। নিশ্চয় শচীকান্ত! কিন্তু একা সে এই অন্ধকারে পড়িয়া কেন? ঈষৎ অগ্রসর হইতেই হঠাৎ একটু ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত নিদ্রাজড়িত ভাঙ্গা স্বর সাড়া দিল, "কে?"

অন্ধকারে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "আমি, শচি! তুমি এমন অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন? শরীর কি ভাল নেই?" আবার একটা আলস্য-জড়িত নিশ্বাসের শব্দ স্তব্ধ গৃহে ভাসিয়া উঠিল। অন্ধকারের মূর্ত্তি হাই তুলিয়া গা ভাঙ্গিয়া গলা ঝাড়িয়া অবশেষে কথা কহিল। সে শচীকান্তই।

শচী কহিল, "হ্যাঁ, মাথাটা একটু ধরেচে। ও কিছু না—বসো, একটা আলো আনি।" এই বলিয়া সে উঠিতে গেল।

মণীশ বাধা দিয়া বলিল, "না, না, আলোতে কাজ কি? বসো না, আমি এখনই যাব। সত্যকে পড়াতে হবে। একটা কথা বলতে এলাম—"

কথাটা কি, শচীকান্তর তাহা বুঝিতে বাকি ছিল না। এই

'কথাটা'র ভয়েই এতক্ষণ সে সাড়া দেয় নাই। মনটা বিশেষ একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তথাপি কষ্টে আত্মদমন চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছিল, ক্ষুদ্র শব্দটা তাহাই প্রতিপন্ন করিল।

"তুমি আমার উপর রাগ করেচ, শচি ?"

মণীশের প্রশ্ন শচীকান্তকে গোপনে আরক্ত করিয়া তুলিল। বিরক্তিও যে না ধরিল, এমন নয়। কারণ সে জানিত, কথাটা বড়ই সত্য। তবু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, রাগ কিসের।"

"আমার মনে হচ্চে, নিশ্চয় তুমি রাগ করে রয়েচ। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি—আমায় ক্ষমা করবে না ?"

অনুতপ্ত মণীশ বন্ধুর হাত ধরিল।

"ক্ষমা !"

"হ্যাঁ, আমার মন বড় লঘু। তোমার সেই তখনকার তামাসাটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে আমি তোমায় অপমান করেছিলাম। এ অপরাধ ক্ষমা কর্ব্বে কি ?"

শচীকান্ত কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। এত বড় বিশ্বাস তাহার উপর ! সে বিশ্বাস কি ভাঙ্গা যায় ? তাহার হাত পায়ের তলাগুলা অকস্মাৎ যেন হিম হইয়া আসিল। অন্ধকারের অঞ্চল তাহাকে ঢাকিয়া না রাখিলে এ গভীর লজ্জা তাহার পক্ষে গোপন করা কঠিন হইত। একবার মনে করিল, নিজের দোষ স্বীকার করিয়া এমন উচ্চ হৃদয় বন্ধুর কাছে নিজেই সে প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা চাহে। কিন্তু এ সংসারটা ভগবানের নিজের হাতে গড়া হইলেও যে বেত্র হস্ত প্রহরী ইহার পরিচালনার ভার সেই অনাদি কাল হইতে

তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে, বাইবেলের সয়তানের মত মানুষের বুদ্ধিকে সে সোজা পথে চলিতে দিতে ভালবাসে না। তাহারই ঈঙ্গিতে শচীকান্তর বুদ্ধি বিবেকের পরামর্শ গ্রহণ করিল না। মন অভিমানিনী কৃষ্ণপ্রিয়ার মতই দুর্ল্লভ পরিজাতের বায়না ধরিয়া রহিল। সহসা সে উচ্চ কণ্ঠে সচেষ্ট কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বন্ধুর হাতখানা দক্ষিণ করতলে চাপিয়া ধরিল। "কুচ্ পরো'য়া নেই! ও এমন কিছু অপরাধ নয়! ও ধরতে গেলে ত আর বাঁচা যায় না। তার পর এখন কলকেতায় ফির্‌চ কবে?"

"এখনই? এইত কদ্দিন পরে এলাম।"

"আমিত শীঘ্রই পাততাড়ি গুটোচ্চি—উঃ কি ভয়ানক মশা!" বলিয়াই সে দংশন-পরায়ণ মশকের উদ্দেশ্যে নিজের বাহুতলে অন্য হস্ত দ্বারা সজোর চপেটাঘাত করিল। "আঃ, অস্থির করে তুলেচে!"

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "বীর বটে! মশার ভয়ে দেশ ছাড়া।"

শচীকান্ত মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "হাসচ কি? এ ভয় বড় কম ভয় নয়। নাঃ, চল, বাইরে যাই। এরা নেহাৎ টেঁক্‌তে দিলে না, এখানে।"

বৈশাখী পূর্ণিমার ভোরে প্রাতঃস্নান সারিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় কালীতারা মহাবিদ্যা ইত্যাদি লেখা নামাবলীখানি গায়ে দিয়া প্রভাত সূর্য্যের মত জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তিতে নিজের ক্ষুদ্র গৃহোদ্যানটিতে প্রবেশ করিয়া ফুল তুলিতে ব্যস্ত একটি মেয়েকে ডাকিয়া কহিলেন, "গৌরদিদি! পূজার উদ্যোগটা শীঘ্র করে দাও ত। পূজা সেরে

দক্ষিণপাড়ায় নবীনকৃষ্ণর ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে আসতে হবে।”

গৌরদিদি, আর কেহ নহে, সে সেই সত্যেন্দ্রর শিষ্টা সঙ্গিনী, গৌরী। সাজি-ভরা মল্লিকা, কুন্দ, জবা, গোলাপ সংগ্রহ করিয়া সে তখন গোলাপ কাঁটা হইতে কাঁটা বেঁধা আঁচল ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। মাতামহের আদেশে খোঁপাখোলা বিনানী দুলাইয়া একটু হাসিয়া কহিল, “কি করে যাই, দেখুন না!—” ইঙ্গিতে সে আঁচল দেখাইল।

দাদামহাশয়ও মৃদু হাসিলেন; কহিলেন, “ওরে হাবি, অমনকরে টানলে কি কাঁটা ছাড়ে? রোস্, রোস্, আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।”

বলিতে বলিতে কাছে আসিয়া সত্বর তাহাকে তিনি কণ্টকদায় হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ছাড়া পাইয়া গৌরী অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দাদামহাশয়ের স্মিত হাস্যমণ্ডিত সৌম্য মুখের উপর দুইটি ডাগর চোখের চঞ্চল দৃষ্টি অচঞ্চলভাবে স্থাপন করিয়া কহিল, “তুমি কি করে ছাড়ালে দাদু, আমিতো কিছুতে পারিনি।”

“আমি বড় হয়েছি কিনা, তুমি যে ছেলে মানুষ। ফুল তোলা হয়ে গেছে ত? আর তুলছিস্ কেন? তুই যখন রাঁধুনি হবি, তখন দেখচি কারু পাতে আর ভাত দিবি নে, সবই নিজে খাবি।”

গৌরী লজ্জিত হইয়া আরক্ত মুখে “তা বই কি, কখ্খনো না” বলিয়া নামানো করবীর ডালটা ছাড়িয়া দিয়া সাজি দুলাইতে দুলাইতে বাড়ীর দিকে ফিরিল। তাহার মাতামহ সকৌতুক স্নেহে একবারমাত্র গতিশীল ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া নবীন সূর্য্যের ঝলমল কিরণ রঞ্জিত পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। —নিত্য-নবীন, চিরন্তন চিরপুরাতন! তবু প্রতি প্রভাতে সেই

আদি প্রভাতের সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশুর মতই নির্ম্মল, অম্লান এবং ক্লান্তিলেশহীন।

পশ্চাৎ হইতে একটি মধুর কণ্ঠ তাঁহাকে আহ্বান করিল, "দাদু!"

"কি রে গৌরমণি, আবার ফিরলি যে?"

"তুলসি তোলা হয়নি ত। কেশবার্থে চিনোমিত্বাং—তার পরে কি, আমি ভুলে গেছি। কিছুতে মনে পড়্‌চে না, আমায় বলে দাও না, দাদু।"

" 'বরদা ভবশোভনে।' কিন্তু আজ পূর্ণিমা, আজ ত তুলসী তুলতে নেই, দিদি। ঠাকুর ঘরে তামার টাটে তুলসী আছে, তাইতেই আজ হয়ে যাবে'খন।" গৌরী ঠাকুরঘরে ফুলের সাজি রাখিয়া আসিয়াছিল। মাতামহের বাহু আকর্ষণ করিয়া আবদারের স্বরে সে কহিয়া উঠিল, "তুমি সেখানে চল না, দাদু। আমি চন্দন ঘষবো, আর তুমি ফুলগুলি সাজিয়ে নেবে। হ্যাঁ দাদু, চ'ল।"

"আচ্ছা, চল্" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খড়মের খুঁটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গৌরী আনন্দাতিশয্যে প্রায় নাচিয়াই চলিল।

সার্ব্বভৌম মহাশয় আসনে বসিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের মতই রাঙ্গা তাম্র থালিতে পীত লোহিত ও শুভ্র পুষ্পরাশি অপূর্ব্ব-শোভা বিস্তার করিয়াছিল। বোঁটা-কাটা বিল্বপত্র ও তুলসী-দূর্ব্বা যথাস্থানে আত্মনিবেদন কামনা করিয়া আসিল। এদিকে ছোট দুইখানি হাতের ঘন ঘন আন্দোলনে মন্দারমথিত সমুদ্রোত্থিত সুধাগন্ধি সুধার ন্যায় ঘন সুরভি ছড়াইয়া চন্দন-পাত্র পূর্ণ হইতে লাগিল।

৫

জনপূর্ণ কলিকাতা সহরে প্রাসাদ-মালার পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত গেল। রাস্তায় গ্যাসের আলো চন্দ্রালোককে খর্ব্ব করিয়া উর্দ্ধে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। ফেরিওয়ালার দল 'বেল ফুল' ও 'কুল্‌পি বরফ' ঘন ঘন হাঁকিয়া চলিয়াছে।

কেরোসিনের একটি বিলাতি ল্যাম্প জ্বালাইয়া নিজের ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে বসিয়া শচীকান্ত সেই পূর্ব্ব-কথিত মরক্কো-চর্ম্ম মণ্ডিত ঝক্‌ঝকে খাতা খানি খুলিয়া তাহারই একটী পৃষ্ঠায় ঘন নীল কালি দিয়া কবিতা লিখিতেছিল।

ঘরখানি বাসাবাড়ীর গৃহোচিত ছোটখাট এবং সজ্জাগুলিও খুব মূল্যবান নয়। কিন্তু সেগুলি এমন পরিপাটী করিয়া সাজান যে, তাহা হইতে গৃহস্বামীর বেশ একটু সৌখীন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এক পাশে একটি লোহার আন্‌লায় দুই একখানি মিহি ধুতি ও ইস্ত্রি-করা সার্ট সন্তর্পণে ঝুলানো, পম্প-সু জুতার তখনকার দিনে খুব বেশী চলন ছিল না, নিতান্ত সৌখীন ছেলেরাই তাহা ব্যবহার করিত—ফিতার ফাঁস বাঁধা জুতাজোড়া ও রূপার কারুকার্য্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট ছড়িগাছি বিশেষ যত্নের সহিতই উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষিত। এই সব জিনিষ সাধারণতঃ মণীশের গৃহ হইতেই তাহার পাওয়া। শিবনারায়ণ বরাবরই তাহার পড়াশুনার খরচ চালাইয়া আসিয়াছেন। আজও চালাইতেছেন।

যে কবিতাটুকু কবির লেখনী খাতার শুভ্র পটে অঙ্কিত করিতেছিল, তাহা এই,—

"আঁধার কুটির মম ছিল চির-অন্ধকার,
আজি দেবি! তব স্পর্শে ঘুচে গেল সে আঁধার।

যদি গো, দিয়েছ দেখা, কর তবে হেথা বাস,
চিরারাধ্যা দেবী তুমি, আমি তব চির-দাস।"

লেখকের লেখনী এইখানেই থামিয়া গেল। কে যেন কাহাকে ডাকিতেছে না? হাঁা, ঠিক ত। নীচে দরজায় কড়া নাড়িয়া কে ডাকিতেছিল, "ঝি, অ ঝি, ও বামুন ঠাকুর! শচীন্‌বাবু বাড়ী আছেন?"

ঝি কিম্বা বামুন ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না, অগত্যা শচীনবাবু স্বয়ংই চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। মনটা সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ গলার সাড়াটা যেন ভাবী বড় কুটুম্বের মতই ঠেকিতেছিল।

নিখিলনাথ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দরকান্তি যুবক। মুখখানিও চেহারার মত সদাহাস্যমণ্ডিত, সরলতার লীলাভূমি! শচীকান্তকে কাছে পাইয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া অভিনন্দন করিয়া বলিলেন, "বাঃ, বেশ ত! দোর বন্ধ করে লুকিয়ে বসে আছ। এসে একটা খবরও ত দাওনি!"

শচীকান্তর সন্দেহ কুণ্ঠিত চিত্ত এই প্রাণখোলা স্নেহ তিরস্কারে নিঃশঙ্ক আনন্দ রসে ভরিয়া উঠিল। সে এই অনুযোগের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোন জবাব দিল না, ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া মুখ নত করিল। নিখিলনাথ আজ যেন খুব ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পিঠে হাত দিয়া কহিলেন, "একবার চলুন দেখি,—এখনও তো আপনার কনে দেখাই হয়নি, সেই কাজটা সেরে নেবেন। আর যদি তারপর মত থাকে, তাহ'লে কাল সকালে ঠাকুরমা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করে

দিন করাবেন বলচেন। বৈশাখ মাস পুণ্যাহ মাস। তাঁর ইচ্ছা, এই মাসেই বিয়েটা চুকে যায়। আপনার কোন আপত্তি নেই ত?"

আপত্তি থাকা কি সম্ভব? তথাপি অন্তরের মধ্যে বিবেক যেন কি একটা দ্বিধার ছুতা তুলিতে চাহিতেছিল। বিবেকের এইটাই প্রধান দোষ, মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিলেও সে স্নেহময়ী মায়ের মতই আঁকড়াইয়া থাকে, ছাড়িতে চাহে না। নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া উত্তর দিল, "আ—আমার? না, তা কিছু নেই।"

কিন্তু সেদিনটায় আর কনে দেখা কপালে ঘটিল না। ভর্ সন্ধ্যার বারবেলায় কন্যা দর্শনে দোষ ঘটিতে পারে,—অগত্যা ক্ষুণ্ণ শচীকান্ত গোটাকয়েক সন্দেশ ও ক্ষীরমোহন গিলিয়াই ঘরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথা রহিল, পরদিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্ত্তে নিখিলনাথ তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কন্যা দেখাইবেন।

পরদিন যথাসময়ে সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। এবং নিখিলনাথও সেই শুভ মুহূর্ত্তের দূতস্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীকান্ত লগ্ন না দেখিয়া অনেক পূর্ব্ব হইতেই মস্তকের কেশগুচ্ছ হইতে পদতল পর্য্যন্ত শরীরের যেখানে যেমন প্রসাধন সাজে, সযত্নে তাহা সমাধা করিয়া হাত আয়নায় বারে বারে মুখবিম্ব দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। জানালার মধ্য দিয়া নিখিলনাথকে এদিকে আসিতে দেখিয়াই দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবিল ঘেরিয়া খানকয়েক চৌকি সাজান ছিল। তাহার একখানার দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিখিলনাথ কহিলেন, "একটু দেরি আছে। বসুন, আমি আসছি।"

শচীকান্তর ললাট ঘামিয়া উঠিতেছিল, বুকের মধ্যটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। নিখিলনাথ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

যে ঘরে গৃহস্বামী গৃহের ভাবী জামতাটিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, তাহারই পিছনে বাড়ীর ভিতরকার লম্বা একটি দালান। এই ঘরের মধ্য দিয়া একটি দ্বার ও দুইটি জানালা খোলা থাকিলে বাহির অন্দরের মধ্যে আর বড় একটা আচ্ছাদন থাকে না। এখন দ্বারটি বন্ধ থাকিলেও জানালা দুইটিই উন্মুক্ত ছিল। সহসা সেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটু সুগলিত স্বর সুকোমল বাল-কণ্ঠের হাস্যে মণ্ডিত হইয়া গৃহের স্তব্ধ বায়ু স্তরে ঝঙ্কার তুলিল,— "সীতারাম বল্লিনে ? তবে তুই আজ খেতে পাবিনা !"

শচীকান্ত চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিল। জানালার উপরার্দ্ধ করাট-মুক্ত, পিছনে ভিতর দালানে কড়িকাঠে ঝোলান খাঁচার নিকট দাঁড়াইয়া একটি বালিকা ঐ কথা বলিয়া পাখীকে শাসাইতেছে।— "বল্লি নি, বল্লি নি ? তবে আমি এই চল্লুম, ময়না ! সীতারাম বল্, সীতারাম—"

শচীকান্ত নীরবে স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সে কনে দেখিতে আসিয়াছিল। দূর হইতে পূর্ব্বেই এই কনেটির যে ছায়াদর্শন ঘটিয়াছে, সেই ছায়ার অঙ্গে সে নিজের কবি হৃদয়ের কল্পনাদ্বারা যথেষ্টই বসন্ত-পুষ্পমঞ্জরী ও নন্দন-পারিজাতের সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি এ দৃশ্য যেন কল্পনাকে সবেগ ধিক্কারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। বৈশাখের সমুজ্জল প্রভাত। বারান্দার থিলানের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের গাঢ় নীলিমা নাট্যগৃহের উত্তোলিত যবনিকার ন্যায় আপনাকে ধরিয়া

রাখিয়াছে। সূর্য্যের সোণালি রংয়ের জ্বলন্ত কিরণ মেয়েটির চাঁপাফুলের মত শরীরের উপর পড়িয়া তাহার চারিদিকে যেন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনুচিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়াও শচীকান্ত আপনার প্রশংসাপূর্ণ বদ্ধ দৃষ্টি কিছুতেই ফিরাইতে পারিল না। এই কি কনে? সত্যই এত বড় ভাগ্যবান সে?

ইতঃমধ্যে তিরস্কৃত ময়না সীতারাম বলিল। এবং "বল্লি না, বল্লি না" বলিয়া বারম্বার তাহাকে ভেঙ্গাইয়া আবার তিরস্কার লাভ করিল। এমন সময় হঠাৎ অদূরে কে ডাকিল, "কমলা!"

মেয়েটি চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। প্রভাত-সূর্য্য তাহার সমস্ত আলোক একত্র করিয়া সেই সময় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। জগতের সমুদয় সার্থকতার আনন্দ, পুষ্পবাস আকুলিত এলোমেলো 'দখিণ' হাওয়ায়, বহিয়া আসিল। অদৃশ্য বাঁশির গান যেন, যবনিকার অন্তরাল হইতে তানলয়ে ভাসিয়া উঠিতেছিল। শচীকান্ত দেখিল, এত দিন সে প্রকৃতির গড়া এবং মানুষের রচিত অনেক সুন্দর জিনিষের উপরই চোখের দৃষ্টি ফেলিয়াছে, কিন্তু এই চোখের তারা দুইটির মত এমন সুন্দর জিনিষ আর কখনও সে প্রত্যক্ষ করে নাই।—শচীকান্তর দিকে নজর পড়িতেই মেয়েটি সচকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। পুলক কণ্টকিত শরীরে ব্যগ্র হইয়া শচীকান্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নিখিলনাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "আসুন শচীন্‌বাবু, মিষ্টিমুখ না করলে ঠাকুমা মেয়ে দেখাবেন না। কিছু ঘুষ আর কি! বুঝেছেন ত—"

দ্বিরুক্তি না করিয়া শচীকান্ত আসন ত্যাগ করিল। "ক্ষুধা নাই" ইত্যাদি লৌকিকতার বাঁধা গৎ ঝাড়িতেও তাহার রুচি হইল না, এমনই সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। নিখিলনাথ কহিলেন, "কমলকে আপনার মনে ধরবে,—সে ভয় আমি কারিনে, কিন্তু দানের যোগ্য দক্ষিণা দিতে পারব না এইটেই হচ্চে, আসল ভয়। সময় বড় মন্দ, নতুন বেরুচ্চি, আর কিছুদিন—"

শচীকান্ত অসহিষ্ণুভাবে হাসিয়া বাধা দিল, "কিছু দরকার নেই। আপনাকে ও জন্য একটুও কুণ্ঠিত হতে হবে না।"

নিখিলনাথ ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রসন্ন মুখে কহিলেন, "আসুন।"

"শচীন্ না? এ কি! এর মধ্যে বাড়ী থেকে ফিরেছ যে! ব্যাপার কি?"

একজন সহাধ্যায়ী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া এই কথা বলিয়া মুক্ত দ্বার পথে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়া কহিল, "কবে এলে?"

"পরশু।"

"এত শীঘ্র! মোটে পাঁচ দিন ছিলে তা হলে? বাড়ীর সব খপর ভাল ত? বাবা ভাল আছেন?"

অকস্মাৎ ঘরের ছাদ ফুঁড়িয়া যেন আকাশ হইতে বজ্র খসিয়া পড়িল। সকাল বেলাকার সমস্ত উজ্জলতা নিমিষে অমনি অমাবস্যা রাত্রির গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়া শচীকান্তর মুখের উপর যেন খানিকটা কালি মাখাইয়া দিল। কষ্টরুদ্ধ শ্বাসে কোন মতে সে উচ্চারণ করিল, "হ্যা।" দ্বিতীয় শব্দটুকু উচ্চারণ করিবার শক্তি অবধি তাহার রহিল না।

তাহার এই আড়ষ্টতার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বন্ধুর কোন ধারণাই ছিল না। কাজেই চোখের উপর তাহার এই সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তনেও সে কোন প্রকার সন্দিহান হইল না। সহজ-ভাবেই বলিয়া গেল, "সেদিন শ্রীরামপুরে গেছলাম,—মৈত্র মহাশয়ের শ্রাদ্ধে মস্ত পণ্ডিত-সভা বসেছিল। দেশের যত সব বড় বড় পণ্ডিত সেখানে জমা হয়েছিলেন। তোমার বাবাও এসেছিলেন। একে তিনি বারেন্দ্র-শ্রেণীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পণ্ডিত, তাতে ওঁদের কুলগুরু। কি সম্মান তাঁর! এক ধার থেকে সকলে উঠে দাঁড়াল, পায়ের ধূলো নেবার জন্য কি যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল! ঐ রকম হওয়া যায়, তবেই লেখাপড়া শেখা সার্থক। তুমি অমন আদর্শটা ত্যাগ করে কিন্তু ভাল করলে না শচীন্! আচ্ছা, এখন তবে চল্লাম। ও বেলা তোমার ওখানে আসবো'খন।"

বন্ধুটি যেমন অতর্কিত আবির্ভূত হইয়াছিল, তেমনই সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু যেমন অকস্মাৎ একদিন গগন-পটে আবির্ভূত হইয়া অদূর ভূমণ্ডলে একটা বিপ্লব-সংঘর্ষ আনয়ন করিয়া দিয়া আবার নিজেরই কেন্দ্র-পথে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়,—পশ্চাতে কাহার জন্য কি রাখিয়া গেল, তাহার কিছুই সে জানিতে পারে না, এই ছেলেটিও তেমনই ইহাদের মধ্যে কতখানি ভাঙ্গাগড়া করিয়া দিয়া গেল, সে সংবাদে নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়াই হাসিমুখে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দ্রুত-পদে চলিয়া গেল।

নিখিলনাথ কহিলেন, "আপনারা বারেন্দ্র শ্রেণী, আপনার বাপ আছেন, তিনি মস্ত পণ্ডিত, এ সব কথা লুকিয়ে রাখবার

অর্থ কি, শচীন বাবু?" তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

শচীকান্ত নতমুখে নীরব রহিল। তাহার আর বলিবার কোন কথাই ছিল না।

নিখিলনাথ আবার কহিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে, আমারও একটা শিক্ষা হল। পয়সা নেই, অভিভাবকদের দরে এঁটে উঠতে পারিনে, তাই একটি অভিভাবক-হীন পাত্র খুঁজতে গেছলাম—"

তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া নির্ব্বাক শচীকান্তর মুখে বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল, "একটু দয়া করে বিচার করুন। রাঢ়ীবারেন্দ্রে বিয়ে হওয়ায় দোষ কি? আসলে আমার উদ্দেশ্যটা ছোট ছিল না।"

নিখিলনাথ দাঁড়াইয়া ছিলেন, শচীকান্তর মুখে অকথ্য লজ্জার ছায়া দর্শন করিয়া তাঁহার সরল চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। আসল কথা, তিনি একটু বেশী রকম নব্য তন্ত্রের লোক,—কুল, শ্রেণী এ সকল বেশ মানিতেন না। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "ভেবে দেখলে তাতে দোষ কি!"

"তবে আমায় ত্যাগ করবেন না। বাবাকে জানাব, তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আপনি মত করবেন, বলুন!"

নিখিলনাথ কহিলেন, "তিনি কি মত দেবেন?"

শচীকান্ত নতমুখে উত্তর দিল, "যদি দেন, আপনার অমত হবে না?" তাহার স্বর গভীর সংশয়োদ্বেগে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। প্রথম যৌবনের উত্তেজনা মানুষকে যে দুঃসাহসিক কর্ম্মে উৎসাহিত

করিয়া তুলে, সহজে তাহা হইতে মনকে ফিরানো যায় না। নিখিলনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন, পরে কহিলেন, "কাজটা বড় অন্যায় করেচেন, কিন্তু এই উপলক্ষে যদি এমন অনর্থক বাধাটা সমাজ থেকে ওঠানো যায়—তাহলে সমাজের মঙ্গল হতে পারে। আপনার বাপ যদি নিজে দাঁড়িয়ে এ বিয়ে দেন তবেই আমি কমলাকে আপনাকে দান করব, নচেৎ না। সে আমার বড় আদরের বোন। আজ তবে এখন বিদায়।"

৬

বৈশাখ মাসের সকাল বেলাটা ছোট মেয়েগুলিকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে। ভোর থাকিতে থাকিতে গাছ মুড়াইয়া ফুল তোলা সারা হইয়াছে। বাটি-ভরা চন্দন তৈয়ারী। কলসী-ভরা জল, মুটা-ভরা কচি ঘাস, গণ্ডা গণ্ডা কড়ি, বাটা হলুদ, জোয়ানের পুঁটুলি, সিন্দুর কৌটা, চালের পিটুলি, এমনই বিবিধ সরঞ্জামে ছোট ছোট সাজি ও পিত্তল থালগুলি ত্বরিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কেহ গৃহপালিত গাভীটিকে সিন্দুর-চন্দনের ফোঁটা দিয়া কদলী হাতে মন্ত্র পাঠ করিতেছে, "গোকল, গোকুলে বাস, গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস, আমার হোক বৈকুণ্ঠে বাস!"—কোথাও বা শ্বেত চন্দনের বক্র অঙ্গুলিযুক্ত দুইখানি পা আঁকিয়া তাহার উপর জোড়া মল্লিকা ফুল চাপাইয়া বালিকার দল সমস্বরে পাঠশালায় নামতা পাঠের অনুকরণে মন্ত্র পাঠ করিতেছে, "চন্দনে ডুবু ডুবু হরির পা, হরি বলেন ওগো মা,"—ইত্যাদি। এইরূপে দশ-পুতুল আদা-হলুদ প্রভৃতি বালিকা-ব্রত চারিদিকেই মহা উৎসাহ কোলাহলের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

পুণ্যি-পুকুর ব্রতটি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়েদের ব্রত। ইহাতে শিব পূজার অনুষ্ঠান রহিয়াছে বলিয়া ছোট মেয়েরা হঠাৎ এই ব্রতাচরণের সম্মান লাভ করিতে পারে না। কেবল কোন কোন অভিভাবিকা শিবপূজার ফলে শীঘ্রই শিবের মত পতি লাভ হইবে বলিয়া নিজেদের কাজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মেয়েকে ব্রত করান। উঠানের এক পাশে হাতে কাটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নিকানো পৌঁছানো পাড়ে পূজার উপকরণ সাজাইয়া পুষ্করিণীর গর্ভে তুলসী চারা ও বিল্ব ডালের তলায় শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া রোরুদ্যমানা পূজারিণী বালিকা মাতৃ শিক্ষানুযায়ী আবৃত্তি করিতে থাকে, "খর্ব্বং থূল থলন্ত গজন্ত বদনং লম্বোদর, পেচ্ছন্নং মদগন্ধ মধু লুপ্ত—"ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাতিনী গৌরী মেয়েটির ধরণ এতটুকু মেয়েলি নয়। ছিপে করিয়া মাছ ধরায়, জল-ডেঙ্গাডেঙ্গি খেলায়, এমন কি, বলিতে লজ্জা করে. পেয়ারা গাছের অনতি উচ্চ ডালেও কথন কথন তাহার সেই দুষ্টামি ভরা হাসি মুখখানি সাত ভাই চম্পার ছোট বোন পারুলটির মত ফুটিয়া থাকিতে দেখা যায়। সকল ঘরের সকল ঝি-বউ ব্রত কর্ম্মে ব্যস্ত, এমন দিনেও সে দস্যি মেয়ে দাদামহাশয়ের পূজার উদ্যোগটি করিয়া দিয়া চুপি চুপি খিড়কি দ্বারের দিকে পা টিপিয়া চলিয়া কর। মেয়েটি মাতৃহীনা—বাপও এক রকম নাই বলিলেই চলে। মেয়েটি যখন মাতৃগর্ভে, তখন তিনি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশতঃ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইতে সিবিল সার্জ্জনের পদে উন্নীত হইয়া কি একটা যুদ্ধে বহু দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন। সে পর্য্যন্ত কন্যার জন্ম, পত্নীর মৃত্যু, এত বড়

বড় ঘটনায়ও তাঁহার নিকট হইতে না এক লাইন সংবাদ আদায় করিতে পারিয়াছে, না তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। গৌরীকে তাহার মাসিমা বিন্ধ্যবাসিনীই মানুষ করিয়াছেন। এক্ষণে মেয়ের রকম সকম দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়া উঠিতেছিলেন। বড় হইতেছে এখন কোথায় দিন দিন সে ঘরকরণার কাজ শিখিবে, মামীর ছেলে বহিবে, ব্রত-নিয়মাদি করিবে,—তাহা না হইয়া সৃষ্টিছাড়া মেয়ের কেবল ছেলের দলে ভিড়িয়া খেলিয়া বেড়াইতে মন! বাড়ীর লোকে ভৎ র্সনা এবং পাড়ার লোকে নিন্দা করে। বিন্ধ্যবাসিনী লোকের উপর অভিমান করিয়া বোনঝিকে শাসন করিতে গিয়া আদরই করিয়া বসেন। নিরুপায়!

আজ পাঁচজনের সমালোচনায় জিদ ধরিয়া পলায়ন কালেই বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছেন। আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা কৌশলেও সে মাসিমার হাত ছাড়াইতে পারে নাই। বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে ধরিয়া পুণ্যি পুকুরের নিকট আনিয়া বসাইলেন; নিজেই গোময়-মৃত্তিকায় গোলা করিয়া চারিধার নিকাইয়া জীর্ণ পুষ্করিণীর সংস্কার করিলেন। তারপর তাহার হাতে জবা ফুলের অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়া কহিলেন, "সূর্য্যের দিকে চেয়ে বল্, 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং'—বলচিস্ নে?"

গৌরী গোঁ হইয়া [illegible]ছিল, সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, সূয্যির দিকে না কি চা[illegible]। যায়? তুমি চাও না দেখি!"

"এত বেলা করিস কেন? আচ্ছা, ঐ পূব দিকে চেয়েই বল, শীগ্‌গির সেরে নে' উনোন ওদিকে জ্বলে যাচ্চে। এত বড় মেয়ে. নিজে একটা বত্ত করতে শিখলি নে! তোর জন্য আমি কি যে করি

তা জানি নে। আয়, হাত দিয়ে ঘটিটা ধর্, শিবের মাথায় জল দিতে দিতে বল্—

"পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা, কে পূজোয় দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী, ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।
শিল, শিলেটন, শিলে বাটন, শিলা আছেন ঘরে ?
স্বর্গ থেকে মহাদেব বলেন, গৌরী কি বত্ত করে ?
আকন্দ ফুল বিল্বপত্র, তোলা গঙ্গাজল,
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর।"

প্রণাম করে চলে যা। তুই ও বাঁচ্ আমিও বাঁচি।"

প্রণামান্তে ব্রতকারিণী প্রশ্ন করিল, "কই, মহাদেব ত জিজ্ঞেস করলেন না, মাসিমা ?"

মাসিমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জিজ্ঞাসা করবেন ?"

"কৈ, জিজ্ঞেস করলেন না ত—'গৌরী কি বত্ত করে ?' তবে কিন্তু আমি আর তাঁকে পূজো করব না।"

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সারিয়া বড় বধূ কচি ছেলের পিঁড়িখানি কখনও ছায়ায়, কখনও রৌদ্রের তাপে ঠেলিয়া দিতে দিতে তাহার জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জরে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন। বৃদ্ধা গৃহিণীর শরীর দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে, তথাপি পুরাতন হাড়, ভাঙ্গিলেও মচকায় না। কাপড় কাচি কাহারই মধ্যে আরতির জন্য তিনি তুলার সলিতা তৈয়ার করিতে বসিয়াছিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী হাঁড়ি-হেঁন্‌সেল তুলিয়া আগারে বসিয়াছেন, কাছে বসিয়া গৌরী একটা চঞ্চল বিড়াল-শিশুকে আদর করিতেছিল। বাহাদুরির মধ্যে সে শিশু তাহার নিজের মায়ের মুখের গ্রাস মৎস্য

খণ্ড কাড়িয়া আনিয়া দর্পিত আনন্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অদূরে 'মেনুর' মা 'পুষুমণি' মল্লিকার গোড়ে মালার মত মোটা লেজ ফুলাইয়া সেটিকে এধারে ওধারে দুলাইতে দুলাইতে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ছেলের কীর্ত্তি দেখিতেছিল। মানুষের মতই সেও নিজ সন্তানের এই স্নেহোপদ্রব সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল।

গঙ্গামণি ডাকিয়া কহিলেন, "বিন্দু, দুটী ভাত রেখো মা, এক চাকলা আম আছে, দুধ দিয়ে খাবে।" শুনিয়া গৌরী বিড়াল ছানাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল, "বসো মাসমা, আমি তোমায় দুধ এনে দিচ্চি।"

প্রতিবেশীরা দুই একজন করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নাতি বা ভাইপো কোলে লইয়া, "কি করছ গো ঠান্‌দি, খুড়ি বা মামি" বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিপ্রহরের সভা প্রতিদিনই এই বাড়ীর অন্তঃপুরে জমিয়া থাকে। তবে আজকাল পূর্ব্বের মত ততখানি আর জমকায় না। কারণ, বৈশাখ মাসে অনেকের বাড়ীতেই 'বৈকালিক' সাজাইবার হাঙ্গামা আছে, সে জন্য গৃহকর্ত্রীগণ বড় একটা বাড়ী ছাড়া হইতে পারেন না।

দাক্ষিণপাড়ার সেজ-গিন্নি আসিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আর শুনেছ খুড়ি, দয়াল [illegible]য্যের ছোট বউ, তুক্ করে ছেলেটাকে একেবারে ভেড়া বানিয়েচে। দিনে দুপুরে সোয়ামীর সঙ্গে কথা কয়! দেশে রোগ আকাল হবে না?"

এমন সময় বাহির বাড়ীর দিক হইতে জুতার শব্দ হইল। গঙ্গামণি ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া দেখিলেন। এ বাড়ীতে এ রকম

তাই জুতা পায়ে দিয়া কে চলিবে? সহসা একটা ডাক আসিল "—মা!'

"কে রে? শচীন্ ফিরে এলি?" বলিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া গঙ্গামণি সবেগে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, কহিলেন, "কেন বাবা, এর মধ্যে আবার ফিরে এলি যে? ভাল আছিস্ ত?"

পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহময়ী মা শিহরিয়া উঠিলেন। এ কি হইয়াছে! এই সেদিন সুস্থ ছেলেকে তিনি সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন, আর আজ এ কি মূর্ত্তি লইয়া সে ফিরিল? কশাঘাত লাঞ্ছিত কয়েদী যেমন ক্লিষ্টভাবে চলা-বলা করে, তাহাকেও তেমনই দারুণ অবসাদ গ্রস্ত দেখাইতেছিল।

শচীকান্ত মায়ের বিস্মিত দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "হঠাৎ বড় অসুখ করেছিল মা, তাই ফিরে এলুম। বাবা কোথায়? বাইরের ঘরে দেখলুম না ত!"

গঙ্গামণি আঁচল দিয়া পুত্রের ললাটের ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিতে দিতে উত্তর করিলেন, "তিনি ত বাড়ী নেই, শ্রীরামপুরে রয়েছেন যে। তা কি অসুখ হয়েছিল? পথ্যি করেচিস্?"

"হ্যাঁ, সে এখন সব ভাল হয়ে গেছে। বাবা কবে ফিরবেন?"

"শুন্‌চি ত আর দিন আষ্টেক ল[illegible]র। আয়, তবে চান্ করে নে, ততক্ষণে আমি দুটি ভাত ফুটি[illegible]!"

পিতা গৃহে উপস্থিত নাই শুনিয়া এক দিকে শচীকান্তের বক্ষের উদ্বেগআলোড়ন যতখানি কমিয়া গেল, অন্যদিকে আবার ঠিক সেই পরিমাণেই সে উৎকণ্ঠিত হ[illegible] যে জন্য সে আসিয়াছে, তাহা সাধন করা যে কত কঠিন, তাহা তাহার নিজের

অজানিত নয়। ছেলেবেলা হইতেই তাহার স্থিরদৃষ্টি গম্ভীরমূর্ত্তি পিতাকে বেত্র-হস্ত গুরুমহাশয়ের অপেক্ষাও সহস্র গুণ অধিক পরিমাণে সে ভয় করিয়া আসিয়াছে। আড়ালে যতই তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করুক, সম্মুখে দাঁড়াইলে ভিতরকার অপরাধ তাহাকে ঠিক তত বেশী সঙ্কুচিত করে। তাই অন্তরের মধ্যে সন্তানের দাবী সে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আজ সেই পিতাকেই তাহার একান্ত প্রয়োজন!

যে দিন কন্যা দেখিতে গিয়া আকস্মিক লজ্জা-বজ্র দীর্ণ মস্তক লইয়া শচীকান্ত ঘরে ফিরিয়াছিল, সেদিন তাহার অপমান-ক্ষুব্ধ চিত্ত ক্ষণকালের জন্য নিজের প্রতি তীব্র ঘৃণায় ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আত্মধিক্কারের মধ্যে সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, এই লজ্জাজনক ব্যাপারের পর ইহাদের সহিত আর কোন সম্বন্ধ সে রাখিবে না। এখান হইতে দূরে সরিয়া গিয়া এই মুহূর্ত্তের লজ্জাকে চাপা দিয়া ফেলিবে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে এই সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিল না। কারণ, বোধ হয়, না বলিলেও চলে? সে দিনকার আলোকোজ্জ্বল প্রভাত তাহার চিত্তে বিগত বসন্তের সমস্ত মধুরতা ঢালিয়া দিয়াছিল, এবং তাহারই মধ্যে সেই পক্ষী[illegible]হচারিণী মেয়েটি তাহার মুগ্ধ নেত্রে দৈত্যপুরীর রাজকন্যা[illegible] মতই সোণার কাঠির স্পর্শে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। শচীকান্ত সেই মুখের ছবিটাকে মনের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সমস্ত লজ্জা জয় করিয়া ফেলিল। সে[illegible] আকাশ যখন আপনাকে নত করিয়া আনে, বাতাস আপনাকে নিবেদন করিয়া দেয়, তখন আর এই

আত্মনিবেদনকারী হৃদয় লইয়া তাহার মানবচিত্ত কেমন করিয়াই বা ফিরিয়া আসিবে? সে ত তাহাকে নিজেরই 'কনে' ভাবিয়া সেই অম্লান সূর্য্যকরে শুভক্ষণে শুভদৃষ্টিতে দেখিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর সে সম্বন্ধ ছাড়াইতে যাওয়া চলে না।

পিতা বাড়ী নাই শুনিয়া তাহার মনটা একটু সুস্থ হইল, দুই দিন তবু জিরাইয়া লওয়া যাইবে! আবার বিলম্ব হইয়া গেলে হয়ত—বড় মেয়ে,—তাহারা ব্যস্ত হইয়া অন্য পাত্র দেখিতেও পারে, ইহা ভাবিয়াও উদ্বিগ্ন হইল।

৭

বেলা পড়িয়া গিয়াছে। গোধূলির হেমাভ রক্তরাগে অস্তাচল-শায়িত তপনের শাসন তাম্রলিপি পশ্চিম আকাশে জলন্ত সোণার অক্ষরে ফুটিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার ছায়া তখনও পূর্ব্বের নদীপার ছাড়িয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ হয় নাই। গ্রামের মেয়েরা ঘাটে আসিল, গা ধুইয়া জল লইয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল। যাহারা দল বাঁধিয়া আসিবার অবসর পায় নাই, তাহারা একে একে ক্ষুণ্ণ গতিতে আসিতেছে, কাজ সারিয়া আবার সুন্দরীর কালো চুলের মধ্যে সরু সাদা সিঁথিটুকুর মত, দুই পাশের সবুজ ঘাসের মধ্যে রেখাঙ্কিত পথটি ধরিয়া আম গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ, বকুল ফুলের গন্ধে আমোদিত, পত্র কণ্টকিত পুষ্প-ভূষিত কানন মধ্য দিয়া ঘরে ফিরিতেছিল।

গাঙ্গুলি বাড়ীর মণীশ সম্মুখ দিকে ফুল বাগানে বসিয়াছিল। নানা জাতীয় লতা ক্রোটনের বিচিত্র ব[illegible]বলী, আর দেশী বিদেশী ফুল গাছের মধ্যে বর্ণ ও গন্ধ অপর্য্যাপ্ত পুঞ্জিত হইয়াছিল।

সাদা রাঙ্গা করবী, জবা, চাঁপা ও জুঁই গাছের ডালগুলা ফুটন্ত ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেই গাছগুলা ঘিরিয়া ঘিরিয়া প্রজাপতির দল এবং দুই একটা মৌমাছিও মধু-চক্র রচনার লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বাগানের কোকিলটা কিন্তু নিতান্ত সেকেলে। সে এই সাজান বাগান ছাড়িয়া তাহার চিরদিনকার পুরাতন আমগাছের ডালে বসিয়া অজস্র পাতার আড়ে আপনার কালো শরীর লুকাইয়া গাহিতেছিল, "কু-উ"!

ফুল বাগানে বাঁধান বেদীর উপর বসিয়া মণীশ বই পড়িতেছিল। সে সবে এই দুই একখান মাত্র উপন্যাস পড়িয়াছে; আজও প্রথমটা লর্ড লিটনের একখানি বিখ্যাত রচনা লইয়া বসিয়াছিল, তার পর তাহা অত্যন্ত ক্লান্তিকর বোধ হওয়ায় উপন্যাস ছাড়িয়া কাকার পড়িবার ঘরে গিয়া একখানা ইংরাজি 'লজিক' লইয়া আসিয়াছে।

এমন সময় এক ব্যক্তি লোহার গেটের মধ্যে ঢুকিয়া ডাক দিল, "কিহে মণীশ কি হচ্ছে?"

মণীশ খুব মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ করিতেছিল। লেখকের নাস্তিকতার তর্কে তাহার প্রশান্ত ললাটের প্রচ্ছন্ন দীর্ঘ শিরা ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিলেও অধরে দশন চাপিয়া সে অধিকতর আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছিল। মাতৃ-অঙ্কে শয়ন করিয়া যে অভাগা মাকে চিনে না, সে যেমন কৃপার পাত্র, ভগবানের এই এত বড় দয়ার রাজ্যে স্থান পাইয়াও যে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না, সেও তেমনই কৃপার্হ।

বন্ধুর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ সে বিস্মিত হইয়া ফিরিল। সবিস্ময়ে উঠিয়া কহিল, "[illegible] এলে যে?"

থাকিয়া কোন সঙ্কোচের কথা কহিতে বাধা কম বোধ হয়। ত্বরিতে সে উঠিয়া কহিল, "আঃ, এমন সন্ধ্যাটা আল্‌সে হয়ে বসে নষ্ট করো না। এস, বেড়ান যাক" বলিয়া সে মণীশের হস্ত আকর্ষণ করিল; কহিল, তোমাকে আমার কিছু বলিবার আছে মণীশ!"

শচীকান্তর স্বর কাঁপিয়া উঠিল। বিস্মিত মণীশ অকস্মাৎ চলা বন্ধ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখে তাহার দুই চোখের উৎসুক দৃষ্টি নীল আকাশের মধ্যে যেন দুইটি দীপ্ত নক্ষত্রের মতই জ্বলিতেছে।

মণীশ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"এস, বল্‌চি" বলিয়া আবার সে চলা আরম্ভ করিল; কিন্তু অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না। মণীশের বিস্ময়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা ফুল বাগানের সীমা অতিক্রম করিয়া আম্র কাননের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। শুক্লা পঞ্চমীর অপরিণত শিশু চন্দ্র গভীর নীলিমার এক প্রান্তকে দিবা কিরণ-রঞ্জিত করিয়া দেখা দিয়াছেন। স[া]রি বাঁধা মল্লিকাগুলার কাছ দিয়া যাইবার সময় সেগুলা তাহাদে[র] [illegible] খানিকটা সুমিষ্ট গন্ধ দিয়া আতিথ্য-ধর্ম্ম পালন করিল। এক[টি] ফুল তুলিয়া তাহার ঘ্রাণ লইতে লইতে মণীশ ঈষৎ কৌতূহলে[র] সহিত ফিরিয়া নিস্তব্ধ শচীকান্তের মুখের দিকে চাহিল, কহিল, "[ক]ৈ, কি, তা বল্লে না?"

"বলি—" বলিয়া শচীকান্ত একটি [illegible] বলি[য়া] শুধু [illegible] হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া তাহা হইতে [illegible] অর্দ্ধ-ফোটা মাল[তী]া ছিঁড়িয়া

লইতে আরম্ভ করিল। সেদিনকার সেই কথাবার্ত্তার পর বহু চেষ্টাতেও সে এই কথাটা খুলিয়া বলিয়া আপনাকে খাটো করিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। সে জানে মণীশ দুই একটা বিষয় ছাড়া নিজেকে তাহা হইতে আর সকল বিষয়েই ছোট মনে করে। কিন্তু না বলিলেও নয়; সঙ্কোচ না মানিয়াই তাই চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "সেদিন তোমায় যে সম্বন্ধটার কথা বলেছিলাম, মনে আছে ?"

মণীশের সে কথা মিথ্যা বলিয়াই ধারণা জন্মিয়াছিল। তাই সে সেদিক দিয়া না ভাবিয়া অন্য কোন কথা মনে করিয়া একটু ভাবিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিছুই মনে পড়িল না, উত্তর দিল, "কৈ, না।"

শচীকান্ত ইহা বুঝিল, তাই অকারণ ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল, "মনে নেই, সেই নিখিল বাবুর বোনের কথা ?"

মণীশ চমকিয়া উঠিল, "সে তবে মিথ্যা নয় ?"

শচীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। যদিও এই সামান্য প্রশ্নে রাগ করিবার কথা নয়, তথাপি প্রশ্নের ধরণে শচীকান্তর ঈষৎ ক্রোধের উদয় হইল। গম্ভীর ভাবে সে কহিল, "মিথ্যা না হওয়ায় ক্ষতিটা কি ? নিখিল বাবু এ বিয়ের জন্য বাবার মত চান, আমি তাঁর মত নিতে এসেচি।"

বর্ষার চলন্ত মেঘের ম[illegible] মণীশের মুখের উপর যেমন একটা ক্লেশের ছায়া সহসাই অ[illegible]িয়া পড়িয়াছিল, তেমনই শীঘ্র তাহা সরিয়া গেল। অনুতপ্তভা[illegible] সে বন্ধুর বাহুর উপর হাত রাখিল, কহিল, [illegible] আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। এ যদি হয় ত, [illegible] তাঁকে বলেছ ?"

শচীকান্ত কহিল, "তিনি বাড়ী নেই, তা ছাড়া আমি নিজে কেমন করেই বা এ সব কথা তাঁকে বল্‌বো ? তোমাকেই ভাই আমার এই কাজটি করতে হবে,—তুমিই বলবে যে, রাঢ়ী-বারেন্দ্র সম্মিলনে তিনি তাঁর মত চেয়েছেন,—তিনি যদি মত দেন, তবে বাধা দেবে কে ? বেশ করে একটু গুছিয়ে বলো। দেখো ভাই এখন আমার জীবন মরণ তোমার হাতেই নির্ভর করচে।"

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "আমার যথাসাধ্য আমি বলব, সে জন্য অত করে বল্‌তে হবে না। কিন্তু ঐ যে কথাটা বল্লে শচীন্, ওটা যেন বইয়ের কথা। সেই মেয়েটিকে একটি বার বুঝি দেখেছ ? তাতেই তার উপর জীবন মরণ নির্ভর—বল কি ?"

শচীকান্ত মনে মনে চটিল, কিন্তু বাহিরে হাসিয়াই কহিল, "যদি কখনও দিন আসে, তবেই দেখা যাবে। তুমি এত অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে চাইছ, কিন্তু তাকে যদি দেখতে, তা হলে বুঝতে ! চাঁদকে না দেখা থাকলে ছবির চাঁদ থেকে কি চাঁদের সৌন্দর্য্য বোঝা যায় হে ?"

মণীশ হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতেই কহিল, "তার গায়ের চামড়াখানা তোমার আমার চেয়ে না হয় কিছু সাফ্, কিন্তু তাই বলে কি সেখানা তোমার আমার চে বেশী দিন টেঁকবে বল্‌তে পারো ? মানুষ ত আর ছবি নয়—চে[illegible] ভালমন্দ নিয়ে কি হবে !"

"সুন্দর বস্তু চির আনন্দের (A hing of beauty is a joy for ever)— একথা কবি ব[illegible]ছেন, দার্শনিক বলেছেন, প্রকৃতি নিজে বল্‌চে। শুধু তুমিই '[illegible] বলে [illegible]ণীশ শুধু[illegible]! তুমি কি সৃষ্টি ছাড়া ?"

আধ-ফোটা মালা

মণীশ হস্তস্থিত ফুলটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, পরে হাসিয়া কহিল, "বোধ হয়, আমি সৃষ্টিছাড়াই। জগৎকে আমি সাদা কালো দিয়ে বিচার করতে পারিনে, তার ভিতরে এক চির নবীন চিরসুন্দর আছেন, তাঁকে দিয়েই জগৎকে দেখি। তাঁর কোন রং নেই, রূপ নেই।"

মণীশের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও উদাস হাসিটুকুর মধ্যেও তাহার সহানুভূতির অচপল প্রতিজ্ঞার সুর ধ্বনিয়া উঠিল। শচীকান্ত তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া নিজের মধ্যে একটা বল পাইল। সে যখন চেষ্টা করিবে বলিয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই করিবে।

মণীশের সঙ্গে তাহার মতের মিল নাই, চরিত্রের মিল নাই, অথচ এই দুইটি হৃদয়ের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একতার একটি স্বচ্ছ প্রবাহ কেমন করিয়া বহিতেছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। দুইজনেই দুইজনকে ভালবাসিত, বন্ধু বলিয়া মনে করিত, বিশ্বাস করিত। আজও মণীশ প্রফুল্লচিত্তে বিশ্বাস করিয়া লইল যে, শচীকান্ত নিখিলবাবুর নিকট যেটুকু গোপন রাখিয়াছিল, তাহা জানাইতেই সহসা কলিকাতায় চলিয়া গিয়া সে আপনার ভুল সংশোধন করিয়া আসিয়াছে। ভুল করা মানুষের ধর্ম্ম,—সে ভুল যে স্বীকার করিতে পারে [illegible] স্বীকারান্তে তাহার হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া [illegible]ত পারে, সে-ই ত মানুষ।

সে তাহার এমন [illegible] জন্য নিশ্চিন্ত রহিল না। প্রথমে শিবনারায়ণের নিকট গেল। যাহা বলিবার ছিল, তাহা তাঁহাকে জানা[illegible] "রাঢ়ী [illegible]রেন্দ্রর মধ্যে বিবাহ চলা কি উচিত নয়?

শিবনারায়ণ চশমাশুদ্ধ দুই চোখ ভাইপোর মুখের দিকে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কে বল্লে, উচিত নয় ?"

সে একটু ইতস্ততঃ করিল, কহিল, "কেউ ত চালাবার চেষ্টা করেন না—হিন্দু সমাজের এজন্য খুব বেশী যত্ন নেওয়া দরকার।"

শিবনারায়ণ কহিলেন, "যখন দরকার হবে, তখন চেষ্টাও নিশ্চয়ই জাগিতে বাকি থাকিবে না, স্বয়ং ঈশ্বর তখন লোকের মনে নিজে চেষ্টা এনে দেবেন।"

মণীশ এ কথা মানিত। কিন্তু এইটুকু সে মনে মনে ভাবিল, "কে জানে, এখনই সে সময় আসে নাই ?"

শিবনারায়ণ কহিলেন, "নিখিলবাবু খুড়া মহাশয়ের অনুমতি চেয়েচেন, তা বেশ আমিই তাঁকে সে কথা বলিতে পারি। কি বল ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী ফিরিবার দুই দিন পরে একদিন মণীশের খুল্লতাত উৎকণ্ঠিত মণীশকে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানা কাগজ দিয়া কহিলেন, "নিখিলবাবু—না—কে, তাঁকে পাঠিয়ে দিও। তাঁর এতে সম্মতি আছে।"

মণীশের অত্যন্ত আনন্দ হইল। বন্ধু হইয়া বন্ধুর জন্য তবে কিছু সে করিতে পারিল ! কাগজখানা সে খুলিয়া দেখিল, শচীকান্তর পিতা লিখিয়াছেন,—

"রাঢ়ী-বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি আদান প্রদান শাস্ত্রসম্মত, এবং সামাজিক ক্ষতিকর নহে। পথ ক্লেশের জন্যই ইহা পরিত্যজ্য হইয়াছিল। এক্ষণে [illegible] শুধু সুগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে [illegible] দেশে

বিবাহ চলিত হওয়া প্রার্থনীয়। যাহা শাস্ত্র-সম্মত, কালানুসারে লোকাচার-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেও তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় প্রত্যবায় হয় না। আমি এইরূপ বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ সম্পন্ন করাইতে প্রস্তুত আছি। শ্রীউমাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ।"

এই পত্র যখন শচীকান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিল, তাহার চোখে তখন আকাশের রং সোণা মাখা ও ক্ষুদ্র অসজ্জিত ঘর নন্দনকাননের শোভা ধারণ করিল। সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আত্মসংবৃত হইবার চেষ্টায় বাক্স গুছাইতে উঠিয়া গেল।

মণীশ কহিল, "এইবার কেন সব কথাই খুলে বলা যাক্ না।"

শচীকান্ত কহিল, "কন্যাপক্ষেরই এটা আগে বলা উচিত।"

শচীকান্ত ঠিক করিয়াছিল, কাল পরশুর মধ্যেই সে কলিকাতায় ফিরিবে, কিন্তু প্রতিকূল ঘটনা তাহার এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে বাধা দিল।

মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন, বড়দাদার ছেলের উপনয়ন এবং মণীশের গৃহে প্রীতি-ভোজ উপলক্ষে আরও পাঁচ ছয়দিন তাহাকে গৃহে কাটাইতে হইল। বিদায়কালে মনটা এবার কিছু উদার ছিল। প্রণাম করিয়া পিতার পদধূলি সে মাথায় গ্রহণ করিল। উমাকান্ত প্রসন্ন মুখে তাহার মাথার উপর দক্ষিণ পানী রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেন আসিলে? কেনই বা আবার যাইতেছ? কিছুই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। কাহারও প্রতি তাঁহার বিরক্তি ছিল না, আকর্ষণও তেমন প্রবল নহে।

[illegible] নিভৃত কামরা লাভ করিল। ইহাও সে অ[illegible] ভাগ্য [illegible] মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না।

একেলা বসিয়া সেই একবার-দেখা মুখখানি,—যাহা সেদিন নীল আকাশের তলে প্রভাত-রৌদ্রে মণ্ডিত হইয়া, মেঘের মধ্যে তড়িৎ যেমন খেলিয়া যায়, সেই ভাবেই তাহার হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি তীব্র আলোর রেখা টানিয়া দিয়া গিয়াছিল,—তাহারই কথা প্রসন্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিল।

দুইধারে চলন্ত গাছ, মাঠ ও বাতাস যেন স্বপ্ন-পুরীর শোভায় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া তাহার চক্ষুকে সার্থক ও চিত্তকে শান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমেই সে নিজের বাসায় গেল না। গাড়ী হইতে নামিয়া দ্বারে সমুপস্থিত বামুন ঠাকুরের হাতে জিনিষপত্র নামানোর ভার দিয়া একেবারে দ্রুত পদে সে নিখিল-নাথের বাসার দিকেই চলিল। কাগজখানা মুঠা করিয়া হাতের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। বিলম্ব সহিতেছিল না।

স্পন্দিত বক্ষে দূর হইতে দেখিল, বাড়ীর উপর নীচে সমুদয় দ্বার রুদ্ধ, জানালা বন্ধ,—মনুষ্য-বাসের চিহ্নও নাই।

শচীকান্তর বক্ষে যেন কিসের আঘাত পড়িল। সমস্ত চিত্ত বিকল করিয়া কানে কানে কে যেন বলিয়া উঠিল, তাহারা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে! মাতালের ম[illegible] তাহার পা টলিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরুপায় ক্রো[illegible]আগুণের মত দপ্ দপ্ করিয়া মাথার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতে লা[illegible]।

বাড়ীর পাশেই রামধন সেকরার দোকান। স্বর্ণকার তাহাকে চিনিত। রাস্তার আলোকে জনহীন ব[illegible]টার[illegible] শুধু নেত্রে ভূতের মত তাহাকে ঘুরিতে দেখিয়া [illegible]দিন

হইলে হয়ত শচীকান্ত সেই খোলার ঘরের গৃহবাসীর আহ্বানটাকে অপমানজনক ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিত না; কিন্তু আজ নিজের গরজ—ভাবিল, হয়ত সে ইহাদের নূতন বাসার সন্ধান দিতে পারে। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারবাবুরা কোথায় গেছেন, জানিস্ ?"

রামধন একটুখানি চুপ করিয়া রহিল, তার পর কহিল, "আপনি কি দেশে গিয়েছিলেন না কি ? কিছুই জানেন না ?"

ইহার ভিতর আরও কিছু জানিবার আছে না কি ? অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি কোন যোগ্য পাত্র হঠাৎ খুঁজিয়া মিলিয়াছে ? বৈশাখের সন্ধ্যায় শুভলগ্নের কিছুই ত অভাব ছিল না! সে নিস্পন্দ থাকিয়াই উচ্চারণ করিল, "কি ?"

রামধন তখন হঠাৎ আক্ষেপের স্বরে কহিয়া উঠিল, "সে আর কি বলব! আজ সাতদিন হয়ে গেল, মায়ের দয়া হয়ে ডাক্তার বাবুটি মারা পড়লেন,—বড় ভাল লোক ছিলেন, ভারী ভদ্দর—আমার তেনার অমন হাঁপিং কপ্‌টা সারিয়ে দিলে। একটী পয়সা নিলে না।"

শচীকান্ত বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সেই পরিত্যক্ত গৃহের পানে তাকাইয়া রহিল। ব[illegible]সের ছায়া দীর্ঘ হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, রেলিংগুলার বক্র ছ[illegible] বারান্দার দেওয়ালে আঁকার মত দেখাইতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েরা কোথায় গেলেন ?"

[illegible] "তা ত জানিনে বাবু,—ডাক্তারবাবুর ব্যা[illegible]গোছ ভদ্দর নোক এখানে এসেছিলেন,

সব চুকে বুকে যেতে তিনি বাড়ী ছেড়ে দিয়ে গাড়ী ডাকিয়ে চলে গেলেন। আহা, বুড়ী ঠাকুমা আর ছোট বোনটি, কি কান্নাটাই যে কেঁদে গেল,—সে মনে করতেও প্রাণটা যেন ফেটে যায়। তা বাবু, এখন কলিকাল, এই রকমই এখন হবে! সে রাম-রাজ্য আর নেইত যে অকাল মরণ হবে না।"

এই বলিয়া কাল-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে রামধন একটী সরু চিমটা লইয়া মাটির গামলা হইতে জলন্ত টিকা উত্তোলনে মনঃসংযোগ করিল। শচীকান্ত ধীরে ধীরে বাসার দিকে ফিরিল। দৈবকে সে কোনদিন বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে আজ স্বীকার করিতে হইল। 'তাহারই করুণা-বর্ষণই বুঝি আজ সেই বিদ্যুৎ-প্রভা তরুণীকে তাহার জীবনের মাঝখান হইতে বিদ্যুতের মতই অদৃশ্য করিয়া লইল। হায়, কবিজীবন যে চির অভিশপ্ত!

ঘরে বসিয়া সে আবার সেই কবিতার খাতা খুলিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে কবিতা লিখিতে বসিল, লিখিল,

"কেন হেরিলাম!
পতঙ্গ বহ্নির মুখে, পুড়িবারে ধায় সুখে,
তেমনি সে রূপানলে পুড়ে মরিলাম!
জ্বলন্ত পাবক শিখা, কেন পরশিলাম!"

৮

রজনীর যে স্তব্ধ মুহূর্ত্তে সমস্ত নিশীথ-কুসুমে[illegible] নিজ নিজ প্রেমাপ্লুত হৃদয়ের সুরভিরাশি সৃষ্টিকর্ত্তার [illegible] বলি[illegible] [illegible]রণ করিতেছিল, ঠিক সেই সময় তেমনি পু[illegible] চিত্তবা[illegible] [illegible]াত্ম

বিস্মৃতির মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়া কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে আবদ্ধ উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহোদ্যানটিতে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ধীরে ধীরে পদচারণ করিতেছিলেন। প্রতি রাত্রেই প্রায় এমন ঘটিয়া থাকে।

নীচে জমিতে মাটির আলের দ্বারা ভাগ করা ক্ষেত্রে কলাই-সুঁটির গাছ সাদা ও বেগুনি ফুলে ভরিয়া উঠে, ফুলের মধ্যে ভ্রমরের দল গুঞ্জন করিয়া ফিরে, উর্দ্ধে বিশাল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানটা উজ্জ্বল নক্ষত্রে খচিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে কয়টি মাত্র ফল-পুষ্প এবং আকাশের সমুদয় গ্রহ নক্ষত্রের অপ্রতিহত অধিকার গ্রহণ করিয়া পূজাপরায়ণ এই তপস্বীর চিত্ত সুদূর বিশ্বের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। সে বিহ্বল চিত্ত কখনও নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে উর্দ্ধে চাহিয়া অসীম রহস্যের লেখা পাঠ করিতে থাকে, কখনও জ্যোতির্ম্ময় দুইটি নেত্র-তারকা আপনার ভারে আপনি নত হইয়া আসিয়া অন্তরের মঙ্গল-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়ে। তারপর কোন্ সময় চারিপাশে পুষ্পমুকুলগুলি বিকশিত হইয়া উঠে, ফোটা ফুলের দল ঝরিয়া যায়, রাত্রির অন্ধকার ভোরের আলোকে মরিয়া আসে, তাহার কিছুই তাঁহার চোখে ধরা প[illegible]না। রাত্রির শেষ অন্ধকারকে ছিন্ন করিয়া দূরস্থ ল্যাম্পের বে[illegible]লাটির মত সূর্য্যের প্রথম উদয়ালোকের আভাস যখন পূর্ব্বাকাশ[illegible] গোলাপী আভায় রাঙ্গাইয়া তুলে, তখন তিনি স্নানে[illegible]ন্য প্রস্তুত হইতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া যান।

[illegible]টা হ্রস্ব [illegible] রাত্রি। বাহিরে বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়াও বহি[illegible]ন্যাবেশ্য মনো[illegible]রের মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের পরিদৃশ্যমান

জ্যোতিঃ এবং জগদতীত অজ্ঞাত আনন্দের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া আজও সেই মগ্ন-চিত্ত বিশ্বাতীত লোকে নিজের পরিপ্লুত আত্মাকে প্রেরণ করিয়াছিল। দেহ এই পৃথিবীর মাটীর উপর স্থির আছে, কিন্তু এই স্থূল দেহের প্রকৃত অধিকারী যিনি, তিনি তাঁহার নিজ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বাগানের এক প্রান্তে গোশালা, তাহাতে দুগ্ধবতী দুইটি গাভী ও গৃহিণীর স্বহস্ত সেবা দ্বারা পরিপুষ্ট দুই একটি গোবৎস বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে। গো-গৃহের বামে বিচালির গাদা এবং একটি ধান রাখা মরাই, রাত্রির অন্ধকারে স্থূল দীর্ঘ দুইটি নিস্তব্ধ প্রহরীর ন্যায়ই প্রতীয়মান হইতেছিল। কৃষ্ণ বসনাচ্ছন্ন, সতর্ক দৃষ্টি, আত্ম কর্ম্ম সজাগ যেন দুইটি বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য প্রভুর চরণ ক্ষেপ ধ্বনি গণনা করিয়া তাঁহার আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছে!

খসিয়া পড়া তারাখণ্ডের মত গোটা কয়েক জোনাকি গাছের উপরে নীচে চারিপাশে ঝিক্‌মিক্ করিয়া কাঁপিয়া বেড়াইতেছিল। আলেয়ার আলোকবিন্দু নিবিয়াই আবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। চারিদিক নিঃঝুম হইয়া রহিয়াছে। নিজের বাহুর উপর অন্ধকার কালো চুলের রাশি এলাইয়া দিয়া নিদ্রা-কাতরা বালিকার মত সমস্ত প্রকৃতি যেন অচেতন হইয়া রহিয়াছে [illegible] তাহারই ঘুমন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত ধীরে বায়ু বহিতেছিল, [illegible] ভিতর হইতে ঝিঁঝিঁর দল ঐক্যতান সুরে অতি মৃদু ঘুম পাড়া[illegible]য়া গান গাহিতেছিল। সমস্ত বিশ্ব চরাচর যেন কিসের একটা [illegible]াড়া পাই[illegible]র জন্য স্তব্ধ ব্যাকুল[illegible]য় উর্দ্ধপানে চাহিয়া আছে। [illegible] বলয় [illegible]

সার্ব্বভৌম মহাশয় সহসা এক স[illegible] বন্ধ [illegible]। সেই অন্ধকা[illegible] [illegible] চিত্তখা[illegible]

করিলেন। বাহ্যশক্তি শরীরের উপর আধিপত্য ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অন্তরের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। তাঁহার মনের মধ্যে তখন কি ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা বোধ হয়, তিনি নিজেও ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু কি যে এক অবক্তব্য অপরিজ্ঞাত ভাবের তড়িৎ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভিতরকার আনন্দময় কোষকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়া এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি-রসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখিয়া স্পষ্টই অনুভূত হইতেছিল।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ভোরের দিকে বিবর্ণ পাণ্ডু মুখে বিদায় লইল। অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলিতে জ্বলিতে নিবিয়া যাইতে লাগিল। জীবন্মৃত রোগীর মুখে আরোগ্যের নবীন আভার মত পূর্ব্ব-দিক ঈষৎ পরিষ্কার হইয়া আসিল। পথের কুকুরটা নিদ্রা-ক্লান্ত শরীর একপাশে মেলিয়া দিতে দিতে একবার ডাকিয়া উঠিয়াই নীরব হইল। উমাকান্ত সসংজ্ঞ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

স্নানপূজা সারিয়া বাহিরের ঘরে আসিতেই ছাত্র কয়টী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভক্তিনাথ আর্য্য-মিশনের ছাপা গীতাখানি খুলিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তক্তপোষের উপর আসন গ্রহণ করিয়া, পুস্তকখানির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিছু [illegible]নিবার আছে?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।" সম্ভ্রমের সহিত নিকটে আসিয়া ভক্তিনাথ পুস্তকখানি [illegible]র সম্মুখে ধরিলেন; দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম কয়টি শ্লোক [illegible] হ্রস্ব [illegible] চিহ্নিত; কহিলেন, "এইখানে যে ভগবা[illegible]য্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে, শ্রদ্ধয়া

পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ' এই শ্লোকে সগুণ উপাসককে যুক্ততম করিয়াছেন, তবে আবার এই সকল শ্লোকে নির্গুণ উপাসনাকেই বড় করিয়াছেন কেন? ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ ঠেকিতেছে না?"

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের চক্ষের জ্যোতি এখনও তরুণগণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ছিল। প্রবীণ অধ্যাপক তাঁহার এই পরিণত বয়সেও খোলা চোখে স্বচ্ছন্দে পড়া শুনা করিতেন। পুঁথির পত্রে দৃষ্টি রাখিয়া স্মিত গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "ভগবানের বাণী পরস্পর-বিরোধী হওয়া সম্ভব কি? এর অর্থ এই যে, যে সারূপ্য লাভ করিয়াছে, তার আর ভালমন্দে প্রভেদ কি? উপাসকদের মধ্যেই না 'তর', 'তম' থাকে।"

ভক্তিনাথ দ্বিধাহীন বিশ্বাসে মস্তক আন্দোলন করিল, "এই অধ্যায়ের সমস্তটুকু আজ যদি সুবিধা হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধ হাসিটুকু হাসিলেন, কহিলেন, "বাপু, আমার সুবিধার অভাব নাই, তোমরা যদি সুবিধা পাইয়া থাক, তবে এস, বুঝাইয়া দিতেছি।"

গীতা পাঠ চলিল। উপনিষদের রত্ন ভাণ্ডার, তাহার ভিতর-কার এই রত্নাধার দ্বাদশ অধ্যায়। ভগবানের প্রীতিপাত্র জীবন্মুক্ত পুরুষের কণ্ঠে সে বর্ণনা গম্ভীরতর পবিত্রতায় শুনাইতে লাগিল।

পাঠ সমাপ্ত হইলে ভক্তি বিস্ময়ে ও তাহার দলও তন্ময়চিত্ত। বক্তা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর শ্রোতৃবৃন্দ প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিল। উমাকান্ত তখন নিজের [illegible] যাত্রী পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভক্তি, রাম্মু [illegible] পটা

আনিয়া দাও দেখি, তাহাকে দিয়া আসিতে হইবে। মধু ময়রার নাতিটির জন্য দুই যোড়া কাশীর পাঁচনও আনিতে দাও। আচ্ছা, একখানি কাপড় রামুকে দেওয়া দরকার। উপস্থিত নূতন না পার, পুরাতনই লইয়া এসো।"

বাড়ী ফিরিয়া নূতন রোগী 'কেলো হাতির' শিশুটির সম্বন্ধে ভক্তিনাথকে কিছু উপদেশ দান করিয়া ও ছাত্রদলাসীন একটি যুবার নাড়ি দেখিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাঁহার চঞ্চলা নাতিনীটি কোথা হইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, কহিল, "আজ কে এসেছেন, বল দেখি?"

"কে?" বলিয়া উমাকান্ত গৌরীর গোলগাল মুখখানা দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিলেন। সেখানা দুষ্টামির হাসিতে আগাগোড়া ভরিয়া রহিয়াছে। চক্‌চকে দুইটা চোখ হইতে কৌতুক মিশ্র চপলতা যেন নির্ঝরের ধারার মতই ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে সহজে রহস্য ফাঁশ করিল না। হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল "বল না দেখি, কেমন পার? কক্ষণো পারবে না। আচ্ছা, শুণে বল। পারলে না? পারলে না? তুমি হেরে গেলে। এস, দেখবে এস।"

আর একটু অগ্রসর হইতে[illegible]ই একজন শুভ্র বসনা বর্ষীয়সী বিধবা আসিয়া প্রণাম করিল। [illegible] উমাকান্ত তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "গিরিজা!" [illegible]

গিরিজাসুন্দরী অঞ্চল প্রান্তের চাবিগুলা অঙ্গুলিদ্বারা নাড়িতে নাড়িতে [illegible]ত হাস্যের সহিত সজল কণ্ঠে কহিলেন, "আমি এসেছি[illegible]টা দুম্ব [illegible]লি, সবারই ত একটা না একটা

উপায় করচো, আমার জন্য এবার কি করবে, কর দেখি? এমন করে সবাই মিলে ভুলে থাকলে ত আর চলে না। ভাবলুম, দেখি, ভগবান এবার ভক্তকে কেমন করে এড়ান।"

উমাকান্ত গৌরীর অযত্ন ন্যস্ত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ নাড়িতে ছিলেন, চোখ তুলিয়া তাঁহার ভক্তের মুখের দিকে চাহিলেন, কহিলেন. "তোমার ভগবান ত তাঁর ভগবানত্ব সত্ত্বেও তোমার মনের কামনা জান্‌তে পারলেন না। এখন বল দেখি, ভক্তিমতি! তোমার তপস্যা কোন্ বর লাভের উদ্দেশ্যে? ইন্দ্রত্ব চাই, না অমরত্ব চাই?"

গিরিজাসুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "অমর হ'তে চাইনে ঠাকুর, মরতে পেলে এখনই বেঁচে যাই! তবে একটা কথা, —তুমি ঠিক বলেছ,—আমার মনের খবর তোমার কাছে কি আর লুকোনো আছে? তুমি যে অন্তর্য্যামী! শচীকান্তকে আমি আজ চাইতে এসেছি। তোমার ঐ ছেলেটিকে আমায় দিতে হবে।"

৯

শচীকান্তর মাসিমা গিরিজাসুন্দরী অনেক পয়সার মালিক। গ্রামের মধ্যে তাঁহারা এক রকম [illegible]মিদারের মতই ক্ষমতাপন্ন। বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ, [illegible]ল দুর্গোৎসব, সবই হয়। মামলা তদারকের জন্য একজন [illegible]কলও নিযুক্ত আছেন। দেউড়িতে দ্বারবান ও বাহির মহলে [illegible]মস্তা, নায়েব, সরকারেরও অভাব নাই।

বিষয়ের মধ্যে অধিকাংশই নী[illegible] ফসলও

মন্দ ফলে না। ধানের ক্ষেতে প্রতি বৎসর মা কমলা নিজে আসিয়া যেন আঁচপ্পি পাতিয়া বসেন। সেই সোনা-ফলা জমিগুলির উপর চারিদিককার লোকেরই শ্যেনদৃষ্টি। কিন্তু গিরিজাসুন্দরীর কড়া তদারকে এ পর্য্যন্ত কেহ ইহার মধ্যে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটিও গলাইতে সক্ষম হয় নাই একবার নায়েব কিস্তির টাকা লইয়া কি একটা ফেসাদ বাধাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কর্ত্রী ঠাকুরাণী পিঠের আঁচল মাথায় তুলিয়া দিয়া দৃঢ় পদবিক্ষেপে সম্মুখীন হইয়া অবিচলিত কণ্ঠে আদেশ করিলেন, "খাজনার বাকি টাকা কোথায় আছে, এনে দাও!" সে মুহূর্ত্তেই যাদু মুগ্ধের মত ধূর্ত্ত নায়েব বাক্‌শক্তিহীন শিশুর ন্যায় নিঃশব্দে তহবিল ভাঙ্গা টাকাগুলি নিজের গুপ্ত ক্যাস বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল। গিরিজা তাহাকে একটিও ভৎর্সনা করিলেন না, বা স্বামীর নিকটও কোন কথা জানাইলেন না। ভীত নায়েব প্রতি মুহূর্ত্ত সংশয়ের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিল। না তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, না পুলিস-সোপর্দ্দ করা হইল।

কিন্তু এই যে সুযোগটুকু তাহাকে দেওয়া হইল, ইহা তাহার জীবনের একটা মাহেন্দ্রযো[গে] পরিণত হইয়া গেল। এই ঘটনা হইতেই মানুষটা অসম্ভব র[কমে] বদলাইয়া গেল। সে নিজের মহাপাতক আজীবনের অনুতপ্ত প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। তাহার যত্নে ও চেষ্টায় নদীর সঙ্গে একটা খালের পুরাতন সং[যোগ] [illegible] হইবার পর রত্নপুকুরে রত্ন ফলিতে আরম্ভ [হইয়া]ছে। এখন কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত

বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহায়তায় বুদ্ধিমতী বিধবাকে কোনরূপ বৈষয়িক হাঙ্গামা পোহাইতে হয় নাই।

গিরিজাসুন্দরীর পুত্র সন্তান হয় নাই। এক মাত্র কন্যা কল্যাণী,—বড় লোকের ঘরেই তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার বাপের ঘরে সে যেমন একমাত্র মেয়ে, সে ঘরেও সে সেইরূপ একটি মাত্র বউ। কাজেই মায়ের কাছে থাকা তাহার বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। গিরিজাসুন্দরীর সাধ, মেয়েটি ছয় মাস বা শ্বশুর বাড়ী রহিল, ছয় মাস বা তাঁহার কাছে রহিল, কিন্তু বেহাই ইহাতে নারাজ।

গিরিজাসুন্দরী রাগ করিয়া দিনকতক ফুলের রাশি ও চন্দনের ভার দেবতার উপর অধিক পরিমাণে চাপাইয়া, পূজার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "আমার কি? আমি কাকে চাই? তুমিত আর কোথাও যাবেনা, ঠাকুর, তোমাকে পেলেই আমার হ'ল।" পদ্মবীজের মালাগাছি জপের ঘটায় দেখিতে দেখিতে কালো চক্‌চকে হইয়া উঠিল। কিন্তু মনের ঝোঁক মানুষ খুব বেশী দিন রাখিতে পারে না। চক্র যখন ঘুরিয়া আসিল, তখন হঠাৎ এই মৌন বিদ্রোহ ভঙ্গ করিয়া প্রবল রজঃশক্তি আপনার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিল। আগাগোড়া তেতালা বাড়িটা বর্ষার বাতাসে হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া তাঁহার নিকট নালিশ রুজু করিল, বলিল, একজনকে—অন্ততঃ একজনকে চাই। নহিলে ঘর সংসার এমন কি, ঠাকুরের আরাধনায়ও অবধি বুঝি, ব্যাঘাত ঘ[illegible] যা

ঘরে দ্বারে কুলুপ লাগাইয়া নায়েব মহাশয়ের হাতে সংসারের

ভার অর্পণ করিয়া একদিন ভোরের ট্রেণে দাসী ও সরকার সঙ্গে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

ছেলেরা তাহাদের মাসিমার কাছে যাওয়া আসা করিত। শচীকান্তর উপরই তাঁহার বিশেষ একটু টান, ছুটীর সময় সে প্রায় পিতৃগৃহের দৈন্যের চেয়ে মাসিমার ঘরের স্বাচ্ছন্দ্যটাই পছন্দ করিত।

গঙ্গামণি বোনের দাবী শুনিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। উমাকান্ত কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন, তারপর ডাকিলেন, "ভক্তিনাথ!"

"আজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিয়া ভক্তিনাথ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, "তোমার মাসিমার প্রস্তাব শুনিয়াছ?"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি ইচ্ছা?"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "উঁহাকেও ত একজনের দেখা উচিত, শচীই মাসিমাকে দেখা শুনার ভার নিক্।"

"তবে তাঁকে এই কথাই বলি? আর একটা কথা, তোমার মাসিমা তাঁর দেবর-কন্যার সঙ্গে ভবিষ্যতে ওর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ইহাতে সে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লাভ করিবে।"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "সে তো ভালই।"

বড়বধূ শুনিলেন। ইহা তাঁহার বিসদৃশ ঠেকিল। ইহাকে এক চোখোমী ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? কর্ত্তা গৃহিণীর ছোট ছেলেই সব, বড় যেন [illegible] হই নহে। ইংরাজী শিখিল ছোট, কলিকাতায় থাকি[illegible] হুস্ব [illegible]রিবে সে, আবার মাসির অতটা বিষয়, তাহাও [illegible]ভোগ করিতে চলিল। কেন, তাহারা কি বাপের জলে

ভাসিয়া আসিয়াছে? রাত্রে স্বামীকে কহিল, "মাসিমার সঙ্গে দিন কতক তুমিই কেন যাও না! তাঁর শরীর অসুস্থ। ছোটবাবুর দ্বারা ত আর সেবা যত্ন ঘটবে না, ওঁকেও ত দেখা উচিত।"

পত্নীকে পরের জন্য ভাবিতে দেখিয়া ভক্তিনাথ একটু সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যে ভাইয়ের প্রতি যে খোঁচা ছিল, সত্য হইলেও ইহা ভক্তিনাথের ভাল লাগিল না। তিনি কহিলেন, "না। আমার চেয়ে ও মাসিমাকে বেশী যত্ন করতে পারবে, ওঁর কাছে বরাবর থাকে।"

কণ্ঠস্বরে স্বামীর মনের খবর পাইয়াও বড়বধূ আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ঝাঁঝিয়া কহিলেন, "গেলে নিজেরই ভাল হ'ত। গলার এই সংসার করে দু-দশটা বিদায়ের টাকায় কি চির কাল চলবে? বলে, মানুষের কুটুম এলে গেলে,—সে সকল দিকেই জিতে গেল।"

বড়বধূর যে মন ভাল নয়, ভক্তিনাথ ইহা প্রথম হইতেই জানিতেন। ইহা লইয়া মধে মধ্যে তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষিও চলিত। স্ত্রীর স্বভাব যে তিনি বদল করিতে পারিবেন, এ আশা তাঁহার ছিল না। তিনি জানিতেন, যে যেরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে, তাহা [illegible]ন্তরীণ কর্ম্মসূত্রে পাওয়া। নিজের প্রবল চেষ্টা ভিন্ন অপরে সং[illegible]নের ইচ্ছা করিতে গেলে নিরাশ হওয়াই অনিবার্য্য। কিন্তু স্ত্রী[illegible] নিজের সঙ্কীর্ণ মত তাঁহার মা বাপ ভাইএর সম্বন্ধে প্রয়োগ করি[illegible], ইহা তিনি সহিতে সম্মত ছিলেন না। কহিলেন, "সে ত সুখে[illegible] যা ছোট ভাই, তার উন্নতির জন্য আমার চে[illegible] তোমার

মনটা একটু ভাল করবার চেষ্টা কর দেখি, বড় বৌ, ছোট দেওরের উপর অতখানি হিংসা থাকা ভাল নয়।”

বড়বধূ কহিলেন, “বলি, আর কেউত পোয়াতে আসবে না, সেই আমাকেই ত চার চালের ভার মাথায় করতে হবে ? ওই যে আইবুড়ো একটা মেয়ে খেয়ে খেয়ে হাতী হচ্চে, ওটাকেও ত পার করা চাই। দু’পয়সার সংস্থান না হলে কেমন করে কি হবে ? তুমি মনে কর, আমি কেবল নিজেরই জন্য ভাবি !”

“ও সব পরের কথা পরে—কেন মিথ্যে অত ভেবে মাথা খারাপ করচ ?”

ভক্তিনাথ উঠিয়া গেলেন। স্ত্রীর সহিত কথা কাটাকাটি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না।

১০

মণীশ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে আপনাকে জনস্রোত-চঞ্চল রাজপথে বাহির করিল, তখন তাহার হস্তে সদ্যোপ্রাপ্ত স্বর্ণ পদক এবং অঙ্গে কনভোকেশনের “গাউন”। কিন্তু সেই বেশে দেশের দশের নিকট আদৃত হইয়া আসিয়া সার্থকতার সুখ ও বিজয়-গৌরবের মাঝখানেই হঠাৎ তাহার মনে হইল, এখানে প্রবেশ এই তাহার শেষ বা[illegible]। তাহার মনে হইল, এই যে বইয়ের বোঝাগুলা নিত্য সে ব[illegible] বেড়ায়, যাহার জ্ঞান তাহার সমস্ত জীবন-ব্যাপী কালের মধ্যেও হয় ত কোন কাজে লাগিবে না, মনের সঙ্গে এবং মতের সহিতও যাহাদের সর্ব্বত্র মিল নাই, সেই গুলাকেই [illegible]বনের [illegible]চির সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিয়া দিনের পর দিন [illegible]ই দুর্ল্লভতর মানব জন্ম লাভ ঘটিয়াছে ?

সে দিন বাসায় ফিরিয়া এই কথাটাই সে ভাবিতে লাগিল। যেটুকু প্রয়োজন ছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এখন নিজের ঘরের জানালা দ্বার খুলিয়া দিয়া আকাশের ঐ ছড়ান অলোটুকুকে নিজের ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইতে হইবে। বাতির আলো চাহিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবার আর প্রয়োজন কি ?

বাড়ী ফিরিয়া শিবনারায়ণকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। আনন্দাশ্রু গভীর শোকাশ্রুর মতই কোন মতে চাপিয়া বলিলেন, "সুপুত্রের দ্বারাই কুল ধন্য হয়! মণীশ. দুঃখ শুধু আজ দাদা নেই।"

করুণাময়ী কহিলেন, "বাবা মণি! তুমি এলে, আমি বাঁচলুম বাবা, সতীকে নিয়েতো অস্থির হয়ে উঠেছি। তুমি ওর কি করবে, কর!"

মণীশ খুড়িমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "হাঁ। এবার তাকে আমিই নেব, খুড়িমা! তোমার আজ থেকে ছুটি।"

খুড়িমা নিশ্চিন্ত হইলেন।

একদিন শিবনারায়ণ তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "এবার তুমি কি করবে স্থির করেছ?"

মণীশ কয়দিন ধরিয়া এই কথাটাই তুলিবে তুলিবে মনে করিতেছিল। সে উত্তর দিল, "যে র[illegible] আদেশ করবেন।"

"সে ত বটেই! তবু তুমি কি ভ[illegible] মনে কর, বল দেখি, পরামর্শ করে দেখা যাক।"

মণীশ নত মুখে কহিল, "কলেজে না পড়ে এইবার সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কাছে কিছু সংস্কৃত শিক্ষা ক[illegible] বঙ্গ ভুবন[illegible] যা

ঠিক এই কথাটাই শিবনারায়ণের [illegible] অতি

যত্নে তিনি তাহা মনের ভিতর চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। শিব-নারায়ণ জানিতেন তাঁহার ইচ্ছা মণীশের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িলে সে নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অবলীলায় ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতেই ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। এক্ষণে মণীশের কথায় তাঁহার মনটা বড়ই প্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, তোমার ইচ্ছার চেয়ে কোন বড় ইচ্ছা আর কারও হতে পারে না। এস, আজ আমরা সার্ব্বভৌম মহাশয়কে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিই গে। কিন্তু তোমার খুড়িমারও ত মত নিতে হবে।

মণীশ খুড়িমার উদ্দেশ্যে উঠিয়া গেল।

করুণাময়ীর সম্মতি আদায় করা বড় সহজ হইল না। তিনি কথাটা এমন ছোট করিয়া ধরিলেন, যেন মণীশ কি একটা হীন কার্য্যই করিতে চাহিয়াছে, ইহা কখনও হইতে পারে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেবতা, স্বয়ং ভগবান, কিন্তু তাই বলিয়া মণীশ—ওরে বাপরে! তাঁহার দুধের ছেলে, সে কোন্ দুঃখে টোলে বসিয়া পূজার মন্ত্র শিখিবে? কত দিন ধরিয়া তিনি আশা করিয়া রহিয়াছেন, সে তাহার কাকার মত একটা বড় চাকরী করিবে, নূতন চণ্ডীমণ্ডপে মাকে আনিয়া তিনিও জন্ম সফল করিবেন, কাঙ্গাল অতিথি ডাকিয়া অকাতরে তাহাদের পেট ভরাইয়া চিড়া দধির আহার দিয়া প্রান ভরা আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া লইবেন। তাহার পর আবার কোন এক মস্ত বড় মানুষের চাঁদের মত মেয়েকে বধূরূপে গৃহে আনিয়া পাড়ার লোকের চক্ষু ঝলসিয়া দিবেন। ইহা[illegible]টা হ্রস্ব [illegible]টা কথার মত কথা হইল—সে চাকরি বাক[illegible] পড়িবে!

কিন্তু মণীশের খুড়িমা নারী হইলেও হিন্দু ঘরের মেয়ে, স্নেহময়ী মাতা এবং সতী স্ত্রী, কাজেই স্বামী পুত্রের ইচ্ছার মধ্যে নিজের তীব্র বাসনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না। তিনি কহিলেন, "তোদের যাতে সত্যিকার ভাল হয়, তাতেই আমি সুখী, আমার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিসের।"

১১

অপরাহ্ণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে সে দিন একটি ছোট রকমের সভা বসিয়াছিল। টোলের ছাত্রগুলি ত ছিলই, তদ্ভিন্ন প্রতিবেশী দুই চারিজন তথায় উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি নবদ্বীপ হইতে একজন পণ্ডিত আসিয়া উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও কয়দিন প্রভাতে অপরাহ্ণে ছাত্রদের লইয়া শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন। কথাপ্রসঙ্গে দুই পণ্ডিতের মধ্যে একটু তর্কও উঠে. শ্রোতার দল বিস্ময় কৌতুকে আগ্রহের সহিত বিচার শ্রবণ করিয়া যায়।

সেদিন শ্রীপতি বাবু সাকার ও নিরাকার উপাসনাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় কহিলেন, নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞান পাইয়াছে, তাহার সাকার উপাসনার প্রয়োজন নাই. নতুবা ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহার শুধু গোটাকয়েক কথা মাত্র শুনা বা পড়া আছে, তাহার পক্ষে প্রতিমাদির পূজা ত্যাগ করিয়া দুই কূল হারাইলে কি লাভ হইবে? নির্গুন নিরাকারকে ধারণা করিতে পারিবার জন্য পূর্ব্বে তপস্যার প্রয়োজন। চিত্ত শুদ্ধির জন্য শম, দম ইত্যাদির অভ্যাস এবং [illegible] মনকে অবলম্বন দিবার জন্য দেব প্রতিমায় চিত্ত[illegible]জন।

বনিয়াদ দৃঢ় না হইলে অট্টালিকা দৃঢ় হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার পর পূজাদি সাকার-উপাসনা কেবল অজ্ঞানদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য।

শ্রীপতি বাবু কহিলেন, "কিন্তু মনে করুন, কোন উপাসক সাকার উপাসনায় বেশ ফল লাভ করিলেন, কিন্তু সেই বিশেষ মূর্ত্তি তাঁর চিত্তে এমনি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল যে তাঁকে সেখান হ'তে সরিয়ে নিরাকার নিগুর্ণের ভাবনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না, চিরদিনই সেই মূর্ত্তির উপাসক হয়েই তাঁকে কাটাতে হ'ল।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় কহিলেন, "তাতে ক্ষতি কি? যিনি তাঁর উপাস্য মূর্ত্ত, তিনিই চিৎস্বরূপ পরব্রহ্ম। যার চিত্ত যে রূপে যে নামে তাঁর যে বিভূতিতে আকৃষ্ট হয়, তার পক্ষে সেই সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভগবান যে বলেছেন, 'পরধর্ম্ম ভয়াবহ'—সে পর-ধর্ম্ম এইরূপ। প্রকৃত নির্গুণ উপাসক এ জগতে ক'জন আছেন? কিন্তু ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তি বিশ্বাসে বিশ্বাসীভক্ত সাধকের অভাব নাই। ভক্তি প্রেমের পথ সহজ, তাই এই পথেরই যাত্রী বেশী, আর এ পথও ভুল পথ নয়।"

শ্রীপতি বাবু এই দেড় বৎসর দুই বৎসর ধরিয়া গীতাপাঠ ও পূজার্চ্চনা করিতেছেন, সর্ব্বদাই প্রায় তাঁহাকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আসিতে দেখা যায়, এবং ভাইয়ের সহিত পূর্ব্বে যে মকর্দ্দমা চলিতেছিল তাঁহার সহিত পরিচয়ের পরই তাহা উঠাইয়া লইয়া-ছি[illegible]খিয়া প[illegible]জনে বলাবলি করিত,—লোকটা এখন [illegible]ল[illegible]টা হুস্ব হ[illegible]

বা[illegible]

শ্রীপতি বাবু কহিলেন, "নিগুর্ণ উপাসনায় ব্রহ্মকে পাওয়ার কথা আছে, সাকার পূজায় ত মুক্তির সম্ভাবনা নাই।"

উমাকান্ত ঈষৎ হাসিয়া ডিবা হইতে নস্য গ্রহণ করিলেন, কহিলেন, "সাকার পূজায় মুক্তি নাই থাকুক, উপাস্যের প্রাপ্তি আছে ত? শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, উপাস্যের ভাবে ভাবিত না হলে উপাসনা করা যায় না। 'শিবো ভূত্ব শিবমর্চ্চয়েৎ'—শিব হয়ে শিবার্চ্চনা করিতে হয়। তবেই দেখছ, উপাসক যদি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তবে আর তাঁর ব্রহ্মকে পেতে বিশেষ বাধা রহিল না। মোট কথা এই যে, যা করবে, তা কায়মন বাক্যের দ্বারা যথার্থরূপে করিতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কারণ জ্ঞান যতক্ষণ পরিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। যখন জ্ঞান বৃহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ায়,—সমস্ত জাগতিক জ্ঞানের সমষ্টি অর্থাৎ বিশ্বের যত কিছু ব্যাপারের সমষ্টিভূত জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই বলেছি, যাকে ভাবনা করা যায়, তার ভাবে ভাবিত না হতে পারলে তাকে পাওয়া যায় না, হওয়া—ও পাওয়া একই কথা। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞান পেতে হলে সাধককে ব্রহ্ম হতে হবে। 'স যো বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হয়েছেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বহু জন্মের তপস্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়া এর চেয়ে ঢের সহজ, কারণ অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা ও মহিমাময় ঈশ্বরের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নয়; তা বৃহৎ কিন্তু বৃহত্তম নয়। ভগবান বলেছেন, 'ক্লেশো [illegible] তেষাম-ব্যক্তাশক্তচেতসাম্।'

শিবনারায়ণ ও মণীশ এক পার্শ্বে বসিয়া এই আলোচনা শুনিতেছিলেন।

শিবনারায়ণ এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ব্রহ্মোপাসনা চেষ্টা সঙ্গত নয়?"

"কেন নয়? অধিকারী ভেদে উপাসনা ভেদ। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান পাবার যোগ্য হয়ে জন্মেছেন, তিনি সেই দিকে নিজ হতে অগ্রসর হবেনই হবেন। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, এঁদের সকলকার আবির্ভাবেই দেখবে যে, যে কর্ম্মের জন্য যিনি সৃষ্ট, সহস্র বাধার মধ্য দিয়ে সেই দিকেই তাঁদের গতি। নদীর স্রোত কেবলই পাথর ঠেলে সমুদ্রের দিকে চলে, আবার সমুদ্র-বাষ্পের গতি উর্দ্ধ মুখেই।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইল সন্ধ্যার্চ্চনার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মণীশ ও শিবনারায়ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া মণীশের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, "খুব ত যশস্বী হয়ে উঠেছ! এখন থেকে আমাদেরই হয় ত ডবল অনার্স পাশ মণীশ বাবুর সঙ্গে কথা কইতে ভয় হবে আঁ!"

মণীশ লজ্জা সঙ্কোচে জড় সড় হইল। শিবনারায়ণ বিনম্রভাবে কহিলেন, "আপনারই আশীর্ব্বাদের জোরে—"

উমাকান্ত কহিলেন, "আহা না, ওর কীর্ত্তিটুকু তুমি অমন করে নষ্ট কর্‌ো না, শিব! বেচারা দু'দু' বৎসর ধরে খাটলে, আর [illegible] হয় [illegible]ক এর ফলভাগী করে তুললে ত ঠিক হবে [illegible]? এ সব তোমার নিজগুণে এবং

তোমার পিতৃ পিতৃব্যের পুণ্যে। এখন দীর্ঘজীবী হয়ে দেশের আর দশের কল্যাণ সাধন করে জন্ম সফল কর।"

শিবনারায়ণ অতঃপর মণীশকে তাঁহার শিষ্য করিবার ইচ্ছা জানাইলে প্রবীণ অধ্যাপক সানন্দে সম্মতি দান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া উভয়কে বিদায় দিলেন। মণীশ যে সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিল উমাকান্তের নিকট হইতে তাহা সে একান্ত দৃঢ় করিয়া লইয়া ফিরিল। তাঁহার প্রশান্ত মুখের গম্ভীর ছবিখানি ও জ্ঞানগর্ভ বাণী, তাহার সমস্ত হৃদয়কে যেন আজ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। নক্ষত্র দীপ্ত আকাশের তলে স্তব্ধ জগৎ সংসার যেন তাহার অন্তরের মধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া তাহার চিত্তে একটী নবীন ভাবের তুলিকা বুলাইয়া দিল।

মণীশ যুক্তকরে জ্যোৎস্না-স্নাত রজতাম্বরা আকাশে দৃষ্টি তুলিয়া দূরে বহু উচ্চে তাহা স্থাপন করিল। তাহার নিকট অনিত্য নিত্য ও তুচ্ছ মহৎ হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন একটা শুভ তিথির সংবাদ পঞ্জিকার পাতে লেখা ছিল। স্নানান্তে সে শুচি বস্ত্র ধারণ করিয়া খুড়া ও খুড়িমাকে প্রণামপূর্ব্বক এক সাজি ফুল লইয়া উমাকান্তের পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মণীশ, একেবারেই চিত্ত স্থির করে ফেলেছ, না কি? আরও কিছুদিন ভেবে দেখলে ভাল হত না? অর্থকরী বিদ্যার সেবা ভিন্ন ত অর্থ লাভ হবে না। দেব-ভাষা দেব-সামী[illegible] ... বস্তু সংসারে অর্থ বস্তুটাকেও ত নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলা চলে [illegible]।"

মুখ নত করিয়া মণীশ কহিল, "ভেবে দেখলাম, যে বিদ্যা ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মাবার জন্য সচেষ্ট, চিরজীবন তার ব্যর্থ অনুসরণ করার চেয়ে ঈশ্বরের কাছে যে পৌঁছে দেয়, তারই সাধনা করা শ্রেয়ঃ।"

উমাকান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "খুব ভাল কথা!"

মণীশ কহিল, "কাকার আর আপনার আশীর্ব্বাদে আমি মনুষ্য জন্মের প্রধান সুযোগটাকে সফল করে নিতে চাই। তাঁরও ইচ্ছা, আমি চিরদিনই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করি।"

উমাকান্ত কহিলেন, "তোমার মত মন আমার দেশের সকল ছেলের হোক্।"

প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া নিজেদের পূজা গৃহে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার সময় মণীশ সত্যকেও নিজের পার্শ্বে বসাইতে আরম্ভ করিল। পূজার পর গীতাপাঠ কালে খুড়িমাকে অর্থ করিয়া বুঝাইত। তারপর যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ী পাণিনির লঘুকৌমুদী ও ন্যায়দর্শন বৈশেষিক সূত্র প্রভৃতি পড়িতে যাইত, তখন সত্যর সমস্ত পড়া সে ঠিক করিয়া দিয়া যাইত। ফিরিয়াই আবার তাহার পড়া লইত। এইরূপে সমস্ত দিনটাই তাহার বিবিধ কর্ম্মের মধ্য দিয়া কাটিয়া যায়। দ্বিপ্রহরে শিবনারায়ণ তাহাকে লইয়া কাণ্ট, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনিষীগণের দর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। খুড়া ভাইপোর পুস্তক-সংগ্রহের বাতিক ছিল। ঘরে ছোট খাট ল[illegible]ব্রেরী তৈয়ার হইয়া উঠিয়াছে। অপরাহ্নে উভয়ে গৃহে[illegible] হইয়া [illegible]হাইতে অধীত বিষয়গুলির আলোচনা করি[illegible] প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের কোথায়

কোন্ সামঞ্জস্য আছে, তাহা উভয়ে খুঁজিয়া বাহির করিতেন। সেই সময় অনেক রকমই আলোচনা চলিত। একদিন কথা প্রসঙ্গে মণীশ কহিল, "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধগুলি যে কেবলমাত্র অর্দ্ধসভ্যজাতির কুসংস্কার-মাত্র নয়, বরং সম্পূর্ণ উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত, এ বিষয়ে একটা বই লিখতে ইচ্ছা করে।"

শিবনারায়ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "সার্ব্বভৌম মশায় এতে তোমায় খুব সাহায্য করতে পারবেন। বেশ ত, লেখ না, ঋষিরা যে কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, দু' একটা সামান্য বিষয় থেকে তা সভ্যজগত এবার একটু আধটু জানতে পারচেন। তবে এখনও তাদের বিজ্ঞান অতখানি উন্নত হয়নি, তাই তাঁদের ক্ষমতা বুঝতে লোকের অনেক বিলম্ব আছে। প্রাতঃস্নান, দধিভোজন, তৈলমর্দ্দন, গোময় ও ধূপধূনার ব্যবহার এমনি গোটাকতক সাধারণ জিনিষ, ওরা ভাল বলেচে বলেই না লোকে সেগুলোর আদর করতে আরম্ভ করেচে। যে যুগের যে ধর্ম্ম!"

মণীশ দিনে দিনে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের মহৎ চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, ততই সে নিজের অন্তরের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। তাঁহাকে অনুসরণ করিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে নিজের গণ্ডী হইতে যেন সবলে ঠেলিয়া বাহির করিতে লাগিল। সে প্রতিদিনই তাঁহার আশীর্ব্বাদটুকুকে দেব নির্ম্মাল্যে[illegible] ভুবন[illegible]নের উপর নিঃশব্দে বুলাইয়া অন্তঃকরণকে [illegible]তে।

প্রতিদিনই সে মুখের উপর অধিকতর পরিতৃপ্তির দীপ্তি লইয়া স্নিগ্ধ চিত্তে ফিরিয়া আসিত। ঘরে সত্যকে লইয়া অনেক সময় যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ উপস্থিত হইলেও এখন সে অধিকাংশ সময়ই মনকে সংযত রাখিয়া তাহাকে ধীরতার সহিত সহ্য করিয়া যাইত। সে যে প্রতিদিন নিজের চোখে দেখিয়া আসিতেছে, শিষ্যকে কতখানি সহ্য করিতে পারিলে যথার্থ গৌরবান্বিত গুরু হওয়া যায়! পুনঃ পুনঃ ভুল করিয়া চাষাভূষাদের মূর্খ ছেলেগুলা যখনই তাহাদের ছিন্ন মলিন প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগ বর্ণ-পরিচয়-খানি সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, "এটা কি হবে, ভট্‌চাযমশাই, আবার কও তো!" অমনি একটু স্নিগ্ধ হাস্যদ্বারা সেই সৌম্য মুখখানিকে করুণামণ্ডিত করিয়া বিরক্তি-হীন শিক্ষক পাঠ বলিয়া দেন। যতবারই ভুল হউক, এতটুকু তাঁহার ক্লান্তি বা অসন্তোষ নাই। কেহ কিছু বলিলে বলেন, "ওরা পুরুষানুক্রমে কোন রকম মাথা খাটানোর কাজ করেনি, স্মৃতি শক্তিতে মরচে পড়ে গেছে, ঘস্‌তে ঘস্‌তে তবে না ঝক্‌ঝকাবে।"

মণীশ এই কথাটাকে মনের সঙ্গে মানিয়া লইল। শুধুই যে মানিল, তাহা নহে, হঠাৎ সে একদিন প্রস্তাব তুলিয়া বসিল যে, সে তাহার পড়াশুনা কাজকর্ম্মের অবসরে দেশের গরীবদের জন্য একটি পাঠশালা খুলিবে। দেশের সকল লোকেরই একটু আধটু বিদ্যালাভ করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ নিজের নামটা সহি করিতে জানি[illegible]ও কত উপকার হয়। সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিল [illegible]কার সকলেই দেবতার মত সম্মান করে, [illegible]পনার আদেশ করলে সকলেই তা মানবে।"

উমাকান্ত কহিলেন "দেবাদেশ যদি সবাই শোনে, তবে ত আর ভাবনা কিছুই থাকেনা গো! যত কিছু ভাল কাজ, সে সবই ত দেবাদেশ, কিন্তু তা মান্‌চে ক'জন ? তবু তুমি যদি বল, তবে দেবতা না হয় আদেশ করেই দেখতে পারেন। কলির দেবতা বলেই ভয় হয়।"

১২

মনীশ নিজের গ্রামে আসিয়া বসিতে দেশের দশজনে সন্তুষ্ট হইল। এই নিরীহ-স্বভাব যুবকটিকে সকলেই একটু স্নেহ করিত। তারপর সে যখন একটি পাঠশালা খুলিয়া যত রাজ্যের অকেজো হতভাগা ছেলে গুলাকে জড় করিয়া তাহাদের অনাসৃষ্টি অত্যাচার হইতে বাড়ী, পাড়া এবং রাস্তাটাকে শুদ্ধ ঘণ্টা দুইয়ের জন্যও নিরুপদ্রব করিতে লাগিল, তখন সম্মানের দায়ে মনীশ বা তাহার খুড়া খুড়ির পথচলা ভার হইয়া উঠিল। বাগ্‌দি বউয়ের চাল হইতে ছাঁচি কুমড়া, দুলে গিন্নির লাউ-ডগা প্রভৃতি বিচিত্র সওগাতও ক্রমে তাঁহাদের ভাণ্ডারের চাঙ্গারিতে উঠিতে লাগিল। বারণ করিলেও কেহ শুনেনা, হাতযোড় করিয়া বলে, "তেনার নাম নিয়ে এনেচি, ও কি আর খদকুড়ে ফেলতে পারি, দেবতার দৃষ্টি করিয়ে দিয়ো।"

খুড়িমা হাসিয়া মনীশকে ডাকিয়া বলেন, "ও মণি, তুই যে দেখতে দেখতে একবারে দেবতা হয়ে উঠলিরে! দেখিস্ বাছা, দেবতাব মা হতে আমার সাহস নেই, তাদের মায়া দয়া থাকেনা।"

মনীশ হাসিয়া চলিয়া যায়। রাস্তা ঘাটে প্রণাম [illegible] আশীর্ব্বাদের ধূমে কর্ণমূল লাল করিয়া মধ্যে মধ্যে [illegible] রলে পাঠশালা চালান দায় হইয়া উঠিবে!

কেবল সত্য বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে। ছিপ-বঁড়সি সব মজুত, অথচ দাদার জন্য মাছ ধরা বন্ধ, বোতল-চুরের মাঞ্জা দেওয়া লাটাই ভরা সূতা ঘরের কোণে পড়িয়া,—রাখাল, বিষ্ণু, পা টিপিয়া টিপিয়া দিনের মধ্যে সাতবার জানালায় জানালায় উকি দিয়া দ্বারে টোকা মারিয়া যাইতেছে। দূর হইতে কত রকম সাঙ্কেতিক শৃগাল-কুকুরের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন কি, স্বয়ং গৌরী দুই দুইবার আসিয়া মলের চঞ্চল রবে কক্ষ মুখর ও কক্ষাধিকারীর বক্ষতলে একটা চঞ্চলতার নিক্কন প্রতিধ্বনিত করিয়া দিয়া গেল, তথাপি ছুটি নাই! দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় বইগুলা সে আছড়াইয়া কলমটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দারুণ ক্ষোভে প্রকাশ করিতে থাকে। আর মণীশ তাহার সম্মুখে নিজের চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া নীরবে হাসে। বরং সে রাগ করিলে বা বকিলে ব্যাপারটা কতক সহজ হইত, কিন্তু তাহার এই নিতান্ত নির্লিপ্ততায় সত্যর মনে আর বিন্দুমাত্র আশা জাগিতে পারে না। সক্রোধে সে কাগজের উপর পেন্সিল বুলাইয়া নিঃশব্দে জলিতে জলিতে ইংরাজি তরজমা করিয়া যায়।

সন্ধ্যার পর সায়াহ্ন-কৃত্য সমাধা করিয়া কিছুক্ষণ সত্যকে পড়াইবার পর দুই ভাই শিবনারায়ণের কাছে আসিয়া পাশাপাশি বসিত। আলো অন্ধকার পাশাপাশি দাঁড়াইলে যেমন পরস্পরের অনৈক্য প্রকাশ পায়, এই দুই ভাইয়ের মধ্যেও সেই রকম একটা প্রকাণ্ড অমিল ছিল। মণীশ যেমন শান্ত সংযত স্বভাব, সত্য ঠিক তাহার উল্টা। [illegible]াহাদের তখন যে সমস্ত আলোচনা, তাহার মধ্যে সত্যে[illegible] অধিক, কাজেই সেগুলার রস সত্যর নিকট [illegible]তর হইয়া উঠিত। শিবনারায়ণ যখন তাহাকে পৃথি-

বীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অথবা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ প্রভৃতি দেীর জগতের মানবাবিষ্কৃত জ্ঞান সমূহ গিলাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন, সে তখন কেমন করিয়া দাদাকে ফাঁকি দিয়া গৌরী প্রভৃতি সঙ্গীদের সহিত হল্লা করিতে যাইবে, তাহারই বিবিধ বিচিত্র কৌশল উদ্ভাবনে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিত। ইহার উপর আবার আজকাল বাগানের নারিকেল কুল ডাঁসিয়া উঠিয়াছে, কাজেই তাহার আর ভাবনার অন্ত ছিল না।

মণীশ প্রাচ্য-বিজ্ঞান নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন কালের বহুদর্শী বৈজ্ঞানিক ঋষিগণের গভীর জ্ঞান বিজ্ঞানের কতটুকু এতদিনে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহাই সে তুলনায় প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছিল। বাস্তবিকই একজন যেন জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং অন্যে তাহার তীরে বসিয়া উপল কুড়াইতেছে মাত্র। মনে করিতে তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিত,—কোথা হইতে আজ তাহারা কোথায় নামিয়াছে!

এমন করিয়া প্রায় বৎসর কাটিয়া গেল। মণীশের সযত্ন-লিখিত পুস্তক সমাপ্ত হইয়া আসিল। সত্য দায়ে পড়িয়া যতটুকু সম্ভব পড়ায় মন দিয়াছিল, কিন্তু তাহার দাদা তাহাতে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

এই সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে একটা পরিবর্তন ঘটিয়া উঠিতে ছিল। গৃহিণী অল্পে অল্পে ভগ্নস্বাস্থ্য ..র পুষ্করিণীর শয্যাশ্রিতা হইয়াছেন। বড় বধূই এখন বাড়ী শৈবালদল কাঁপিয়া রাজ-পরিবর্ত্তনের সহিত সংসারের গৃহিণী পরিবর্ত্তনে বড় এক..প্রভেদ

দেখা যায় না, তেমনই বিপ্লব ঘটিতে থাকে। কখনও কখনও ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। এবাড়ীর নূতন গৃহিণীটির সহিত পুরাতনের প্রভেদও বিস্তর। একজন সুনম্র স্নেহশীলা, অন্য-জন কঠোর প্রকৃতি। দাসী চাকরেরা ঠাণ্ডা মেজাজের মুনিবের চেয়ে কড়া হাতে অনেকটা ঠিক থাকে, কিন্তু আড়ালে রাজার মাকেও যখন ডাইন বলা চলে, অন্তরালে তখন ভট্টাচার্য্য-বধূর সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা কেনই বা না চলিতে পারিবে? আর জব্দ হইয়াছিল গৌরী। বড় মামী তাহাকে কোনদিন যদিও সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, তবু এতদিন দিদিমার সহায়তায় এ বাড়ীতে তাহার কতকটা জোর ছিল। কিন্তু এখন নূতন গৃহিণী গৃহিণী-পণার অধিকার হাতে পাইবামাত্র সকল কার্য্যের প্রথমে এই বুড়া ঢেঁকি মেয়েটাকে শুধরাইয়া তুলিবার মহাভার গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "কেবল খেয়ে খেয়ে মেয়ে দিন দিন হাতী হচ্চেন! সংসারের একটি কুটি ভেঙ্গে দু'খান করেন না। এ ধিঙ্গি মেয়ে নিয়ে ভুগতে হবে ত আমাকেই। লোকের কি? লোকে কেন আদর দেবে না?" ননদকে কহিলেন, "তোমাকেও বলি, ঠাকুরঝি, অসৈরণ দেখে না বলেও যে থাকতে পারিনে। এ কি রকম শিক্ষা তুমি দিচ্চ? অত বড় মাগী যে দিনরাত ছিপ ঘাড়ে করে গাঙ্গুলিদের ধেড়ে ছেলেটার সঙ্গে নেচে নেচে বেড়ায়, ঘরকরণার একটা কাজে নেই, কর্ম্মে [illegible]ই, এ কি ভাল হচ্চে? শ্বশুরবাড়ী গেলে অমন বউ [illegible]তাস দিয়ে যদি না বিদায় করে, ত আমি কি [illegible]ছি!"

বিন্ধ্যবাসিনী মানুষটি নিতান্ত নিরীহ। তিনি ভ্রাতৃজায়াকে উত্তর দিলেন না, সরিয়া আসিয়া গৌরীকে ডাকিলেন, "রাণু!"

গৌরী তাহার মুক্ত বেণী দুলাইয়া ছুটিয়া আসিল, কহিল, "কি মাসিমা?"

"পানগুলো সেজে রাখগে না, মা!"

গৌরী খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কহিল, "এক্ষুণি! এখন যে আমি সত্যদের বাড়ী যাচ্ছি, মাসিমা!"

বিন্ধ্যবাসিনী এবার রাগিবার চেষ্টা করিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "ফের দুষ্টুমি! খবরদার তুমি সত্যদের ও দিকে যাবে না। যা পান সাজগে যা।"

গৌরী ঈষৎ ভীত নেত্রে মাসিমার মুখের দিকে চাহিল। যাহাদের সহজে রাগিতে দেখা যায় না, তাহারা যখন রাগ করে, তখন সত্যই ভয় পাইতে হয়। তাহার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। প্রকৃতি সিদ্ধ আব্দারের ভাব ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তটস্থভাবে সে ভাণ্ডারের দিকে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস হয় ত তাহার নিজেরও অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র একটি মাতৃহারা পিতৃত্যক্তা শিশুর ক্ষুব্ধ চিত্তের একটুখানি ভার মাত্র এই বাতাসে মিশ্রিত ছিল, কিন্তু ইহা তাহার মাসির বুকে তপ্ত শেলের মতই বিঁধিল। এই বনবিহঙ্গিনীকে কেমন করিয়া তিনি খাঁচায় পুরিয়া রাখিবেন! লোহার শিকল দিয়া চঞ্চল হরিণশিশুকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার সুদূর প্… ার পুষ্করিণী … কে করিতে পারে? বিন্ধ্যবাসিনী জোর … মল শৈবালদল কাঁপিয় … হলেন,

মনে ভাবিলেন, এত কি মায়া! সত্যই কি শেষে আমি আদর দিয়া মেয়েটার স্বভাব বিগড়াইয়া দিব? কঠিনভাবে তিনি তাহার সম্মুখ দিয়া গিয়া জ্বলন্ত উনানে ডালের হাঁড়ি চাপাইয়া দিলেন, গৌরীর মুখের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। বড়বধূ একটু পরেই রোরুদ্যমান ছেলেকে নাচাইতে নাচাইতে আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারে উঁকি দিয়া কহিলেন, "দুধ জ্বাল্ হল গা? ছেলেটা ত আর না খেয়ে থাকতে পারে না, কেঁদে কেঁদে পাগল করে দিলে।"

বিন্ধ্যবাসিনী থতমত খাইয়া গেলেন, চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "এই যে ভাই, উনুনটা পেড়ে এখনই দুধ গরম করে দিলুম বলে। আহা, কাঁদবেই ত! এমন পোড়া মনও হয়েছে! ও মা, গয়লাবৌ এখনও দুধ দেয়নি যে! দেখেচ একবার মাগির আক্কেল?"

"দেখছি বই কি! আক্কেল সবারই সমান! হতভাগা ছেলে চুপ করে থাক্! কে তোকে সাত সকালে খেতে দেবে রে, লক্ষীছাড়া বাঁদর!" এই বলিয়া ছেলেকে একটা ঝাঁকানি দিয়া মাটিতে বসাইয়া দিয়া পুত্রের জননী চলিয়া গেলেন। যাত্রা কালেও ননদকে একটা কাঁটা ফুটাইয়া যাইতে ভুলিলেন না, কহিলেন, "গয়লাবৌকে সকাল করে দুধ দিতে বললে কি অার দেয় না? কিন্তু বলে কে? এ ত আর কারো আদরের রাণী নয়,—আমার ছেলে মরলেই কি, তরলেই কি।"

শিশু পঞ্চমের সুর সপ্তমে চড়াইয়া তুলিল। অপ্রতিভ বি[illegible]দা ছাড়ি হাত ধুইয়া কুলুঙ্গি হইতে একখানা [illegible]টা দুগ্ধ [illegible] বা[illegible] ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন,

কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঠাকুরদের রান্না রাঁধিতে রাঁধিতে আ-কাচা জামাশুদ্ধ ছেলেকে তিনি ছুঁইতে পারেন না, অগত্যা ডাকিলেন, "রাণি!"

গৌরী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "খোকাকে একবার নে' ত মা! পান সাজা হয়েচে?"

"সব হয়নি!" বলিয়া গৌরী অঙ্গুলি লিপ্ত খদিরের ছাপ আঁচলে মুছিয়া ক্ষীণ দুইটি হস্তে পরিপুষ্ট শরীর শিশুকে একটু কষ্ট করিয়া উঠাইয়া লইল। তাহার মুখে আর বিষাদের কোন চিহ্নই ছিলনা। আচমকা খিল খিল করিয়া সে হাসিয়া উঠিল। বিন্ধ্যবাসিনী ডাল সাঁতলাইয়া কাঁসিতে ঢালিয়া রাখিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে?" এতক্ষণে তাঁহার বুকের বোঝা যেন এই সরল হাস্যস্রোতে ভাসিয়া গেল।

গৌরী হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "খোকা কি রকম ভারি মাসিমা! দাদু যেমন গন্ধমাদন তোলার গল্প বলেন, আমি ওকে ঠিক তেমনি করে মাটি থেকে তুল্‌লুম।" বলিতে বলিতে উপমেয় বস্তুটাকে স্মরণ করিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কিন্তু এত বড় একটা কবিত্বপূর্ণ উপমার মধ্যে হাস্য রসের পরিবর্ত্তে এমন একটা রসের আস্বাদ পাইলেন যে চকিতে তিনি চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, পরে স্বর খাটো করিয়া কহিলেন, "ও কথা কি বলতে আছে?"

"কেন থাকবেনা? আমার পাথরের ছেলে শা[illegible] ারি পুষ্করিণী [illegible]লেও মরে না, যিনি যত পারেন খুঁড়ুন, [illegible]ল শৈবালদল কাঁপিয়[illegible]ো মা,

একেই ব'লে গো মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার রাক্ষস! হায় রে আমার কপাল! এই মেয়ে আমি ভাল করব।"

বড়বধূ তৈল ভাণ্ড লইয়া রন্ধনের জন্য তৈল দিতে আসিতেছিলেন, এই কথা বলিয়াই স্তম্ভিত গৌরীর কোল হইতে ছেলেকে ছিনাইয়া লইয়া ননদকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ওগো, বেন্নে অত করে তেল না-ঢেলে একটু দরদ করে রেঁধো, একটা মানুষের হাড়ে নৈলে আর কতই সয়!" বলিয়াই তিনি গমনোদ্যত হইলেন। গৌরী দৌড়িয়া গিয়া ক্রন্দন-পরায়ণ শিশুর হাত ধরিল, বিষণ্ণ মুখে কহিল, "মামিমা, আমার দোষ হয়েচে, ওকে আমায় দাও।"

বড়বধূ মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন, "রক্ষে কর বাছা, ডাইনীর হাঁতে পো সমর্পণ! যাও, তুমি খেয়ে দেয়ে সতুর সঙ্গে খেলতে যাও, নবাবের কন্যে নবাবের বৌ হবে। তারা যদি না তোমায় ঝ্যাংরা মেরে বিদায় করে ত আমার নামই মিথ্যে!"

গৃহিণীপনার সমুদয় অধিকারটুকু দুইটী অসহায় প্রাণীর উপর প্রয়োগ করিয়া নূতন গৃহিণী দ্বিতলে চলিয়া গেলেন। তাঁহার শরীর ভাল নয়, দুইবার ভাঁড়ার বাহির করিয়া দেওয়া, শ্বশুরের আহার কালে একবার পাখা হাতে করিয়া শাশুড়ীর রোগবৃদ্ধির জন্য হা হুতাশ করা ও ভক্তিনাথকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া তাঁহার মায়ের গায়ে একবার হাত বুলাইয়া আসিবার সময় ভিন্ন উপর হইতে নামা তাঁহার বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। কেনই বা ঘটিবে। এ বাড়ীর তিনি এখন গৃহিণী। গৃহিণীত আর সকলের সঙ্গে [illegible] া। আর কচি-কাচার মা, কাজেই

শ্বশুরের আহারের পরই আহার সারিয়া একটু নিদ্রা দিবার তাঁহার প্রয়োজন আছে। শরীর অসুস্থ, অগত্যা বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় থাকিতে হয়। মধ্যে মধ্যে অবুঝ ভক্তিনাথ তাঁহার এই একাধিপত্য অধিকারের সীমানায় আসিয়া ঈষৎ গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "গৃহস্থের বাড়ীর বড় বউ, কোথায় পাঁচজনকে যত্ন আদর করিবে, কাছে বসিয়া সকলকে খাওয়াইবে, তাহা না করিয়া সর্ব্বদা তুমি নিজকে লইয়াই বিব্রত! ইহা তোমার পক্ষে উচিত হয় না। তাহা ছাড়া এই সকল বিলাসিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে কেন? ছেলেদের ছিটের দোলাই ত বেশ ছিল, জার্ম্মাণ র‍্যাপার কিনিবার কি প্রয়োজন! পায়ে বিলাতী জুতা হইবে না! গায়ে সকল সময় গেঞ্জি কামিজ বাবুলোকেই পরে, এ সকল ঢঙ্ ভট্টাচার্য্য গৃহের সন্তানের জন্য নয়। সাদা সিধা কাপড় ছাড়িয়া এখন হইতে রঙ্‌চঙে পোষাক পরা অভ্যাস করিলে ভবিষ্যতে আদর্শ খারাপ হইয়া যাইবে, তাহাতে ত্যাগশীলতা, সংযম প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণ হারাইয়া প্রবৃত্তি নিতান্তই সাধারণ হইয়া পড়িবে। তুমি নিজে যেমন ইচ্ছা চলিতে পার কিন্তু ছেলেদের বংশের মত হইতে দাও। দোহাই তোমার উহাদের পরকাল খাইও না।"

এই সকল উপদেশ উপেক্ষা করিয়া বড় বধূ ঝিকে দিয়া বাজার হইতে বিলাতী ছিটের পেনিফে র কিনিয়া আনিয়া ছেলেকে সাজাইতে ত্রুটি করিতেন না। মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে ইহা লইয়া তুমুল বাক্-বিতণ্ডা হইত। মোটের উপরি সুকারণ বেশ সুখে চলিতেছিল না।

ল শৈবালদল কাঁপি

সেদিন আঘাতটা একটু গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক-খানি সহ্য করা বিন্ধ্যবাসিনীর অভ্যাস থাকিলেও আজ কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। মা-মরা মেয়ে, জগতে আসিয়া কিছুই যে পায় নাই, সংসারের একটি প্রান্তে এতটুকু স্থান লইয়া এক পাশে যে পড়িয়া আছে, তাহাকে লইয়া লোকের এত মাথা ব্যথা কেন? পাঁচ বছরের একটি শিশু যেটুকু বুঝে, সেটুকু বুদ্ধিও যাহার মাথায় নেই, সেই নির্ব্বোধ মেয়েকে ইহারই মধ্যে অতখানি তিনি কেমন করিয়াই বা বুঝাইবেন? হায়, হায়, কেমন করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী প্রাণ ধরিয়া তাহার এই নিরপরাধে অপরাধ-ক্ষুণ্ণ শুষ্ক মুখ দেখিবেন! কেমন করিয়া এই ফুলের মত ছোট সরল সরস হৃদয়টুকুকে শাসনের নাগপাশে বদ্ধ করিবেন? ইহাকে বাঁধিতে হাতই কি উঠে?

মুখখানা যথাসাধ্য ভারী করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "যা, খোকার দুধ নিয়ে আয়।" সে আজ্ঞা পালিত হইলে পুনশ্চ কঠিন স্বরে তিনি আদেশ করিলেন, "বাসনগুলো ধুয়ে রাখ্। আর দেখ্, আজ থেকে তুই বাড়ী থেকে এক পা নড়তে পাবিনে, এই আমি বলে রাখলুম। যদি কথা না শুনিস, তা হলে—"

বিন্ধ্যবাসিনী কথাটা অসমাপ্তই রাখিয়া দিলেন। তা হলে তাঁহার দ্বারা আর যে কিছু হইতে পারিবে, এমনও বোধ হয় না। এই শাসনের ছলটুকুই তাঁহাকে যথেষ্ট অপরাধী করিয়া তুলিতেছে। গৌরী বাসন ধুইতে ধুইতে হঠাৎ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ওমা [illegible] ভারী একটা মজা হয়েচে। মঙ্গলা গাইটা দড়ি [illegible] সব বড়ি গুলো খেয়ে ফেল্‌লে।" বলিতে

বলিতে হাসিয়া সে লুটাইয়া পড়িল, "ও, মাগো! কি রকম তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিচ্চ, দেখ!"

বিন্ধ্যবাসিনী সবেগে বেড়ি আছড়াইয়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, গরু তাড়াইয়া অবশিষ্ট বড়ি উদ্ধার করিয়া আনিয়া সক্রোধে কহিলেন, "হতভাগা মেয়ে,—তোমার সবতাতেই হাসি! বউ দেখলে কি বলবে, বল্ দেখি!"

দুপুর বেলা কাজকর্ম্ম সারিয়া বিন্ধ্যবাসিনী রুগ্না মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া একটু বেলা পড়িতেই গৃহ-কার্য্যের জন্য আবার উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। মা'র কঙ্কাল-সার মূর্ত্তি দেখিলে আর তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু কি করিবেন? ঠাকুর-দেবতা আছেন, বাপ ভাই আছেন,—সমস্তই ত দেখা চাই! গৌরী অন্য কোন কাজেই মন লাগাইতে পারে না, কিন্তু দিদিমার সেবা অনন্যচিত্তে সে করিতে পারে। এই স্থানে তাহার সুপ্ত নারী মহিমাকে অকস্মাৎ জাগ্রত হইতে দেখা যায়। অনেকক্ষণ ধরিয়া দিদিমাকে সে পাখা করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে পাখা নামাইয়া কচি হাতখানি তাঁহার তপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে বুলাইতেছিল। গভীর বিষাদের একটি ছায়া তাহার অকারণ-হাস্যে উৎফুল্ল মুখখানিকে এখন যেন প্রৌঢ়ার মুখের মত গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। অজ্ঞাত আশঙ্কায় চোখে কেবলই একটা জলের আভাষ ভাসিয়া উঠিতেছে।

গৌরী বাহিরে আসিতেই বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে ডাকিয়া প্রদীপের সলিতা পাকাইতে বসাই[illegible]লার বাহিরে শব্দ উঠিল, "গো গাবো গাবঃ—"

"ঐ সত্য!" বলিয়াই সদ্য বিকশিত পদ্মের মত প্রফুল্ল মুখে বালিকা তৎক্ষণাৎ সলিতা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বিন্ধ্যবাসিনী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইলেন, কহিলেন, "খবরদার যাস্‌নে! সারাদিন কি শেখালুম?"

"না মাসিমা, সে আমি কিছুতেই পারব না। কেন তুমি আমায় খেলতে দেবে না, খালি খালি কাজ করাবে?"

বিন্ধ্যবাসিনীর বক্ষে এ তিরস্কার কাঁটার মত বিঁধিল। তথাপি একটু বিরক্তির সহিত কহিলেন, "এখন বড় হচ্ছ, যার তার সঙ্গে কি খেলে? ঘরে বসে পুতুল খেল।"

মাথা নাড়িয়া বিদ্রোহী গৌরী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "এক্ষুনি আমি এত কি বড় হয়ে গেলুম, বা—রে! আর সত্য বুঝি যে সে হল! ও আমাকে কত ভালবাসে, সব ভাল পেয়ারা কুল বেচে বেচে আমায় দেয়, আমি ওর সঙ্গে একটু খেলা করতেও পাব না বৈ কি! আমি যাবই। আমিও যে ওকে ভালবাসি।

১৩

গঙ্গামণির দিন ফুরাইয়া আসিয়া অপরাহ্নের শেষ রশ্মিটুকুর মতই জীবন নদীর পশ্চিম কূলে অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় তাঁহাকে লইয়া কাশী আসা হইল।

গিরিজাসুন্দরী বোনকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। বুক ফাটা নিশ্বাস বুকের মধ্যে রুদ্ধ রাখিয়া গঙ্গামণি কহিলেন, "গিরিজা,—আমার শচী [illegible] র্বল হৃদয় আলোড়িত করিয়া দুই চোখে জল ভরিয়া উঠিয়াছিল। জীবনী-শক্তির ক্ষীণ অবস্থায় অল্পেই

মনে আঘাত লাগে। গিরিজা সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "সে ত তোমার এত অসুখ জানে না, দিদি! আমি তাকে আসতে লিখিয়ে দিচ্চি এখনই।"

মায়ের সকল দুঃখ মিটিয়া গেল। সে জানে না, তাই! নহিলে কি কখন চুপ করিয়া থাকিতে পারে?

শচীকান্ত মায়ের অবস্থা শুনিয়া অবিলম্বে আসিল। ভোরের ট্রেণ ছাড়িয়া যখন সে নৌকায় গঙ্গা পার হইতেছিল, তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। সদ্য-প্রকাশিত আদিত্যের সহস্র উজ্জ্বল রশ্মি অতি স্নিগ্ধভাবে পরপারের সৌধকিরীটের শির স্পর্শ করিয়া বিশ্বাধিপতিকে প্রণাম করিতেছিল। মুকুলিত জগৎকে ক্রমশই সেই নবীন আলোক তাহার মন্ত্রস্পর্শে অতি ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছিল। আকাশের গায় স্তরে স্তরে বর্ণ রেখা ফুটিয়া উঠিয়া পূজা গৃহাভিমুখী সুর কন্যাগণের কৌষেয় বসনগুলিরই ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সুর-জগতের মঙ্গল বার্ত্তা বহন করিয়া প্রভাত পবন সদ্য জাগরিত প্রতি চিত্তকে দিবসের প্রধান কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টায় বারবার আনাগোনা করিয়া ফিরিতেছে। গঙ্গা বক্ষে নৌকার উপর বসিয়া বসিয়া শচীকান্ত বিস্ময় কৌতূহলে সম্মুখবর্ত্তী প্রাসাদ মন্দির-মেখলা বিচিত্রা নগরীর অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

জহ্নু তনয়া দুই রজত বাহু বিস্তার করিয়া যেন বিশ্বাস পরায়ণা ভক্তের মত বিশ্বেশ্বরকে ব্যগ্র আবাহন করিতেছেন। তাঁহার পরিতৃপ্ত বক্ষ দর্পণে শত মন্দিরের দীর্ঘ ছায়া র মুকায় [illegible] মিল করিতে করিতে বহু শত বৎসরের ল শৈবালদল কাঁপি গত গাথা স্মরণ করাইয়া

দিতেছিল। তীরভূমি হইতে পাশাপাশি প্রশস্ত প্রস্তরসোপান-শ্রেণী গভীর জলের মধ্যে নির্ভীক শিশুর মত নির্ভয়ে অবগাহন করিয়া রহিয়াছে। মণিকর্ণিকায় এবং দশাশ্বমেধে ইতঃমধ্যেই যথেষ্ট ভিড় জমিয়াছে। প্রতি ঘাটেই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতেছিলেন। নৌকা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, শচীকান্ত দেখিল সকলকার মুখেই যেন কেমন একটু উদ্বিগ্ন ভক্তির ভাব। যেন বেলা বহিয়া যাইতেছে, মন্দিরের পূজা সমাধা হইয়া যাইবে, এমনি একটা উদ্বেগ সকলের মুখভাবেই প্রকটিত হইতেছিল। সে বিস্ময়ের সহিত ভাবিল, এরকমটি আর কোনখানে দেখা যায় না! ঘাটের উপরেই গাছের তলায় বড় বড় ধুনী জ্বালাইয়া বৃহৎ জটাভার চূড়াকারে মাথার সম্মুখভাগে বাঁধিয়া কৌপীনধারী ভস্মমাখা সন্নাসীর দল স্থানে স্থানে দগ্ধ কাষ্ঠ ঠুকিয়া অগ্নি নির্গত করিয়া গাঁজা সাজিতেছে, কেহ কলিকাটি নামাইয়া রক্ত নেত্র অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া আপনার মনে দুলিতে দুলিতে গুন্ গুন্ শব্দে তুলসীদাসের দোঁহা গাহিতেছে। ইহাদের একজনের নিকট এই প্রত্যূষে অনেক পুরুষ এবং তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নারীর সমাগম হইয়াছিল। সন্ন্যাসীগণের ভাঁড়ে ভাঁড়ে দুগ্ধ ও কিছু কিছু ফল দান করিতে কেহই ভুল করে নাই। অনেকেই মাটিতে পড়িয়া ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া তদ্গত চিত্তে পদধূলি গ্রহণ করিতেছিল। বিরক্তি বোধ করিলেও শচীকান্ত ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া সেই ভিড়ে [illegible] একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ইনি [illegible] জ্যোতিষী হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই বলিয়া

দিতে পারেন। শুনিয়া শচীকান্তের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ অবিশ্বাসের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সে গমনোদ্যত হইয়া ফিরিতেছিল। কিন্তু ইতঃমধ্যেই সেই ভবিষ্যৎ-বেত্তা পুরুষটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই সুবেশধারী যুবা দর্শকের উপর পতিত হইল। তাহাকে ফিরিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি ডাকিলেন, "আও বাবাজী, তেরা নসীব বড়ি আচ্ছি হায়!" কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর ছিল। শচীকান্ত হঠাৎ একটু কৌতূহলী হইয়া উঠিল, শুনাই যাক না, কি বলে! সহাস্য মুখে সে গিয়া জ্যোতির্ব্বিদের সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া দিল।

প্রৌঢ় জ্যোতিষী বহুক্ষণ ধরিয়া সেই হাতখানি, ও উজ্জ্বল অঙ্গুরীয়ক-যুক্ত অঙ্গুলী বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিল, তারপর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "যব রেখা আছে, পূর্ণ বিদ্যা, ধন মধ্যম, ধর্ম্ম স্থানের গ্রহ নীচস্থ, উচ্চ পদ—বাবু তুমি হাকিম হইবে।"

শচীকান্তর পিতা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিদ্যা 'অফলা বিদ্যা' বলিয়া ইহার যথেষ্ট চর্চ্চা করিতেন না। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর যাহা বিধান করিবেন, তাহা যথাকালেই জানা যাইবে। দণ্ড-পুরস্কারের সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলে তাহার ফল ঠিক উপভোগ হয় না। কিন্তু তথাপি সময় সময় উপরোধে পড়িয়া বা ছাত্র শিক্ষার্থ তাঁহাকে যে টুকু জ্যোতিষশাস্ত্রানুশীলন করিতে হইয়াছে, তাহা হইতেই শচীকান্তর এই বিদ্যাটার উপর আস্থা ল শৈবালদল কাঁদি পারে নাই।

ভবিষ্যৎ-বেত্তার সংবাদটা নেহাৎ মন্দ নয়! একটু উৎসাহিত হইয়া সে কহিল, "আয়ু দেখুন ত—"

জ্যোতির্ব্বিদ্ কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তল হইতে সম্মুখে বিস্তৃত একটি পরিচিত রেখা বহুবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর মুখে থাকিবার পর কহিলেন, "অরিষ্ট আছে। আয়ুস্থান অষ্টমে পাপ গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি, শনির দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা ;—তা এর প্রতিকার হ'তে পারে। সওয়া পাঁচ টাকা খরচ করিয়া একখানা লোহার অস্ত্র, কালো কম্বল দুইখানা এবং সওয়া সের কৃষ্ণ তিল উৎসর্গ করিলে সব দোষ কাটিয়া যাইবে। বাবু, তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

হাত টানিয়া লইয়া শচীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং "না" বলিয়া পকেট হইতে একটি দুয়ানি বাহির করিয়া জ্যোতিষীর সম্মুখে অবজ্ঞার সহিত ফেলিয়া দিল। শেষ সংবাদটি তাহার পূর্ব্ব সংশয়কে নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহা এই ;—ভণ্ড!

জ্যোতিষী একটু আশাহতভাবে দুয়ানিটি মাটী হইতে তুলিয়া লইলেন, একবার ক্ষুব্ধ নেত্রে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তুমি বিবাহ করিও না। চলিয়া যাইতেছ—গ্রহশান্তির কি হইবে? অরিষ্ট বড় ভারি!"

"কিছুই না" বলিয়া শচীকান্ত ভিড় সরাইয়া বাহির হইয়া আসিল। মনে মনে বলিল "থাকে আমার আছে, তোর সাধ্যে তার [illegible] নেই।" তারপর রাস্তায় পড়িয়া সে গতি দ্রুত করিয়া [illegible]

মায়ের অবস্থা দেখিয়া এতদিন না আসার জন্য আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া শচীকান্ত মায়ের আরও নিকটে সরিয়া বসিল। তাহার মন স্বভাবতঃই একটু কঠিন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে নিষ্ঠুর নয়, সাধারণ সকলেই আজিকালিকার দিনে যে রকম হইয়া থাকে, সেও তাহাদের মতই একজন,—না দেবতা, না পিশাচ,—মানুষমাত্র!

মণীশ কহিল, "এস, বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনি"। দুই বন্ধুতে বাহির হইল।

গঙ্গাতীর হইতে যে নগরীর অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শককে ভক্তি-বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া তুলে, সহস্র গলি-ঘুঁজির মধ্যে সেই দীর্ঘ মন্দির চূড়া যখন অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন আবার দর্শকের নেত্রে এমনই ঘৃণাজনক দৃশ্যসকল পতিত হয় যে, তাহার চিত্ত একেবারেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। যে কাশীর অপূর্ব্ব আনন্দময় শোভা দেখিয়া দেবতার আবাস বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহারই এক প্রান্তে এ কি নরকের মুক্ত দ্বার দেখা যাইতেছে! কিছু দূর আসিয়া হঠাৎ শচীকান্ত কহিল, "মণীশ, এই তোমার স্বর্গপুরী কাশী?"

কাশীর মাহাত্ম্য বা মহিমা কি এবং ইহা কাহার পক্ষে স্বর্গপুরী, তাহা মণীশ জানে। এই চিরদিনের কাশী, অনাথা হিন্দু বিধবার ও সাধু মহাত্মার শেষ সম্বল, শান্তিহীনের সান্ত্বনার স্থল, ইহা ভোগীর স্বর্গ নহে, ত্যাগীর স্বর্গ! কিন্তু সে তর্ক পরিহার করিয়া কহিল, "সোণায় কি খাদ থাকে না?"

"খাদের অংশটা যে বড় বেশী বেশী [illegible]

ল শৈবালদল কাঁপি

ক্রমে তাহারা দশাশ্বমেধে পৌঁছিয়া বিশ্বনাথের গলির মুখে

আসিয়া পড়িল। সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে বিচিত্র সাজে সজ্জিত সুন্দর বিপণিশ্রেণী, পথে লোক যেন ধরিতেছিল না। শচীকান্ত হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ! সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে ওর মধ্যে কে মরতে যাবে?"

মণীশও তাহাকে থামিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মৃদু হাস্যের সহিত সে কহিল, "থিয়েটারে এর চেয়ে কম ভিড় হয় কি? তখন সর্দ্দিগর্ম্মি হয় না ত!"

"তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা! আমি ওখানে যাব না। চল ফেরা যাক।"

মণীশ হঠাৎ কঠিন দৃষ্টিতে চাহিল, দৃঢ় স্বরে কহিল, "আমি যাব।" সে দৃষ্টিতে একটা অকথ্য তিরস্কার মিশ্রিত ছিল। বুঝি এমন দৃষ্টিতে সে তাহার দিকে আর কোন দিনও চাহে নাই—সে দিনও না—যে দিনের কথা আজও শচীকান্তর স্মৃতিকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। আহা, সেই পক্ষ-সঙ্গিনী মেয়েটি! সে মুখখানা এখনও যেন অতীত স্মৃতির বিলুপ্তপ্রায় মেঘের মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ হানিয়া যায়। সে ঈষৎ বিরক্তি-নীরস স্বরে কহিল, "যাবে? তবে চল, আমিও যাই। অজানা দেশে নৈলে আবার পথ হারাবো কি!"

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মণীশ তাহাকে দেখিতে পাইল না, ভিড়ের মধ্যে কোথায় আছে, স্থির করিয়া সে সংগৃহীত মাল্য-পুষ্পাদি দ্বারা স্তূপান্তরালস্থিত বিশ্ব-দেবতাকে অর্চ্চনা করিল। সে দিন হয় ত মহাদেবের বিশেষ পূজার দিন। লোকের ভিড়ের সীমা ছিল না। কেবলই "হর হর বিশ্বনাথ" ধ্বনি

উঠিতেছে। গম্ভীর নিঃস্বনে মন্দির ঘণ্টা বাজিতেছে। রাশি রাশি পুষ্পচন্দন কুণ্ডের মধ্যে অজস্র ধারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোনমতে ভিড় সরাইয়া মণীশ বাহির হইয়া আসিল। দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না। মন্দির প্রদক্ষিণান্তে সে পরিচিত পাণ্ডার দ্বারা রুলী-চর্চ্চিত ও মাল্য-ভূষিত হইয়া তাহাকে কিছু প্রণামী দিয়া বন্ধুর খোঁজ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। একটা বৃহদাকার নিরীহ বৃষ ব্যস্ত মণীশের গলার মালাগাছির উপর লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিয়াছিল। তাহার মুখের উপর তাহার কাম্য ফল নিক্ষেপ করিয়া বিস্মিতভাবে সে বাহিরে আসিল। ঢুণ্ডিরাজ পার হইয়া একটা দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শচীকান্ত একটা কাঠের ঘোড়ার দর করিতেছিল। মণীশ নিকটে আসিয়া অধীর ভাবে কহিয়া উঠিল, "তুমি মন্দিরে মোটে ঢোকোওনি না কি?"

"না, দেখত মণীশ, এইটের দাম চৌদ্দ আনা হবে কিনা?"

"কার জন্য?"

"কল্যাণীর খোকার জন্যে কিনচি। এস, বড্ড ভিড়; বেশীক্ষণ এই বদ্ধর মধ্যে থেকে ত লাভ কিছুই নেই।"

মণীশ বন্ধুর অনুসরণ করিল, কিন্তু তাহার ব্যবহারে মনে ক্ষোভের সীমা রহিল না। স্পষ্ট করিয়া সে যে এই দেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল, এ কি তাহার পিতার অগোচর থাকিবে? মৃত্যু-শয্যা শায়িতা মায়ের কাছে কি এ পাপ গোপন থাকিবে? তাঁহারা কি আঘাতই না পাইবেন! আর কো[illegible] তাহাকে বলিবার প্রবৃত্তি হইল না। রাজপথে তখন রৌদ্র নামিয়াছে,

পাথরের রাস্তা ইতঃমধ্যেই তাতিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফুল-শূন্য ফুলের সাজি দুলাইয়া এখানে ওখানে পঞ্চপাত্রস্থিত জলের ছিটা দিতে দিতে কাশীবাসীগণ ঘরে ফিরিতেছিলেন। একটি বৃদ্ধা যুবকদ্বয়কে দেখিয়া জাতিসুলভ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা বাছারা কোথা থেকে আসচ গা?"

সম্মুখে বেণী-মাধবের ধ্বজা অতীতের একটা অতি কঠোর স্মৃতির সাক্ষ্যস্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শচীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কিসের মনুমেণ্ট রে?"

মণীশ জিনিষটার প্রকৃত ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া কহিল, "দেখতে যাবে?"

শচীকান্ত কহিল, "যাব বৈ কি চল্ না।"

মণীশ ফিরিল, কিন্তু এবার সে একটা খোঁচা না দিয়া থাকিতে পারিল না। ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আরঙ্গজেবের তবু ভাগ্যটা ভাল, বিশ্বেশ্বরের চেয়ে!"

শচীকান্ত তৎক্ষণাৎ হাসিয়া উত্তর দিল, "আরঙ্গজেব যে নিশ্চিত ছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্চে, বিশ্বেশ্বর যে আছেন তার কোন প্রমাণ নেই। ও রকম অনিশ্চিত বস্তুর দাসত্ব করা আমার পোষায় না।"

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে দুইজনেই গতি বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। দেবমন্দিরের ভোগ-রাগ শেষে দেব-সেবকগণ যে যাহার স্থানে বিশ্রাম করিতেছে। পথে জনসংখ্যাও অনেকটা হ্রস্ব হইয়াছে। শেষ শীতের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আপনার সহস্র কনকরশ্মি পা-টমাকলের প্রস্তর প্রাসাদ ও রাজবর্ম্মের উপর

অজস্র ধারে বর্ষণ করিতেছিল; যাজন শেষে নৈবেদ্যের স্বল্প ফলমূলাদি উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিয়া পুরোহিত ঠাকুর নিরুদ্যম চরণে গৃহে ফিরিতেছেন। কিয়দ্দূর আসিবার পর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শচীকান্তই প্রথমে কথা কহিল। সে বলিল, "মণি, তুমি আমার ওপর ভারি চটেচ,—না? ভাব্‌চ বেল্লিকটা একেবারে জাহান্নমে গেছে।"

"চটিনি ঠিক,—যাক্, ও কথা আর কেন?" মণীশ একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া একটু বেগের সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। শচী তাহার অনুসরণ করিয়া কহিল, "রাগ করো না ভাই। তোমাকে কষ্ট দিতে আমি একেবারেই ইচ্ছা করি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতকগুলো অসঙ্গত সৃষ্টিছাড়া বিশ্বাস নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনার চেষ্টা করায় লাভ কি? ঈশ্বর ঈশ্বর বলে চেঁচামেচি করায় কারুকে কি বিশেষ কোন সুবিধা পেতে দেখেচ? তা যখন হয় না, চিরদিন কঠোর সাধনাতেও যখন ঈশ্বরের দয়া বা সাহায্য পেয়ে শ্রম সফল করতে কাকেও দেখিনে, তখন কি হবে সে রকম অক্ষম শক্তির সাধনায়? থাকতে হয় তিনি তাঁর নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে থাকুন, আমার সঙ্গে তাঁর কি 'সরোকার'? মানুষের পক্ষে তার ঈপ্সিত পথে নিজের শক্তি ও ইচ্ছা-অনুসারে নিজের জীবন গড়ে নেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা। আমার মতে দেবতা ও মানুষের কঠোর শাসনশৃঙ্খলে হাত পা বেঁধে তাকে চেপে না রেখে শুধু তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করতে দিলে মানুষ এখন যা হয়েচে, তার চেয়ে শত-গুণে বড় হবার অবসর পায়, তাকে তাই করতে দাও। এই ক্ষুদ্র

পৃথিবী গ্রহটুকু তার চলাফেরার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। এর চেয়ে বড় বড় লোকে যাবার তার কিছু মাত্র দরকার নাই। তারা যেখানে আছে, সেইখানেই থাক।”

কথাটা বলিয়া নিতান্ত কৃপালুভাবে বন্ধুর অকস্মাৎ উত্তেজনা-রক্ত মুখের দিকে চাহিয়া সে মৃদু হাসিল। সে হাসি তাহার বন্ধুর শরীরের স্ফীত শিরাসমূহের মধ্য দিয়া যেন সহসা বিদ্যুৎ বহন করিয়া লইয়া গেল। তীব্র কণ্ঠে সে কহিয়া উঠিল, “ঈশ্বরকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে মনুষ্যত্বকে জাগাতে চাও,—জানো, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব কোন্ শক্তির অংশ? তুমি যে মত প্রকাশ করলে, তার নাম যথেচ্ছাচার। তার পরিণাম উন্নতি নয়, ধ্বংস!”

শচীকান্ত হাসিয়া উঠিল, কহিল, “কিসে? পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রমাণ করে দিচ্চেন, আকাশ যেমন শূন্য, তার অধীশ্বরও তেমনি শূন্যমাত্র, আর এই মত পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ লোকই গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেনি, তারা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, না, দিন দিন ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করচে?”

মণীশের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, “কে বল্‌তে পারে, তাদের এই বৃদ্ধি জোয়ারের জলের মতই মুহূর্ত্তের স্ফীতিমাত্র নয়? আমার কাছে যা বল, যা কর শচী, সে আমি ধরিনে; কিন্তু তোমার বাবা এই সব কথা শুনলে কি রকম দুঃখিত হবেন, একবার ভাব দেখি? তিনি ভগবানকে নিত্য প্রত্যক্ষ করেন, আর তুমি তাঁর ছেলে হয়ে তাঁর সর্ব্ব-প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানকে এমন করে অগ্রাহ্য করতে সাহস কর!”

"তার কাছে আমি কখনও ও সব কথা বলি, দেখেচ? তুমি অবশ্য কিছু একথা তাঁকে বলতে যাচ্চ না? ব্যস্, তা হলেই চুকে গেল, তিনি জানবেন কি করে?"

মণীশ ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "একজন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক ভিতরে ও বাহিরে দু'রকম মত পোষণ করতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারিনে। বিশেষ বাপের কাছে মিথ্যাচরণ করা মোটেই সঙ্গত নয়।"

শচী তখনও সেইরূপ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল, "তবে না হয় মনে কর, ঈশ্বর আমায় যেমন গড়েচেন, আমি সেই রকমই হয়েচি। কি করব, আমার ত হাত নয়।"

মণীশ ক্রুদ্ধ কটাক্ষে সবেগে কহিল, "ও কথা বল্লে শুনব কেন? তুমি ত ঈশ্বরের অস্তিত্বই মান্‌চ না।"

"ধরে নাও, মান্‌চি।"

"তবু তাঁর দোষ দিতে পার না। ঈশ্বর ত কর্ম্মফলদাতা, কর্ম্ম নিজেরই কৃত, সেই তোমার বুদ্ধি বিকৃতির নিমিত্ত কারণ।"

শচীকান্ত মণীশের দিকে বিদ্রূপ হাস্যের সহিত চাহিয়া কহিল, "তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে মণীশ, তুই একেবারে শঙ্করাচার্য্য হয়ে উঠ্‌লি যে।"

মণীশ ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ক্ষোভের হাসি হাসিয়া চুপ করিল।

বেলা অনেক হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজা উপাসনা শেষে পূজা-গৃহের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার শুভ্র প্রশান্ত বক্ষে রজত সর্পের ন্যায় শুভ্র উপবীতগুচ্ছ মহাদেবের বক্ষে ফণিভূষণের ন্যায় ভূষিত রহিয়াছে।

কৌষেয় বস্ত্র তখনও ছাড়া হয় নাই, ললাট ব্যাপিয়া চন্দনতিলক বিদ্যমান। শচীকান্ত সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পদতলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণীশ প্রণামান্তে পদধূলি গ্রহণ করিল। উমাকান্ত সস্নেহে পুত্রের পারিপাট্যযুক্ত কেশের উপর হাত রাখিয়া করুণাপূর্ণ হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ! তোমায় ত বেশ ভালই দেখাচ্চে!"

শচীকান্ত পিতার মুখে চকিতমাত্র দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বিস্মিত হইল। এই বয়সে দেহ এতটুকু নত হয় নাই। কি শান্ত সহাস্যমুখ! সবিস্ময় সম্মানের সহিত সে উত্তর করিল, "আমি ভালই আছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মণীশের দিকে চাহিলেন, "বেড়াতে গিয়াছিলে! মন্দিরে গিয়েছিলে দেখছি যে—" বলিতে বলিতে পুত্রের ললাটের প্রতিও নেত্রপাত করিলেন। মন্দিরের নাম উঠায় শচীকান্ত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষার্থে সে একটা উপায় অবলম্বন করিল; কহিল, "মা এখন কেমন কাছেন?" বলিতে বলিতে গঙ্গামণির ঘরের দিকে চলিয়া গেল। মণীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুসরণ করিল।

১৪

দুই চারি দিন কাটিয়া গেল। রোগীর অবস্থা ভাল হইল না। বাড়ীর লোকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মণীশ ও ভক্তিনথই রোগীর সেবা বেশীর ভাগ করিতে লাগিল। শচীকান্ত যেটুকু পারে, তাহাতে সে পরাঙ্মুখ হইল না। একদিন রোগীর

বদ্ধ গৃহের ভারাক্রান্ত বাতাসে বহুক্ষণ থাকিয়া ক্লান্তি বোধ করিয়া শচীকান্ত ত্রিতলের খোলা ছাদে উঠিয়া আসিল। চারিদিকে সমুচ্চ মন্দির-চূড়াসমূহ অস্তমান সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণে জ্বলিতেছে। পার্শ্বে মন্দিরের উদ্যানে বিবিধ বর্ণের গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মাধবী ও ঝুমকা লতায় জড়িত এক কুঞ্জের মধ্যে একজন গেরুয়াধারী দণ্ডী পদ্মাসনে বসিয়া জপ করিতেছে। শচীকান্ত দেখিল, মণীশ একখানি বই খুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছে। সে হাসিয়া উঠিল। মণীশ পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া ধীরভাবে কহিল, "কি ?"

"সুবোধ বালকের মত এক মনে পড়ে যাচ্চ যে ? ওহে, অত করে পড়ো না,—মাথা খারাপ হয়ে যাবে। দেখ, আমি আজকাল কোন রকম গুরুতর ভাবনা টাবনার ধার ধারিনে, শরীরটাও তাই কেমন সেরে গেছে।"

"তুমি তাতে খুব সুখে আছ ত ?"

"তা—নেইই বা ব'লি, কি করে ? অবশ্য বড় বড় বিষয় নিয়ে নাড়া চাড়া করায় একটা আনন্দও যে পাওয়া না যায়, তা নয়, কিন্তু আমার মতে ভবিষ্যতে তা থেকে কার কি উপকার হবে, তা ভেবে জীবন উৎসর্গ না করে বর্ত্তমানটাকে ভাল করে উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমিও যেমন! কে কার জন্য কি করতে পারে ? এই ত কত বড় বড় জাতির অভ্যুদয় হলো, কত জাঁক, কত জমক, আজ আর তাদের নাম গন্ধও নেই। কো কদিন আছি, সুখে থাকি, তারপর মরে যাব,—ব্যস্‌ সব শেষ !"

মণীশ হাসিল, কহিল, "প্রজাপতির মত ?"

"হ্যাঁ,—প্রজাপতির মত। কিন্তু তাও ঠিক নয়, তারাও ঠিক সুখী হতে জানে না, উমেদারী করতেই তাদের দিন কেটে যায়। তবে ওই রকম ফিলজফির বই কোলে করে নির্জ্জন ছাদের উপর তাদের জীবনের সুখের দিনগুলা তারা অপব্যয় করে না—এটা ঠিক! তোমার মত মানুষের চেয়ে তারা ঢের সেয়ানা।"

মণীশ বই মুড়িয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি দর্শনতত্ত্বের কি-বা জানি,—একটু উল্টেপাল্টে দেখি মাত্র! আর তাঁদের,—সেই সুদূর অতীতের মহাজ্ঞানীদের অগাধ জ্ঞান অনুভব করে হতবুদ্ধি হয়ে যাই! নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কত বিশদ করে, কত বড় করে সেই অতীত যুগে তাঁরা ঘোষণা করে গেছেন, এখনও জগতের আর কেউ তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে পারলে না! শুধু নীচের সিঁড়িটা পেরিয়ে উঠ্‌চে মাত্র। আর এই সব থেকে যখন মনকে সংসারে ফিরিয়ে আনি, তখন সেখানকার কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে থাকি। কি চমৎকার বন্দোবস্ত! গোড়া থেকে আইনে বাঁধা নিয়মের উপর এই এত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ডটা চলেচে। কোথাও কোন বে-বন্দোবস্ত নেই, আটক নেই। এমন কি, এর একটা ধূলিকণার স্থান পরিবর্ত্তনেও যেন নির্দ্দিষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে, দেখতে পাই। এই বিরাট কাণ্ড যাঁর চোখের ইঙ্গিতে সম্পন্ন হচ্চে, তাঁর কথা কি, না ভেবে থাকা যায় শচি? তাঁর পায়ের তলায় মাথা যে এই এমনি করে আপনি নত হয়ে আসে!" এই বলিয়া মণীশ ভূমিতে মাথা নামাইয়া প্রণাম করিল।

শচীকান্ত মুখ টিপিয়া হাসিল, করুণার সহিত কহিল, "যাক্,

ও সব কথা! আমি কুন্দমালাকে একদিন দেখে এসেছি।” বলিয়া সে নিস্তব্ধ মণীশের মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া দেখিল, পরে কহিল, “কি! একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলে না যে?”

মণীশ আলিসার ধারে ঝুঁকিয়া নীচে বাগানের দিকে দৃষ্টির স্থির করিয়া উদাসীনভাবেই উত্তর দিল, “না।”

“কেন, বৈরাগ্য না লজ্জা?”

“একটাও না। আমি বিয়ে করব না।”

“বিলক্ষণ! এ আবার কি সখ্? এর অর্থ কি?”

“অর্থ? অর্থ কিছুই নেই।”

“বিনা কারণে এত বড় একটা কাণ্ড হতে পারে?”

“বিনা কারণে এত বড় বিশ্বটা যদি আকস্মিক আবির্ভূত হতে পারে, তবে এটা এমন কি ব্যাপার যে, এ’হতে পারবে না?”

শচী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বন্ধুর পৃষ্ঠে একটা চপেটাঘাত করিল, কহিল, “আঃ থাম্। না, সত্যি বল্ না—কেন?”

“বল্লাম ত, এর মধ্যে রহস্য কিছুই নাই। এতে আর ‘কেন?’ কি থাকবে?”

শচীকান্ত কহিল, “আছে বই কি। সৃষ্টি-শুদ্ধ লোকে যা করে থাকে, তুমি তা না করবে কেন? তুমি কি সৃষ্টি ছাড়া?”

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, “তবে বোধ হয় আমি সৃষ্টি ছাড়াই। তুমি আজ কাল আর পদ্য টদ্য লেখো না, না কি?”

“হাঁ ভাই, খুব লিখি। ঐটেই হল’গে আমার জীবনের খোরাক। ‘বাসন্তী’ আর ‘ক্ষণিকের দেখা’ বলে দুটো বই শীঘ্রই বার করব যে।”

মণীশ হাসিল না, বা কোন উৎসাহ প্রকাশ করিল না। সে বাতাসে ভাসিয়া আসা সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধটুকু নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জপপরায়ণ দণ্ডীটির প্রতি সভক্তি দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া মৃদুভাবে কহিল, "ক্ষণিকে'র সে দেখা, এখনও তুমি ভোলনি, তা হলে ?"

শচী হাসিয়া কহিল, "কই আর ভুলতে পারলুম ! ওর প্রথম কবিতাটা শুনবে, তবে ?—

ভয় নাই, ভুলিব না। তুই কিরে ভুলিবার ?
ও মূরতি সাবধানে, রাখিয়াছি মনে প্রাণে,
তুইরে এ মরু-বক্ষে সুশীতল জলধার।
এ জন্মে বা জন্মান্তরে, তুই কি রে ভুলিবার ?"

১৫

অবশেষে একদিন সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণ আসিল। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গঙ্গাতীরে পুণ্যবতী পত্নী স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। পূর্ব্বক্ষণে দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ঋষিতুল্য স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, "দেবতা জানি না, ধর্ম্ম জানি না, শুধু তোমায় জানি। ও পদসেবার অধিকার যেন আমায় হারাতে না হয়, এইটি শুধু তুমি দেখো,—আর কিছু চাইনে!" তারপর নিশ্বাস লইয়া কষ্টে কহিলেন, "কত দোষ-অপরাধ করেচি, সব ভুলে যেয়ো। আশীর্ব্বাদ কর, চল্লুম !" অবিচলিত হৃদয় সাধক ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "সতীলোক প্রাপ্ত হও !"

শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ করিয়া ভবনাথ সপরিবারে গৃহে ফিরিয়া

গেলেন এবং শিবনারায়ণ সপরিবারে কিছুদিন কাশীবাসের ইচ্ছায় তথায় রহিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রথমে ইহাতে কিছু আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বাড়ী শুদ্ধ সকলের, বিশেষতঃ করুণাময়ীর, অনুরোধ কাটাইতে না পারিয়া তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। সকলেই বুঝিল, তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। গৃহীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শেষ হইয়াছে,—এইবার বানপ্রস্থের সুযোগ উপস্থিত।

সে দিন শেষ শীতের সায়াহ্ন অতি শীঘ্রই রজনীর অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। ঈষৎ কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে জ্যোৎস্নার বিকাশ রুগ্ন মুখে মৃদু-হাসির মতই ম্লান দেখাইতেছিল। বাড়ীর ছাদের আলিসা ও চিলের ছাদের ছায়াগুলা দীর্ঘ হইয়া অন্ধকার রাজপথে ছড়াইয়া পড়িল। এমন সময় রামনগরের কেল্লা দেখিয়া মণীশ, সত্য ও করুণাময়ী তিন জনে অসি-ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

পুরাতন স্থানের অন্য কি মাহাত্ম্য আছে, ঠিক বলিতে পারি না! কিন্তু মনটাকে যে কেমন এক ক্লান্ত অবসাদের মধ্যে সে নিক্ষেপ করে, তাহা বেশই বুঝিতে পারা যায়। দ্রষ্টাকয়জনের মনে এই ভাবটাই কম-বেশী জাগিয়া উঠিয়াছিল। মণীশের খুড়িমা ব্যাসদেবের কলহের কথা ভাবিতেছিলেন, মণীশ ভাবিতেছিল, মহারাজ চেৎসিংহের কথা। শিবালয়-ঘাটের উপরকার যে বুরুজ হইতে তিনি গঙ্গার গর্ভে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন, অদূরে তাহাও দেখা যাইতেছিল—পরপারে নিবিড় অন্ধকার বনানীর মধ্যে রাজপ্রাসাদের অস্পষ্ট দীপমালা।

সম্মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে সহসা কে বলিয়া উঠিল, "মানুষ কি ? পথ ছাড় ত বাবা,—চোখে কিছু দেখতে পাচ্চিনে। এ মেয়ে গেল কোথায় ?"

সন্ত্রস্ত হইয়া তিনজনেই একধারে সরিয়া সম্মুখে পথ ছাড়িয়া দিলেন। করুণাময়ী দেখিলেন, বৃদ্ধা দৃষ্টিহীনা, দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া অতি কষ্টে হাতড়াইতে হাতড়াইতে পথ চলিতেছেন। অসহায় মুখচ্ছবিকে যদি সে তরল অন্ধকার ঢাকিয়া রাখিতে পারিত ত ভালই হইত। ব্যথিত চিত্তে নিকটে গিয়া তিনি কহিলেন, "এই অন্ধকারে একা কেন বেরিয়েছ, মা ? কোথায় যাবে, তুমি ?"

বৃদ্ধা কহিলেন, "আর মা, যম যাকে ভুলে বসে থাকে, তার আর যাবার স্থান কোথায়! এই ঘাটের দিকেই এগিয়ে দেখি, মেয়েটা কেন এত দেরি কচ্ছে। হা মা গঙ্গা! তোর গর্ভেও কি একটু জায়গা নেই, মা ?"

মানুষের মনে গভীর যন্ত্রণা না থাকিলে এত বড় আত্ম-ধিক্কার শুধু বয়সের অসহিষ্ণুতায় ঘটিতে পারে না। করুণাময়ীর মনে এই অসহায়া রমণীর জন্য করুণার উৎস উথলিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দাঁড়াও বাছা, আমরা তোমার মেয়েকে ডেকে দিচ্ছি। কি বলে ডাকব ?"

বৃদ্ধা ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন, আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "ভাল হবে মা, তোমার মন ভাল। আর মা, আমার এ দুঃখের শরীরে সব সহ্য হয়, তবে ভয় করে, রাত-ভিত, যদি পড়ে মরি, নিজেও অপঘাতে যাবো, আর মেয়েটা—মরুক্‌গে, কপালে যার যা আছে,

কেউ তা খণ্ডাতে পারে না। হ্যাঁ আমার ন'তনিকে ডেকে দেবে, বলচ? তার নাম কমলা।"

"এই যে আমি এসেচি। আঃ তুমি আবার এই অন্ধকার রাত্রে কেন বেরিয়েছ ঠাকুমা?" পিছন হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠে কে এই কয়েকটি কথা বলিল। করুণাময়ী চাহিয়া দেখিলেন ভিজা কাপড়পরা একটি মেয়ে প্রকাণ্ড একটা কলসী কাঁখে বহিয়া তাঁহাদের দিকেই আসিতেছে। মেঘ-সরা চাঁদের ক্ষণ জ্যোতিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। চাঁদের আলো যেন তাহার গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

এই দুরবস্থা বৃদ্ধার মনে প্রকাণ্ড প্রস্তরের মতই ভার হইয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল। একটু সহানুভূতি পাইতেই পাথরখানা সরাইয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে তাঁহার এতটুকু দ্বিধা রহিল না। সামান্য পথটুকু চলিবার সময় আপনার সমস্ত ইতিবৃত্তটুকু তিনি এই অপরিচিতা সহানুভূতিকারিণীর নিকট নিবেদন করিয়া দিলেন।

প্রবীণা কহিলেন, "মা, এ পোড়ার মুখে কি আর সে সব কথা আসে,—সে যেন আমার আগের জন্মের কথা সব,—সবই স্বপন হয়ে গেছে! রাক্ষসী একে একে সবাইকে পেটে পূরে বসে আছি—মরণও ত বিধাতা লেখেনি! এখন আরও যে কি বাকি আছে, তাই সর্ব্বদা ভয়! আর ভয়ের আমার আছেই বা কি? শুধু ঐ একরত্তি মেয়েটা! তা দেখ বাছা, আমি আর যমকে বড় ভয় করিনে, সে এক রকম আমার ঘরের লোকই হয়ে উঠেচে—ভয় করে এখনও এই মানুষকে। মানুষকেই বেশি ভয় মা,

মানুষের ভয়েই আমি আরও মারা গেলুম। সাপকে ভয় করিনে, দেখ না, এই আঁধার রাতে ছেড়ে দিয়েচি। তবু দিনের আলোয় ঘাটে-পথে বেরুতে দিতে পারিনে। ঠাকুর ছাই-পোয়া কপাল গড়েচে, ছাই মাথা রূপ কেন গড়েননি বল দেখি, মা? এ কোন্ বিচার?"

তখন সকলে অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়াছেন। গৃহস্থ-গৃহ হইতে দীপালোক রাস্তার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বালিকার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া করুণাময়ী সহসা আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। বিস্ময়ে প্রশংসায় তাঁহার দৃষ্টি বিস্ফারিত ও সেই ক্ষুদ্র মুখখানির উপরই নিবদ্ধ হইয়া রহিল! এমন রূপের ডালি মেয়ে, ইহাকে লইয়া সংসারে কোথাও কোন অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে!

বৃদ্ধার গৃহ অসিঘাট হইতে অধিক দূরে নহে। সামান্য এক খানি খোলার চালের মেটে বাড়ী, সম্মুখে কুলুঙ্গিতে একটি কেরোসিনের ডিবা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল; কিন্তু আলোক অপেক্ষা ধূমই সে অধিক উদ্গীরণ করিতেছিল। সম্মুখে জেওল গাছের মধ্যে তখনও মধ্যে মধ্যে বিনিদ্র কপিশাবকগণের বিবাদ-কোলাহল থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল।

দাওয়ায় কলসী নামাইয়া মেয়েটি ক্ষিপ্র হস্তে পিতামহীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে অনতি-উচ্চ দাওয়ার উপর টানিয়া তুলিল। করুণাময়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিয়া স্থান-নিরূপণ করিয়া রাখিতে রাখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে আর কেউ নেই?"

বৃদ্ধা কহিলেন, "কে থাকবে মা ? ঠাকুর-পুত্তুর ছিলেন, তিনিই বড় অসময়ে দুঃখীদের আশ্রয় হয়েছিলেন কি না, তাই সর্ব্বগ্রাসী তাঁকেও আজ সাত আট মাস হল, গ্রাস করে বসে আছি। দেখ মা, আর কিছুর ভয় করিনে,—এ কাশী জায়গা—ঘরে মলেও এখানে কোন ক্ষতি নেই, পাড়ার লোককে অনেক করে পায়ে ধরে বলে রেখেছি, দুজন বামুন ডেকে হাড় ক'খানা গঙ্গায় দেবে। কিন্তু আমার এই যে মহাকাল দেখছ মা, এই আমার সর্ব্ব-শরীরের রক্ত যেন হিম করে দিচ্চে ! এস মা, তুমি বড় ভাল লোকের মেয়ে,—আজ অনেক দিন পরে অনেক দুঃখের কথা তোমার কাছে বলে মনটাও যেন হাল্কা বোধ হচ্চে। আমার দুঃখ অফুরন্তি বাছা,—এর আর শেষ নেই। হিম-শীত, যাও মা, তুমি নিজের ঘরে যাও।"

যতক্ষণ করুণাময়ী দাঁড়াইয়াছিলেন, ততক্ষণই সেই স্তিমিত আলোকে বৃদ্ধার পার্শ্ববর্ত্তিনী স্তব্ধ মূর্ত্তিখানির পানেই তাঁহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রশংসা-মিশ্রিত বিস্ময়ে আবদ্ধ ছিল। একটা সকরুণ বেদনা ভিতরে ভিতরে কেবলই তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। এমন মেয়ের এই দশা,—বিধাতার এ কেমন বিধান, কে জানে ! আহা, রাজার ঘরেও যে এমন রূপ দেখা যায় না ! কিন্তু মেয়েটি তাঁহার অত্যন্ত করুণায় যেন ঈষৎ ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিল। সে প্রথমে একটু বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পরে বৃদ্ধার হস্ত আকর্ষণ করিয়া দ্রুত কণ্ঠেই কহিল, "এস ঠাকুমা, সরে এস, ঠাণ্ডা লাগছে।"

বলিয়াই সে মুখে চোখে উড়িয়া-পড়া রুক্ষ চুলের রাশি বাম

হস্তে ঠেলিয়া মাথার উপর সরাইয়া দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

করুণাময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। মণীশ সত্য অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; তিনি নিকটে আসিতে তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল। সত্য কহিল, "হাঁ মা, ওরা বাঙ্গালী, না?"

"হ্যাঁ" বলিয়া করুণাময়ী মণীশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আহা, দেখলে বুক ফেটে যায়। এমন রূপের ডালি মেয়ে, পয়সার অভাবে বর জুটচে না! তোদের বন্ধু-টন্ধু কেউ নেই রে মণীশ যে, দয়া করে বিনি পণে এই মেয়েটিকে বিয়ে করে?"

খুড়িমার আকস্মিক করুণা দেখিয়া মণীশ ঈষৎ হাসিল। পৃথিবীময় যে দুঃখ দারিদ্র্য ছড়ানো রহিয়াছে, তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশ দেখিয়াই সহসা ভাবাবেগে এতখানি ব্যাকুল হইলে চলিবে কেন? যে অভাব সমাজ-গত, তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করিলে, কতটুকুই বা ফল হইবে? সে কহিল, "বন্ধু থাকবে না কেন, তবে বিনি পণে বিয়ে করবার মত বন্ধু ত বড় একটা চোখে পড়ে না। তা ছাড়া খুড়িমা, যার বিয়ে দিচ্চ, সে ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ, তার কোন খপর নিয়েছ?"

করুণাময়ী ঘোর অপ্রতিভ হইয়া জিভ্‌ কাটিয়া কহিলেন, "ওরে, না, তা ত জিজ্ঞাসা করিনি!"

১৬

খাঁচার পাখী ও আকাশের পাখীতে যতটুকু প্রভেদ, গৃহবাসিনী ও তীর্থচারিণী বঙ্গনারীতেও ঠিক ততখানি পার্থক্য আছে।

গৃহে তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য গৃহধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন-যাত্রার উপযোগী করিয়াই কেবলমাত্র গঠিত হইতে থাকে ; কিন্তু আজ গৃহের বাহিরে সেই চিরজীবনের অভিজ্ঞতাটুকু লইয়া নিজেকে কোন মতেই সন্তুষ্ট রাখা চলে না।

যে সন্ধ্যায় কমলার পিতামহীর সহিত করুণাময়ীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যা ছাড়িয়া তিনি যখন কাপড় গামছা লইয়া দাসীর সঙ্গে ঘাটের দিকে চলিলেন, তখন অস্পষ্ট অন্ধকারের জাল ছাড়াইয়া সূর্য্যের প্রথম রশ্মিচ্ছটা পৃথিবীর বক্ষে নামিয়া আসিবার জন্য পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। পাখীগুলা তখনও জাগিয়া উঠে নাই ; কিন্তু চঞ্চলমতি বানরের দল জাগিয়া উঠিয়া পথে ও প্রাচীরে বাহির হইয়া কাহার কি ক্ষতি করিয়া দিনের কার্য্য আরম্ভ করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। দেব-মন্দিরে ভোরের নহবত ভৈরবী সুর ধরিয়াছে! সে সুরে সদ্য-জাগ্রত চিত্ত আনন্দ-রস-পানে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। গঙ্গাতীরে যতি-ব্রহ্মচারীগণের স্নানার্চ্চনা শেষ হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে অস্পষ্ট-প্রায় কোন মূর্ত্তির উচ্চারিত গম্ভীর 'ব্যোম্‌ব্যোম্‌!' ধ্বনি ভক্তি-বিস্ময়ে শ্রোতাকে সহসা চমকিত করিয়া তুলিতেছিল।

করুণাময়ী ঘাটে আসিয়া জলের ধারে দাঁড়াইয়া একবার প্রত্যাশিত নেত্রে চারিধারে চাহিয়া দেখিলেন, পরে হতাশ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। বৃদ্ধার কাহিনী শুনিয়া অবধি প্রতি প্রত্যূষেই নাতিনীটির সহিত তাঁহাকে গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইবেন, এমনই একটা আশা তিনি মনের মধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে

পাইলেন না। জলের উপর দিবসের প্রথম প্রাণস্পন্দনের মত তরুণ সূর্য্যের জ্যোতির্ব্বিম্ব তখন ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। ঘাটের অদূরে তুলসী মন্দিরে ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা-কাঁসর সঘন রবে বাজিয়া উঠিয়া বহু নিদ্রাময়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিল। তীরের ঢেউগুলি সবেমাত্র যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া মৃদু কাকলীতে বিশ্বেশ্বরের বন্দনাগীত গাহিতে আরম্ভ করিল। আকাশের বিরাট স্তব্ধতার গায়ে আঘাত করিয়া ক্ষণে-ক্ষণে "ব্যোম—ব্যোম" ধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছিল।

স্নান পূজা সারা হইলে সিক্ত বস্ত্র দাসীর হাতে দিয়া করুণাময়ী উপরে উঠিয়া জগন্নাথ দর্শনে গিয়া মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারের নিকট হইতে ফিরিবার সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, একটু পাশের দিক হইতে কে বলিতেছে, "হা জগন্নাথ, কাঙ্গাল দেখে কি তোমারও দোর বন্ধ হল!"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—এ আক্ষেপ পিতামহীর না! তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইল। কষ্টে দুঃখে মানুষটা একেবারে জগৎ ও জগদতীত সবার উপর বিশ্বাসহীন হইয়া গিয়াছে!

তিনি দেখিলেন, রাত্রের সেই বৃদ্ধা ও তাঁহার নাতিনী একটি ঘটিতে জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি ঠাকুরমার হাত ধরিয়াছিল, বৃদ্ধা প্রায় দৃষ্টিহীন। অগ্রসর হইয়া করুণাময়ী কহিলেন, "আসুন না, আমরা এইখানে একটু বসি। এখনই দরজা খোলা হবে।"

তাঁহার কথার সাড়া পাইয়া বৃদ্ধাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, শব্দ-লক্ষ্যে মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ গা,

তুমি আমার কালকের সেই মা, বুঝি! ওমা, তুমি এ হতভাগীকে এখনও ভোলনি ?"

কৃতজ্ঞতায় আনন্দে স্বর তাঁহার জড়াইয়া আসিল। করুণাময়ী নিকটে আসিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ?"

"ব্রাহ্মণ—মা।" করুণাময়ী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন দেখিয়া মেয়েটিও নত হইয়া করুণাময়ীর পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। করুণাময়ী মুগ্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, "রাজরাণী হও।"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এই বল মা, যেন আমার পোয়া সিঁদুর পরে মনের সুখে থাকতে পায়,—আর আমার কিছু আশা নেই।"

করুণাময়ী সস্নেহে কমলার সদ্যোস্নানসিক্ত কেশের উপর হাতখানি রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আহা, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা! আমি বলচি, তোমার ভাল হবে মা।"

"মাগো, তুই তাই বল্‌ মা, তাই বল্‌!"

বৃদ্ধা কম্পিত হস্তে করুণাময়ীর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কমলাও ঠাকুরমার ক্রন্দনে ঈষৎ আর্দ্র প্রায় চক্ষু নত করিল। করুণাময়ী যে অতখানি জোরের সঙ্গে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা যেন তাঁহার নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক করুণা-মথিত সান্ত্বনাবাক্য মাত্র নহে; যেন তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ হইতে নিঃসৃত মানবাত্মার সুগভীর শক্তি-পূত একটি কল্যাণমন্ত্রের মতই তাহা উচ্চারিত হইয়াছিল। তাই তাহা শ্রোতা'কে এতখানি

বিচলিত করিয়া তুলিল! একই বীণা, একই বাঁশি, হাতের গুণে যেমন লোকের চিত্তে আনন্দ বা বিরক্তির উদ্রেক করে, তেমনই একটি অতি ক্ষুদ্র কার্য্য বা বাক্য সময়ের প্রভেদে সুরের বিভিন্নতায় সহসা কোন এক সময় যেন জগতের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসে, এবং আপনার যাদুমন্ত্র-প্রভাবে মনকে একেবারে বিঁধিয়া দেয়।

নরসিংহ দেবতার দ্বারের নিকট বসিয়া বৃদ্ধা তাঁহার নিজের কাহিনী সেদিন সেই প্রাণখোলা সহানুভূতিটুকুর বিনিময়ে সহানুভূতিকারিণীর নিকট নিবেদন করিয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, "দেখ মা, আমাকে এখন তুমি যে রকম দেখছ, আমার অবস্থা চিরদিনই এ রকম ছিল না। এখন আমার সংসার যেমন শ্মশান হয়ে গেছে, প্রাণের ভিতরও ঠিক এম্‌নি জলে পুড়ে খাক্ হয়েছে। কিন্তু এই সর্ব্বনাশী আমিই আবার স্বামী পুত্র নিয়ে সর্ব্বসুখী ছিলুম। সংসারের সুখ যে পদ্মপাতার জলের মত টল-টল করচে, আমার কপালই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত!

"স্বরূপপুর কোথায়, তুমি জানো? সেই স্বরূপপুরে আমার শ্বশুর বাড়ী। শ্বশুরের পূজোর দালানে মায়ের প্রতিমা কোন বছরই বাদ পড়তো না, কালী পূজোর খুব ঘটা বছর বছর হয়েছে, সে সব এক দিনই গেছে মা—সে-সব এখন আমার স্বপন! দেখ বাছা, দুঃখ সহ্য হয়, কিন্তু দুঃখের মধ্যে সেই সব মহাসুখের কথাগুলোই যেন আরও অসহ্য! ভগবান দুঃখ দিলেন, দিলেন—চিরকালই কেন এম্‌নি দুঃখী করে জন্ম দিলেন না। এই ত চার ধারে দেখি, কত কত অনাথ আতুর হাসচে কাঁদচে, আমিও না

হয় ওদেরি সঙ্গে ওই রকম করে মিশে যেতুম! বুকে এমন শেল বিঁধে থাকত না, লজ্জায় ঘেন্নায় এত মাটি করত না, তা হলে ত 'রাধে-কৃষ্ণ' বলে দরকার হলে দু'দোরে দু'মুঠো মেগে পেতেও এনে দিন গুজরোন করতে পারতুম! হ্যাঁ বলছিলুম, এখন— আমার শ্বশুর বাড়ীর কথা। শ্বশুর দেশের মধ্যে একজন প্রধান লোক ছিলেন, গাঁয়ের মাথা বল্লেই হয়। এখন যেমন লোকে এক কথায় আদালতে ছোটে, আমার ঠাকুরের আমলে তা ছিল না। যার যা নালিশ-ফরেদ, সব তাঁর কাছে। তিনি পাঁচজন ভদ্র লোক ডেকে যা বিচার করে দিতেন, জজের হুকুমের মতই সেই হুকুম দু'পক্ষ শিরোধার্য্য করে নিত। এতে কারো একটি টঁ্যা-ফোঁ করবার যো ছিল না,—এমনি তাঁর মান।

"এদিকে আবার সত্তর বিঘে জমী নিয়ে বাগান বাগিচে,— হেন বস্তু নেই, যা সেখানে জন্মাত না। মর্ত্তমান কলা থেকে আম কাঁঠাল ইস্তক যতরকম তরি তরকারি আছে, কখনও একটা পয়সা খরচ করে পাড়া পড়সীতে খায়নি। বড় বড় ধানের মরাই বাঁধা, আখের সময় সম্বচ্ছরের গুড় মটকি ভরে ভরে মুখে গুলোপ দিয়ে রাখা হত। কত আর বলব মা, তেঁতুল কাটা, হলুদ সেদ্ধ, নারকেল বাছা, ডাল পাছড়ানো—বউ-ঝি কারুর আর এক নিমেষ বিশ্রাম ছিল না। এক এক সময় এমন গেছে যে, এক পিঠ রুয়ে এক পিঠ ছুঁয়ে—সারা রাত কোথা দিয়ে কেটে গেছে, কাজে কর্ম্মে পাঁচটা সমবয়সীতে মিলে হাসতে খেলতে তা টেরও পাইনি। হায় রে, কোথাই বা সব যায়!"

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হয় তাঁহার মন

তখন বাহ্য জগৎ ত্যাগ করিয়া চিত্ত গহ্বরের অভ্যন্তরে যেখানে তাঁহার পুরাতন স্মৃতিগুলি ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে জমা-করা পড়িয়া আছে, সেইখানে প্রবেশ করিয়াছিল। করুণাময়ী একবার কমলার দিকে চাহিলেন, চক্ষু দুইটি নত করিয়া সে একটা ঢিল কুড়াইয়া মন্দির চত্বরে আনমনে কি চিত্র করিতেছে! সহসা তিনি চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না। ঐ যে চম্পক-কলিকাতুল্য অঙ্গুলিগুলি প্রস্তর-খণ্ডে রেখা টানিতেছে, উহার উল্টা পিঠে বিধাতা কি অমনই অর্থহীন রেখা টানিয়া দিয়া[illegible]ন? চন্দ্রার্দ্ধাংশ ললাটপটটুকু অত সুন্দর, অত নির্ম্মল, ভিতরে না জানি, কি লিখনই বিধাতা পুরুষের অবিচল হস্তে লিখিত রহিয়াছে! আহা, হাত কি এতটুকু কাঁপেও নাই?

কমলার মুখে একটা প্রচ্ছন্ন অপ্রসন্নতার ছায়া পড়িয়াছিল। যাহার তাহার নিকট নিজেদের কথা প্রকাশ করিয়া গোটাকয়েক 'আহা' শুনিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। ঠাকুরমার এই ব্যবহার তাহার নিকট নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকে।

এমন সময় সহসা কি একটা শব্দে বৃদ্ধা সহসা চকিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এই দেখ,—সেই সব কথা বলতে বলতে সব ভুলে গেছলুম! তারপর, হাঁা, স্বামীও আমার খুব ভাল ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি তাঁর মোটে ছিল না। তাঁর আমলেই আমার কপাল ভাঙ্গার সুরু হল। তিনি যখন চলে গেলেন, ছেলে তখন মাথায় রাজ্যের দেনা চাপিয়ে রেখে গেছেন বলে প্রথম আমরা জানতে পারলুম! বিষয় সব পাঁচ সরিকে ঠকিয়ে খাচ্ছিল,

আদায় উসুল হয় না, বরাবর ধারের উপরই এত-বড় সংসার চলে এসেছে। তার পর বাছাও আমায় বজ্রের শোক দিয়ে চলে গেল।...স্বামী-হারা পুত্তুর-হীনা হয়েও শুধু এই গুঁড়ো দুটি নিয়ে, জগতে ছিলুম। মনে করেছিলুম, আমার নিখিলের বউ বেটা নিয়ে, কমলার বর এনে সকল কষ্ট বিস্মরণ হব। বড় আশা করে দুটিকে নিয়ে যেখানে যা ছিল, বেচে-কিনে কলকাতায় চলে এসেছিলুম, বাছা আমার একটা পাশ করে ডাক্তারি পড়তে গেলেন, দু বছর ডাক্তারি করে অভাগিনীকে আশার সপ্তম স্বর্গে তুলে একেবারে অন্ধকার অন্ধকূপের মধ্যে আছড়ে ফেলে দিয়ে পাঁচ দিনের রোগে সোণার গোপাল আমার চলে গেলেন! আমার সব ফুরিয়ে গেল।”

শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা এবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, “ওরে, এত দুঃখেও এ বুক ফাটে না রে! এমন কঠিন প্রাণ নিয়েও জন্মে ছিলুম!”

দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে করুণ-হৃদয়া করুণাময়ীর চোখ বহিয়া জল পড়িতেছিল। তিনি বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া একটু কৃতকার্য্য হইলে পরে জিজ্ঞাসা করিলেন “কমলার মামার বাড়ীতে কেউ নেই?”

বৃদ্ধা কহিলেন, “মেয়ের বরাত সকল দিকেই টনটনে। এক মামা আছে, কিন্তু কোথায় আছে, তা জানিনে, কখনও খোঁজ-খবর করে না।”

যদি তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা যায়, এই আশায় করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মামার নাম কি?”

"কালী চাটুয্যে, ত্রিবেণীতে বাড়ী ছিল—"

"কমলার মার নাম ?—"

"নারায়ণী।"

করুণাময়ীর সমস্ত শরীরে আনন্দের তড়িৎ বহিয়া গেল। বিস্মিতা কমলাকে কোলের কাছে টানিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সইয়ের মেয়ে! নারায়ণী আমার সই ছিলেন,—আমারও বাপের বাড়ী ত্রিবেণীতে।"

এই অভাবনীয় সাক্ষাতের হর্ষ-বিষাদের প্রথম উচ্ছ্বাসটা থামিয়া আসিলে করুণাময়ী কমলার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আর ত তোমাকে ছেড়ে দেবো না, মা। তোমাকেও এইবার মেয়ের বাড়ী যেতে হচ্চে।"

বৃদ্ধা অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন, শেষে কহিলেন, "কমলা ত তোমা'রি, মা। তুমি ওকে নিয়ে যাও, আমি—"

"ওমা, সে কি হয়?" বলিয়া করুণাময়ী বৃদ্ধার হাত ধরিলেন। "কাশী স্থান বলে আপনি মনে দ্বিধা করচেন? আপনার লোকের কাছে কাশীতে দোষ হয় না। কেন মা কমল, তুমি অত কুণ্ঠিত হচ্চ, কেন? আমি যে আজ থেকে তোমার মা হলুম। আমার কাছে যাবে না, মা?" এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছুকভাবে-দণ্ডায়মানা কমলাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন।

হায়, মা! কি মধুর এই মা নাম! অভাগিনী কমলা ত কখনও মাকে দেখে নাই! সে এই মাতৃহৃদয়ের উত্তপ্ত স্নেহধারা হইতে কেমন করিয়া তাহার স্নেহ-বুভুক্ষিত শুষ্ক চিত্তকে বঞ্চিত রাখিবে? এই আদর-মাখা হাত খানির মঙ্গল-স্পর্শ হইতে কি

আপনাকে দূরে সরাইয়া লওয়া যায়? মরুভূমির বিশাল ক্ষুদ্র প্রান্তরে যে শীতল নির্ঝর-বারি তাহার পিপাসিত কণ্ঠ আর্দ্র করিতে সাগ্রহে উছলিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে সে আর হাত দিয়া ঠেলিয়া দিতে পারিল না। তাহার দারিদ্র্য-ক্লেশোত্থিত গরল-রূপী গর্ব্ব দূরে সরাইয়া স্নেহার্থী বালিকা-হৃদয়খানি নীরবে বাহির হইয়া আসিয়া যেন সেই স্নেহময়ীর মাতৃ-অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিল; মৃদু স্বরে কোনমতে সে কহিল, "মা, আমি আপনার কাছেই যাব।" বলিতে বলিতে সহসা তাহার নত নেত্র হইতে ঝর্-ঝর্ করিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর আজ বড় অনুকূল মেঘ দেখা দিয়েছে।

অঞ্চলে কমলার চোখ মুছাইয়া দিয়া করুণাময়ী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কেঁদো না মা,—আমি তোমায় বুকে করে রাখবো।"

কমলা চকিত নেত্রে একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল,—একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত তাহার শিরা-উপশিরাগুলার মধ্য দিয়া চলন্ত শোণিত-স্রোতের সহিত সহসা তড়িৎ-বেগে বহিয়া গেল। কে বলে, দরিদ্রের প্রতি ভগবানের দয়া নাই? কি ভীষণ দারিদ্র্য হইতে করুণা-মণ্ডিতা মাতৃ-রূপে তিনি তাহাদের আজ রক্ষা করিতে আসিলেন! একটা সনির্ভর শীতল আশ্বাসে প্রাণ তাহার জুড়াইয়া গেল।

১৭

এখানে আসিয়া সকলেরই দিন ভাল কাটিতেছিল। তাহার মধ্যে মণীশের দিনগুলা সব চেয়ে সুখের। উপাখ্যানবর্ণিত কাল্পনিক

নরনারীগণের হর্ষ-বেদনা-বিজড়িত সুখ দুঃখ, আশা নিরাশার কুহরে আত্মনিমজ্জন না করিয়া সে অতীতে ও বর্ত্তমানে তুল্য বরণীয় মহাতীর্থধামের মহা মনীষিগণের প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্র-অনুশীলনে সচেষ্ট হইয়াছে। যেখানে যেটুকু ত্যাগের ইতিহাস খুঁজিয়া মিলিতেছে, সেটুকু অমনি নিজের ছোট খাতাখানিতে টুকিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া সেইটিকে সে বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছে। উমাকান্ত বলিয়াছেন, আমাদের দেশে এখন লোকের মনকে কর্ম্মের দিকে এবং ত্যাগের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। জগতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, কেবল মাত্র এই দুইটি উপায়ের দ্বারাই পাওয়া যায়;—দেশের জন্য কর্ম্ম এবং দেশের জন্য ত্যাগ।

মণীশ ক্ষত্রিয়-বীর চৈৎ সিংহ হইতে শুদ্ধাত্মা মহাযোগী ভাস্করানন্দ স্বামী, তাঁহার গুরু জীবন্মুক্ত পণ্ডিত অনন্তরাম মিশ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করিল।

উমাকান্ত একদিন তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মণীশ! তুমি এইবার সংসার-আশ্রম গ্রহণ কর, তোমার খুড়িমা বড় ব্যস্ত হয়েছেন।"

মণীশ এ কথায় কোন উত্তর দিল না বটে, কিন্তু কারাদণ্ডের আদেশ যেরূপ কঠোর শুনায়, এই শব্দটাও তাহার কানে সেইরূপ কঠোর ঠেকিল। তাহার মনের তারে যে সুর বাজিতেছে, এই সুরটার সঙ্গে তাহার যেন একেবারেই মিল নাই। সে বাহিরে আসিয়া নিজের বইগুলি লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, পরে তাহার মধ্য হইতে একখানি গ্রন্থ বাছিয়া ছাদের উপর চলিয়া

গেল! অস্তগামী সূর্য্য ম্লান হইয়া নিবিয়া গেল, রুক্ষ হাওয়া শীতল হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে অস্ফুট নক্ষত্রালোকে সমস্ত জগৎ ভরিয়া উঠিল। সে বই বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া ছাদের উপর বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া একটি যে তীব্র অস্বীকার জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সে নীরবেই নিজের অন্তস্তলে নিবদ্ধ রাখিয়া মনে মনে এই কথা স্বীকার করিল যে, 'আমার পক্ষে যেটুকু ভাল, তাহা আমার অপেক্ষা যাঁহারা অধিক বুঝিতে সক্ষম, তাঁহারা আমার জন্য যেমন নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন আমি তেমনই করিব।'

পরদিন পূজাহ্নিক সারিয়া সতার পড়া দেখা হইয়া গেলে নিজের খাতা পত্র লইয়া সে উমাকান্তর বসিবার ঘরে গিয়া দেখিল, শিবনারায়ণ এবং আরও দুই চারিটি ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। সে এক পাশে গিয়া বসিল। উমাকান্ত কহিতেছিলেন, "বেদকাণ্ড ত্রয়াত্মক। কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান, এই তিনের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য কর্ম্মকে আদিতে, মধ্যে উপাসনা ও পরে জ্ঞানের স্থান ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মের স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, 'কর্ম্ম' শব্দের সাধারণ পরিচিত রূপের সহিত ইহার এক পর্য্যায় হইতে পারে না। এই কর্ম্মকাণ্ড বা কর্ম্ম যোগই জ্ঞানমার্গে উত্থিত হইবার সোপান! সোপান ত্যাগ করিয়া যেমন উচ্চে আরোহণ সম্ভব নহে, কর্ম্মযোগ ব্যতীত তেমনি জ্ঞানযোগ প্রাপ্তি অসম্ভব! অতএব কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে যত্নবান হইতে হইবে।"

মণীশ স্থির চিত্তে কথাগুলি শুনিতে লাগিল। তাহার তরুণ জীবনে যে একটি মৃদু গম্ভীর হিল্লোল আসিয়া তাহার অস্ফুট চেতনাকে সর্ব্বদা হিল্লোলিত করিতেছিল, আজিকার এই বাণী কয়টিও তাহার মধ্যে একটি স্পন্দন না তুলিয়া অমনই মিলাইয়া গেল না। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, জ্ঞান, উপাসনা, কর্ম্ম,—এই ধ্বনি ওতঃপ্রোতভাবে গমকে গমকে যেন তাহার বক্ষ-শোণিতের তালে উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতে লাগিল।

সেদিন বাহিরের লোকেরা বিদায় লইলে উমাকান্ত কহিলেন, "এস মণীশ, আজ একবার দুর্গা দর্শন করে আসা যাক্। মাতৃ দর্শনের জন্য মন আজ শিশুর মতই উৎসুক হয়েছে।" মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই কমলার পিতামহীকে সঙ্গে করিয়া তাহার খুড়িমা গৃহে প্রবেশ করিলেন। উমাকান্ত প্রণতা নারী দুই জনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া করুণাময়ীর অশ্রুস্ফীত নেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতেই তিনি কহিলেন, "ইনি আমার সইমা।" এই বলিয়া বৃদ্ধার কাহিনী, তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন, সংক্ষেপে কহিয়া গেলেন। বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "বাবা, বড় কষ্ট পেয়েছি বাবা, এখন তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন মেয়েটিকে একটি ভাল পাত্তরের হাতে দিয়ে আমি শীগ্‌গির মরতে পারি। শিব আমি হব না, তা জানি। সাত জন্মের মহা-পাতকী আমি, রাস্তায় ঘাটে একটা নোড়ানুড়ি হয়ে পড়ে থাকি, সেও আমার ভাল! বল, যেন মনিষ্যি-জন্ম আর না পাই।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় নত হইয়া বৃদ্ধার মস্তক স্পর্শ করিয়া সুগভীর সহানুভূতির সহিত কহিলেন, "আহা, মা, বড় কষ্ট পেয়েছ! ভয়

কি মা? বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হও, দেহান্তে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করবে। হয়ত এই জন্মে জন্ম-জন্মান্তরের সমুদয় ভোগ কেটে গেল।"

এ সান্ত্বনার মত এত বড় সান্ত্বনা বুঝি জগতে আর দ্বিতীয় কিছু নাই। কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া কি যেন একটা গভীর ভাবাবেশে সংসার-তাপদগ্ধা বৃদ্ধার দুই জ্যোতিঃ-হীন চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পাগলের মত দুই হাতে পুনঃপুনঃ তাঁহার পদধূলি মাথায় লইতে লইতে তিনি ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন, "তাই বল বাবা, তাই বল।"

উমাকান্ত পুনশ্চ তাঁহার মাথায় পিঠে সান্ত্বনার হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "ভাল হবে মা! দয়াময়কে ডাক, তিনি তোমার সকল দুঃখ মোচন করবেন। একটী মেয়ে আছে না?"

"না বাবা, একটি নাতনি আছে। মণীশ, তুই একবার সরে যা ত। এস মা, তুমি এস।" করুণাময়ীর আহ্বানে দ্বারান্তরাল-বর্ত্তিনী কমলা আসিয়া প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পরে অপর দুইজনকে প্রণাম করিয়া নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। উমাকান্ত তাহার সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে করুণাময়ীর প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, "দুর্গা-প্রতিমা! মন্দির থেকে তুলে এনেছ না কি? আমি যে এখনই মাকে দেখতে যাচ্ছিলাম। এমন লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত মেয়ে ত দেখা যায় না।" গাঢ় রক্তবর্ণে কমলার যুগল গণ্ড রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

কমলাকে পাইয়া করুণাময়ীও বড় সুখী হইলেন। নিজের পেটের মেয়ে নাই, এত বয়সে এখনও বধূর মুখ দেখা ভাগ্যে

ঘটিল না, এই কুড়ানো মেয়েটি যেন তাঁহার দুহিতৃস্নেহের সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া লইল। নিজের হাতের বালা দুই গাছি তাহার সুগোল দুইখানি হাতে পরাইয়া একখানি ধোয়া কালাপাড় শাড়ি পরিতে দিয়া অতৃপ্ত নেত্রে সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তাঁহার মনের মধ্যে একটি অতর্কিত সাধ জাগরিত হইয়া উঠিল।

দ্বিপ্রহরে সেদিন বেড়াইতে বাহির না হইয়া কমলার পিতামহীকে লইয়া গৃহিণী তাঁহার দ্বিতল শয়নকক্ষে মেজের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া তাঁহার গল্প শুনিতে ছিলেন। বৃদ্ধা নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী সকরুণ বিলাপের মূর্চ্ছনায় যেন গাহিয়া চলিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে উভয়েই অঞ্চল প্রান্ত তুলিয়া নেত্র মার্জ্জনা করিতেছিলেন। কমলা নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া জাঁতি লইয়া সুপারি কাটিতেছিল। এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইতেই বৃদ্ধা তাঁহার অনর্গল বকুনি থামাইয়া কহিলেন, "বাবু আসবেন, বুঝি! মা, তুমি যাও, হয়ত তাঁর কিছু দরকার আছে। আমাদের নিয়ে যে সমস্তক্ষণই রইলে।"

জুতার শব্দ চিনিয়া গৃহকর্ত্রী কহিলেন, "না, ও সত্য।"

সত্য বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "মা, খাবার জল কুঁজোয় নেই,—কোথায় আছে?"

গৃহিণী কহিলেন, "কুঁজোয় বুঝি জল আজ রাখেনি? কলসী ভাঁড়ার ঘরে আছে। দাঁড়া, জল বার করে দিচ্চি। কমল, যাও ত মা, সতিকে এক গ্লাস জল দাও ত।" কমলার বয়সী মেয়ের পক্ষে পর ঘরকে এত শীঘ্র আপন করিয়া লওয়া তেমন সহজ নহে বলিয়াই

তাহার প্রতি আত্মীয়ভাব বেশী করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি এই আদেশটা করিলেন। কিন্তু কমলা তাঁহার আদেশ পালন করিতে আসিয়া একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। সতি বলিয়া যাহার পরিচয় প্রদান করিলেন, প্রথমতঃ তাহাকে বালক, কিশোর, অথবা তরুণ যুবক, ইহার কোন্ আখ্যাটা দেওয়া যাইবে, তাহাই সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি এমনি অকুণ্ঠিত আগ্রহে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল যে, সেই সমালোচক-দৃষ্টির দ্রষ্টব্য হইয়া এই লম্বা দালানটা পার হওয়া তাহার পক্ষে একরূপ অসাধ্য। বহুদিন হইতেই সে কারা-বাসিনীর মত তাহাদের ক্ষুদ্র কুটির-গহ্বরে নিজেকে রুদ্ধ রাখিয়াছিল, ছোটবেলা অবধি সে কলিকাতায় মানুষ। সেখানে পল্লীগ্রামের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে নিঃশঙ্ক নির্ভরতা বা মেলা-মেশা ছিল না। আশৈশব সেই অভিজ্ঞতার ফলেই সত্যর কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিতে কমলা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থাই একে স্বতঃ তাহার উপর লজ্জার একখানা কালো চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছে, বিশেষতঃ ঠাকুরমার ভয় ভাবনা তাহার নিজের প্রতি এমন একটা প্রবল ধিক্কার আনিয়া দিয়াছিল, মনটাকে এমন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছিল, যে এতটুকু সূর্য্যের তাপও যেন সে তাহার নিজের অঙ্গে সহিতে পারিত না।

কিন্তু যাহাকে দেখিয়া কমলা অতখানি লজ্জিত হইল, সে ব্যক্তি তাহার লজ্জা-বিজড়িতভাবে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করিল না। বরং প্রশংসমান দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ বিস্ময়ে সে বলিল, "তুমি কে? তোমায় ত কখনও দেখিনি!"

কমলা ঈষৎ বিরক্তির সহিত প্রশ্নকারীর দিকে চাহিল; কিন্তু কটিবেষ্টিত অসংযত বস্ত্র ও কুঞ্চিত কেশতলে সম্পূর্ণ সরল একখানি বালকের মুখ দেখিয়া তাহার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত শান্ত হইল। ঈষৎ নত নেত্রে সে কহিল, "আমি কমলা।"

বলিয়াই তাহার সম্মুখ দিয়া বারান্দা অতিক্রম করিয়া সে ভাণ্ডারে প্রবেশ করিল। এই কমলা নামটির দ্বারা যদিও আর কেহ কোন অপরিচিতকে চিনিতে পারিত না, তথাপি সত্যেন্দ্রর নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয়ের প্রয়োজনও ছিল না। পুনঃপ্রত্যাগতা কমলার নিকট হইতে জলের গ্লাসটা গ্রহণ করিয়া সরলভাবেই সে আপনার বিস্ময় প্রকাশ করিল, কহিল, "তুমি ত খুব সুন্দর! গৌরীর চেয়েও সুন্দর তুমি!"

বোধ হয়, এই বালকটীর চিত্তে তাহার গৌরী নামধারিণী সখীটি সৌন্দর্য্যের আদর্শ ছিল। এই সরল প্রশংসালাভে কমলা বিরক্ত হইবে কি হাসিবে স্থির করিতে না পারিয়া সরমে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

"সতু, এই তোমার শীগ্‌গির ফেরা? কার সঙ্গে গল্প হচ্ছে?"

এই কথা বলিয়া দালানের ঠিক শেষ প্রান্তের ঘর হইতে সত্যর দাদা উঠিয়া আসিল। সে ঘরটা তাহার। সেইখানে বসিয়া এতক্ষণ সে তাহার এই অনাবিষ্ট ভাইটীকে অঙ্ক কষাইতেছিল। সত্য তাহার নূতন বন্ধুটীর সাক্ষাতে ভর্ৎসিত হওয়ায় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইল, তাই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্র স্বরেই সে উত্তর দিল, "যাচ্চি—"

ইতিমধ্যে কমলা ও মণীশ পরস্পরে পরস্পরকে দেখিয়া চকিত মধ্যে সরিয়া গেল। মণীশ সত্যকে ঘরে আনিয়া নূতন অঙ্ক দিলে

সবেগে সে পেন্সিল লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। নিগূঢ় অভিমানে দাদার দিকে সে চাহিয়াও দেখিল না। যেখানে তাহার চিত্তাকর্ষণ করিবার মত কিছু আছে, সেইখান হইতেই দাদা তাহাকে টানিয়া আনিবে!

মণীশ তাহার রাগ বুঝিয়া ঈষৎ হাসিল। তাহার ঘর্ম্মসিক্ত চুলগুলা ললাটের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে মৃদু স্বরে ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ও মেয়েটা কে রে?"

ক্রুদ্ধ সতু দাদার স্পর্শ হইতে মাথা একটু সরাইয়া লইয়া খাতার উপর দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "ও কমলা।"

মণীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। জগতে যত কিছু মনশ্চাঞ্চল্যকর বস্তু আছে, রূপই তাহাদের মধ্যে প্রধান। দর্শনেন্দ্রিয়ই সেইজন্য সবচেয়ে বালাই। আবার সে যাহা কিছু দেখে, চুপ করিয়া সেইটুকুকেই সে ধ্যান করিতে পারে না, মন ও বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া তাহাকে ভাল করিয়া যতক্ষণ সে বিশেষ করিতে না পারে, ততক্ষণ যেন তাহার দেখার সুখ অপূর্ণই থাকে। এইরূপ সম্যক দর্শনের চেষ্টা না থাকিলে বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কারাদি চির-অনাবিষ্কৃতই রহিয়া যাইত।

জগতের যে এতখানি সৌন্দর্য্য এক কিশোরীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নেত্রপথে উপস্থিত হইতে পারে, এরূপ একটা সম্ভাবনাও কোন দিন তাহার মনের কোণেও স্থান পায় নাই। বিদ্যুতের মতই সে আপনার ক্ষণ-বিকাশের কৌতূহল তাহার স্থির চিত্তে ক্ষণিকের জন্যই জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিল। তাই সে আবার প্রশ্ন করিল, "কমলা কে?"

"আমি কি জানি ?" বলিয়া সত্য অঙ্কর খাতার উপর গভীর মনোযোগ প্রদান করিল।

১৮

জলের মধ্যে ভাসমান ব্যক্তি যতক্ষণ ঢেউয়ের সহিত যুঝিয়া চলে, ততক্ষণ প্রাণপণ বলে সে নিজের সমুদয় শক্তিকে জাগরিত রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যেই মাত্র তরঙ্গের আঘাত তাহাকে তটশায়ী করে, অমনি সেই তরঙ্গের মতই সে আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে তটমূলে নিঃশেষ করিয়া দিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়! করুণাময়ীর করুণ বাহুযুগলের আশ্রয়ে কমলাকে বাঁধিয়া দিয়া কমলার পিতামহী এমনই একটা দারুণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতে লাগিলেন।

এদেশের যত অবনতিই হউক, এ দেশীয় লোকের মনের ভিতর হইতে ধর্ম্মভাব এখনও একেবারে উবিয়া যায় নাই। এই দরিদ্র দেশে বুভুক্ষুদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু দাতার সংখ্যাও একেবারে কম নয়। তাই শুষ্ককণ্ঠ চাতক পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধমুখ পিপাসিতগণ কখনও বারিবিন্দু, কখনও জলধারা প্রাপ্তে আনন্দ কোলাহলে বর্ষার জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। কমলার পিতামহীও করুণাময়ীর করুণায় যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এই সময় শ্রীরামপুরের ঘোষাল পরিবারের একটি মেয়ের সহিত মণীশের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। মেয়েটি না কি দেখিতে ভাল এবং কন্যার পিতাও খুব ধনবান। মেয়ে দেখার জন্য সর্ব্বদা তাগিদ আসিতেছে, টাকাকড়ির ফর্দ্দ দিবারও অনুরোধ আসিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া পাত্রী দেখিবেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে

তিনি অর্থ বিনিময়ে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহেন, এই কথাই শিবনারায়ণ পাত্রীপক্ষকে জানাইয়া আপাততঃ তাঁহাদের নিরস্ত রাখিয়াছিলেন।

খুড়িমা অনেকদিন হইতেই মণীশের বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন, কেবল স্বামীর অনিচ্ছার জন্যই সে সাধ মিটাইতে পারেন নাই। তাঁহার ঘরে কন্যা ছিল না, কোনপ্রকার কুটুম-কুটুম্বিতার সাধও তিনি মিটাইতে পারেন নাই। পাড়ার লোকের বধূ আসিলে সন্দেশ-মোণ্ডা তাঁহার গৃহে উপঢৌকন আসিত, গ্রহণ করিবার সময় একটা সম্ভাবনার কথাও তাঁহার মনে উদয় হইত। তিনি যে কতদিনে বউ ঘরে তুলিয়া লোককে মিষ্ট মুখ করাইবেন, সেই ইচ্ছায় তিনি আকুল হইয়া উঠিতেন। সেজন্য তাঁহার মনে মনে বড়ই সাধ ছিল, ধনী-গৃহের কন্যা আনিয়া তত্ত্ব-তাবাস সাধ-আহ্লাদ করিয়া তিনি এইবার মনের ক্ষোভ মিটাইবেন! কিন্তু যেদিন হইতে কমলা তাঁহার গৃহে আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাঁহার মনের ভিতর একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিতেছিল। বিপরীত যুক্তি মনকে কেবলই বলিতেছিল, বড় লোকের মেয়ে হয়ত 'দেমাকে' হইবে, না হয় ত বাপ সর্ব্বদা পাঠাইতে চাহিবে না! তাহার চেয়ে যদি এই এমন একটি বধূ তাঁহার ঘরে আসে, তবে কখনও তাহাকে আর কাছছাড়া করিতে হয় না। কারণ কমলা মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দর! এমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্য-শ্রীটুকু বড় সহসা চোখে পড়ে না! শুধু রূপ নয়, গুণের অংশও তাহাতে যথেষ্ট। কিন্তু কথাটা তাঁহার উত্থাপন করিবার প্রয়োজন হইল না, স্বয়ং প্রজাপতিই একদিন

ঘটকের বেশ ধরিয়া আবির্ভূত হইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজেই শিবনারায়ণের নিকট এ সম্বন্ধের কথা তুলিলেন।

এদিকে দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাতাস যেন অগ্নিশিখার ন্যায় লহরে লহরে অনল উদ্গার করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে ছুটিতেছিল। পথের তপ্ত ধূলি অসহায় পথিকের গায়ে অবিরল ধারে শরের মতই বর্ষিত হইতেছিল। কাশীর রাজপথে আর আজকাল মধ্যাহ্নে বাহির হইবার উপায় নাই। করুণাময়ী নিজের শয়নকক্ষে মেজের উপর পাটি পাতিয়া শয়ন করিয়া গ্রীষ্মাতিশয্যে মধ্যে মধ্যে নিজের অঙ্গে হাতপাখার বাতাস দিতেছেন, এমন সময় তাঁহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া মনীশ ডাকিল, "খুড়িমা, জেগে আছ?"

"হ্যাঁ। তুমি এস বাবা, কেউ নেই" বলিয়া খুড়িমা গায়ে কাপড় টানিয়া দিলেন। মনীশ আসিয়া পাখাখানা তুলিয়া লইয়া বিছানার এক প্রান্তে বসিয়া কহিল, "তুমি শোও না খুড়িমা, আমি তোমায় একটু বাতাস দিই,—ভারী গরম পড়েচে।"

খুড়িমা দেখিলেন, সে কিছু বলিতে আসিয়াছে, কিন্তু মুখে লজ্জার আভাষ! তাই সস্নেহে কহিলেন, "কি বল্‌বি?"

"আমি যেন তোমায় কিছু বলতেই আসি!' মনীশের কর্ণমুল লাল হইয়া উঠিল। খুড়িমা মনে মনে একটু হাসিলেন, কহিলেন, "বেশ ত, তুই না হয় কিছু বলতে আসিস্‌নে, আমিই তোকে একটা কথা বলব, ভাবচি।"

"কি?"

"কমলার ঠাকুমার অসুখ খুব শক্ত ; বাঁচবার কোন আশা দেখ্‌চিনে—"

মণীশের মুখ একটু ম্লান হইয়া আসিল। সে মৃদু স্বরে কহিল, "শুনেচি।"

খুড়িমা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, "মেয়েটি এখন আমাদেরই উপর পড়ল। বড় মেয়ে, বেশী দিন ত আর রাখা যায় না, তুমি ওর জন্য একটি পাত্র সন্ধান করে দাও, এর পর হিন্দুর ঘরে বিয়ে হওয়াই দায় হবে।"

মণীশ একটু হাসিয়া কহিল, "এখনই দায় হয়েছে ? সেই কথাই বলিতে এসেছি। আমার এক আইবুড় বন্ধুর কথা মনে হওয়ায় ক'দিন পূর্ব্বে আমি তাকে সব কথা লিখেছিলাম, তাতে"—মণীশ একটু ইতস্ততঃ করিল পরে আবার কহিল "সে লিখচে, পনেরো বছরের মেয়ে বিয়ে করে সমাজে সে ঠ্যালা হতে পারবে না।"

করুণাময়ী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন, "তা আমি জানি। সহজে কেউ অত বড় মেয়ে ঘরে নিতে চাইবে না।"

মণীশ উঠিয়া গেল। কমলারা এদিকে থাকে বলিয়া সাধ্যমত সে অন্তঃপুরের সীমানায় পা দেয় না। কিন্তু সে যে এই অনাথা মেয়েটির জন্য কিছু করিতে পারিল না, তাহাতে সে দুঃখিত হইল।

সেইদিনই উমাকান্ত মণীশকে ডাকিয়া অনেকগুলি উপদেশ দান করিলেন, কহিলেন, "একদিন তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলে, আজ আমি তোমায় সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। চিরকুমার ব্রত বড় কঠিন ব্রত, বোধ হয় সংসারে এর চেয়ে অন্য কোন কঠিন ব্রত আর নেই। আমার বিবেচনার চির-কৌমার ব্রত

পালন করবার যোগ্য নয় বা নারী পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কম পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করেছেন। ব্রত গ্রহণ করে কায়মনে তা যদি না পালন করা হয়, তবে ব্রতাবলম্বীর পাপের সীমা থাকে না। তুমি যদি নিজেকে এই ব্রতগ্রহণের যথার্থ যোগ্য পাত্র বলে বুঝে থাক, তবে কিছুদিন ধরে নিজের মনের উপরে বিবিধপ্রকার পরীক্ষায় সেই বিশ্বাসকে যাচাই কর। কেন না, মানুষ সকল সময় নিজেকে ঠিক না বুঝেই নিজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্থির করে বসে, সেরূপ ভ্রম বাঞ্ছনীয় নয়। যদি আমার মত জান্‌তে চাও, তবে আমার বোধ হয় বিবাহই তোমার পক্ষে ভাল। তোমায় আমি দুর্ব্বল-চিত্ত বলছি, এমন মনে করো না। কিন্তু যেমন মূর্ত্তি-উপাসনা দ্বারা সাধক উচ্চ অধিকারেই প্রবেশ করবার বল সংগ্রহ করে, তেমনই গৃহধর্ম্ম পালন দ্বারা সাধারণতঃ মানব-চিত্ত ধর্ম্ম সাধনেরই উপযোগী হয়ে ওঠে। কৌমার ধর্ম্ম সাধারণের জন্য নয়, এ ব্রত বিশেষ ব্যক্তির জন্য।”

মণীশ মুখ নত করিয়া রহিল। উমাকান্ত কহিতে লাগিলেন, “বিবাহ-সংস্কার মানব-জীবনের পক্ষে সামান্য নয়। বিবাহ করা না করা মানুষের ঠিক নিজের হাত নয়। ব্রহ্ম নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করে ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সেই জন্যই জগতের প্রতি অণু পরমাণুটি পর্য্যন্ত মিলনাত্মক। তাপসংযোগে বিযুক্ত অণু সকল তাপমুক্ত হবামাত্রই তাদের স্বজাতীয় অণুর সঙ্গে সংমিলিত হবার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। প্রকৃতি এক ভিন্ন দুই না থাকাতে এক হতেই দুই অংশে বিভক্ত। একই নিজ অঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনর্ব্বার একাত্ম

হবার জন্য সেই বিয়োগ-কাল হতেই ব্যাকুল থাকে। যতদিন না সেই মিলন সাধিত হয়, এক মানবাত্মার জন্য অপর মানবাত্মার আকুলতার সমাপ্তি ঘটে না।”

মণীশ চুপ করিয়া রহিল। তাহার অধ্যাপক তাহাকে আজ যেন নূতন লোকের এক অভিনব সমাচার প্রদান করিলেন। তাঁহার কথাগুলি তাহার বিস্মৃত যৌবনের উপবনে বসন্ত পবনের হিল্লোল বহাইয়া তুলিল, ব্রহ্মচারীর গৈরিক বসনের উপর স্বর্ণসূত্রে খচিত একখানি নীল উত্তরীয়ের প্রান্ত সেই মিঠা বাতাসে ঈষৎমাত্র কম্পিত হইয়া উঠিল। নত নেত্রে জগতের এই আদিরসের কথা সে ভাবিতে লাগিল। একটি মানবাত্মা অপর একটি মানবাত্মার জন্য গোপনে পীড়িত হইতেছে! জন্মের পর জন্ম ধরিয়া একটি ব্যথাভরা চিত্ত নিঃশব্দে নিজেরও অজ্ঞাতে অপর একটি বেদনা-কাতর চিত্তের অনুসরণ করিয়া ঋতধ্বজ বা পুণ্ডরীকের ন্যায় ফিরিতেছে। ভাবটুকু বড় সুন্দর মনে হইল।

অপরাহ্ণে সে দিন একখানি ইংরাজি ঐতিহাসিক উপন্যাস খুলিয়া সে নিজের ঘরের জানালার সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিল। মনের ভিতর যৌবননিকুঞ্জ-মধ্যবর্ত্তী যে কলকণ্ঠ অচেনা পাখীটা কূজন চেষ্টা করিতেছিল, তাহারই প্ররোচনায় সে এই বইখানি খুলিয়াছিল, কিন্তু সংস্কার বা অভ্যাস, এতদিন তাহার মনকে যতখানি সম্ভব, গম্ভীর ভাবেরই কলা-উপাদান যোগান দিয়া আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতরে কখন কি ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কে-ই বা জানে! কিন্তু সকলের ধরণ ধারণ হইতে কোন একটি

বিশেষ ঘটনার আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। খুড়িমা যেন প্রতি দিনকার চেয়ে হাসিমুখ! শিবনারায়ণ কথাচ্ছলে দয়া-ধর্ম্মসম্বন্ধে কথা বলিলেন, শক্তি থাকিতে দয়ার পাত্রকে দুঃখে ফেলিয়া রাখিতে নাই, অধর্ম্ম স্পর্শ করে—ইত্যাদি। এ সকল উপদেশের মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত ছিল না? মণীশের মনে মুহূর্ত্তের জন্য একটা সন্দেহের ভার চাপিল। তাঁহারা তাহার নিকট আজ কি চাহিতেছেন! স্পষ্ট করিয়া কেন বলেন না? কিন্তু সে বিশ্বাস করিবার মানুষ, সন্দেহ করা তাহার স্বভাব নয়! একটু পরেই সে মনকে বুঝাইল, বলিবার কিছু থাকিলে ঘুরাইয়াই বা বলিবেন, কেন? আদেশই ত করিতে পারিতেন!

মণীশ উপন্যাস খুব কম পড়িয়াছে, তাই ইহার মধ্যে একটা নূতন স্বাদ পাইতেছিল। মনটা খুব নিবিষ্ট। কল্পিত নরনারীর দুঃখে বেদনায় বুক ভরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতেছিল। তাহাদের কচিৎ সুখের সূচনা তাহার সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তকে স্পর্শ করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে আনন্দের হাস্য ও ঈষৎ চকিত করিয়া তুলিতেছিল। উপন্যাস জগতের ঘটনাপূর্ণ জটিল চক্রের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে পাঠকের চিত্ত বাস্তব জগতের একঘেয়ে গণ্ডী হইতে চরণ ছাড়াইয়া কল্পনা রাজ্যে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

বাহিরের দালানে দাঁড়াইয়া সত্যকে ডাকিয়া কমলা কহিল, "তোমার চিঠি আমাকে দেখালে না?"

পকেট জামার সম্বন্ধ বহুদিন পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাই প্রদর্শনের বস্তুটাকে কোঁচার খুটে বাঁধিতে হইয়াছিল। ইহা দেখাইবার জন্যই এতক্ষণ সে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল।

কারণ এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটার বিশাল ডাক বন্দোবস্তের ভিতর এই একখানি মাত্র পত্র সে তাহার এতদিনকার পরিচিত জগতের মধ্য হইতে আজ প্রথম লাভ করিয়াছে। বিনা আড়ম্বরে পত্রখানি সে কমলার হস্তে প্রদান করিল। পত্রখানি গৌরীর ; লেখার সৌন্দর্য্যে ও রচনা গৌরবে প্রায় অপাঠ্য। মোটামুটি কথাটা ছিল এই যে, তাহার মেনির তুইটি বাচ্ছা হইয়াছে, একটি কালোয়-শাদায় ছাপওয়ালা, এবং অপরটির রং শাদা। তাহারা কবে আসিবে ? সে যেন শীঘ্র ফিরিয়া যায়, নহিলে গৌরী বড় রাগ করিবে, কাঁদিবে, তাহার সঙ্গে আড়ি করিবে ; আর তাহার দাতুমণিকে যেন ফিরাইয়া লইয়া যায়, নহিলে ভারী ঝগড়া হইবে ইত্যাদি।

কমলার সহিত এই কয় মাসেই সত্যর একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। সে এই শাসকমণ্ডলী-পরিবৃত বন্ধুহীন দেশে এমন স্নিগ্ধ লাবণ্য-জ্যোতি-ভরা সমবয়সীটিকে পাইয়া যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছিল। মেয়েটির মধ্যে একটা সুদূর-ব্যবধান কারী মৌন গাম্ভীর্য্যের ভাব থাকিলেও আকর্ষণী একটি মধুরতারও অভাব ছিল না। তাহার তুই চোখের দৃষ্টি হইতে যেন মৌন বিষণ্ণতা ঝরিয়া পড়িত, মুখে অপরাধ ক্ষম সকরুণ হাসিরও তেমনই প্রাচুর্য্য ছিল।

পত্র পড়িয়া কমলা হাসিয়া কহিল, "গৌরীকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করচে, সে যেন তোমার কনের মত চিঠি লিখেচে।"

কাহারও 'কনে' কাহাকেও চিঠি লেখে কি না এবং সে চিঠি

কি ছাঁদে লিখিত হয়, সত্যর তাহা সবিশেষ জানা ছিল না। সে 'কনের' অর্থ আর একটু বড় করিয়া ধরিল; ভ্রূশুদ্ধ দুই চোক টানিয়া কহিল, "তুমি বুঝি দাদাকে অমনি চিঠি লেখ? তুমি ত দাদার কনে!"

"আঃ সত্য, ছি—" কমলা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

সত্য তাহার লজ্জায় অধিকতর আনন্দিত হইয়া কহিল, "মা বলেছেন, তুমি দাদার বউ হবে। আমি আজ থেকে তোমায় বৌদিদি বলে ডাকব। দেখো, সত্যি, কি না।"

কমলা লজ্জারক্ত মুখে পাশের দ্বারটা ঠেলিয়া আততায়ীর দৃষ্টি হইতে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে দ্রুত নম্র পদে ভিতরে চলিয়া গেল।

তখন আকাশে বর্ণের পর বর্ণ ফুটিয়া উঠিয়া চঞ্চলগতি নর্ত্তকীর লীলা-চঞ্চল বিচিত্র অঞ্চলের সঙ্কুচন প্রসারণের মত শ্বেত, লোহিত নীল, পীত, একটার পর আর একটা স্তরে স্তরে গাঢ় নীলের উপর সঞ্চালিত হইতেছিল। কোথাও সুদূর উন্নত বৃক্ষশীর্ষ সূর্য্যাস্তের লাল আভায় আগুন লাগার মত জ্বলিতেছিল, কোথাও মরকতমণিপ্রভ রক্ত-পাটলে ও বৈদূর্য্য মণিপ্রভ নীলাগ্নিজাল দেখিতে দেখিতে বিশুদ্ধ নীলায় পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। অলক্ষ্যে মানব-জীবনেও এমনি বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল কি না, তাহার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল না। শুধু দিনান্ত কালের বিস্ময় সঞ্চারিণী প্রকৃতি দুই হস্তে গোধূলির রাঙ্গা বাতি জ্বালাইয়া সেই বাতায়ন তলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছিল। কমলা সত্যের প্রদত্ত লজ্জা এবং অতর্কিত সংবাদে সুগভীর বিস্ময়ের

হাত এড়াইবার জন্য আচমকা যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, সে গৃহ মণীশের। দ্বারের শিকল নড়িতেই মণীশ বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল, তাহার নির্জ্জন ঘরের মধ্যে কাব্যের সেই অপূর্ব্ব প্রতিমা, লজ্জাশ্রীমণ্ডিতা বালিকার বেশে দাঁড়াইয়া! সত্যেন্দ্রর শেষ কথাটা ইতিপূর্ব্বেই সে শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার অজ্ঞাতে অকস্মাৎ তাহার দুই চোখের দৃষ্টি কোন্ সময় প্রীতি-কোমল হইয়া আসিল, তাহা সে জানিতও পারিল না! এই মহিমময়ী বালিকা-মূর্ত্তির আকস্মিক আবির্ভাব যেন কুমারী উষার প্রথম উদয়ের মতই তাহার জীবনে আনন্দ-প্রভাতের সূচনা করিয়া দিল! সে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করিল।

কমলা প্রথমে অপর ব্যক্তির অবস্থিতি জানিতে পারে নাই; তার পর যখন সে সঙ্কোচ-জড়িত মণীশকে তাহার দৃষ্টির সম্মুখীন দেখিতে পাইল, তখন লজ্জায় সে মরিয়া যাইতে চাহিল। কি নির্লজ্জা তাহাকে তিনি মনে করিলেন! সে কম্পিত দেহে চকিতে ফিরিতে গিয়া দ্বারে হোঁচট্ লাগিয়া পতনোন্মুখ হইয়া কোনমতে নিজেকে সামালাইয়া লইল!

মণীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে আকণ্ঠ ললাট রঞ্জিত করিয়া সে পলাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল। মণীশ দুই পা অগ্রসর হইয়া কহিল, "আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন? আমিই যাচ্চি—"

এই বলিয়া সে চাহিয়া দেখিল, নারীমূর্ত্তি কখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কোন জ্ঞানী দার্শনিক সেখানে উপস্থিত থাকিলে হয় ত বলিতেন, ইহা মায়ার বিকার মাত্র, ছলনাময়ী নারী-মূর্ত্তিতে

কিশোর কুমারের তপোবিঘ্ন সাধন করিতে অকস্মাৎ সমুদ্ভূতা হইয়াছিল। কিন্তু মণীশ এই আবির্ভাবকে আজ নিতান্ত অবহেলার চক্ষে দেখিতে পারিল না। উমাকান্তের আজিকারই একটি কথা তাহার মনে পড়িল। সুন্দর আমাদের অন্তরের জিনিষ, তাই সৌন্দর্য্যই আমাদের চিত্তকে সব-চেয়ে আকর্ষণ করে ও আনন্দ দেয়। যে অন্ধ এই অসীম আকাশের উদার মহিমা, সমুদ্রের বিশাল সৌন্দর্য্য অথবা সতী রমণীর সপ্রেম মুখের আনন্দ-বিকাশ, নেত্র দ্বারা দর্শন করিয়া ইহার মধ্যে ভগবানের স্থিতি-গৌরব অনুভব করিতে পারে নাই, সে হতভাগ্য বৃথাই এই বিরাট বিশ্ব সাম্রাজ্যের প্রজা হইয়াছিল! তাহার সকল পূজাই ব্যর্থ!

উপন্যাস-স্বপ্ন বিভোর বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত করিয়া দ্বারের নিকট গিয়া মণীশ একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর ফিরিয়া নিজের পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। চোখ দুইটা ঈষৎ নিমীলিত হইয়া আসিল, বুকের ভিতরটা একটু আলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল। কেদারার পৃষ্ঠে হেলিয়া পড়িয়া পরস্পর-নিবদ্ধ কর-যুগলের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল। মৃদু একটা নিশ্বাসের সহিত মনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ধ্বনি এক অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর মত বেহাগে ললিতে শ্রুতিমধুর সুরে ছন্দে বাজিয়া উঠিল, "কমলা!" তাহার সমস্ত চিত্ত সহসা যেন নব-বসন্তাগমে তরুণ পত্ররাজি-সম্পদ-লাভে প্রফুল্ল উপবনের মতই পুষ্প সুবাসে ও পাখীর গানে ভরিয়া উঠিল।

১৯

এক এক জন মানুষ এমন একটি অখণ্ডনীয় মন্দ ভাগ্য লইয়া

দেখা দেয় যে মানুষ শত চেষ্টা করিলেও তাহার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগাইতে সক্ষম হয় না, এবং না হইয়া নিরুপায় চিত্তে শেষে দৈবকে অভিশপ্ত করিয়াই খেদ মিটাইতে বাধ্য হয়। কমলার পিতামহীর অনুরোধে এবং নিজের ইচ্ছাতেও উমাকান্ত শিবনারায়ণকে ডাকিয়া যেদিন কমলাকে মণীশের বধূরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া দিলেন, সেদিনের আনন্দের পর কমলার ঠাকুরমা আর আপনার বাঁচিয়া থাকার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করিলেন না। কমলা ঔষধ সেবন করাইতে গেলে তাহার হাতখানি ধরিয়া তিনি কহিলেন, "আর কেন দিদি, এবার আমায় যেতে দে। আর ত কোন দুঃখ মনে রইল না, আমার। তবে এই বড় দুঃখ যে সোণার চাঁদকে আমার এই অন্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে একবারে জন্মের মত সাধ মিটিয়ে ভাল করে দেখতে পেলুম না।"

রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কবিরাজ আনাইবার প্রয়োজন হইল না। উমাকান্ত নিজেই কবিরাজী চিকিৎসায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তথাপি শেষের দিকে তাঁহারই আদেশে অপর একজন বিচক্ষণ বৃদ্ধ কবিরাজ আনাইয়া বটিকা পাঁচন সেবন করানো হইতে লাগিল। সস্ত্রীক শিবনারায়ণ রাত জাগিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। যত্নের কোন ত্রুটি হইল না।

সেদিন অষ্টমী তিথি এবং তাহার সহিত কোন্ একটা গুপ্ত গ্রহের যোগ হওয়ায় দেবদেবীর মন্দিরে বিশেষ একটা সমারোহ হইবে। তাই ভোরের আলো জাগিতে না জাগিতেই গ্রামের পথ দিয়া অপর্য্যাপ্ত মল্লিকা যুথির আমদানী হইতেছিল। মন্দিরে নহবতের করুণ সুরে সকাল বেলাকার নবীন রৌদ্র যেন একটা

সতর্কতার প্রশান্ত ভক্তি ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। করুণাময়ী স্নানের পর বিশ্বনাথ দেখিয়া আজ একবার দুর্গা দর্শন করিয়া আসিবেন, এই সংকল্প লইয়া বাহির হইয়াছেন। কেন না, আজিকার এই পুণ্য তিথিতে দেবীর ললাটে সিন্দুর প্রদান করিলে নিজের কপালের সিন্দূর অক্ষয় হয় এম্‌নি একটা কথা পাঁচজনের মুখে স্নানের ঘাটে শুনা গিয়াছে। কমলাকে রোগীর ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়াই তিনি বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধাও সেদিন অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। কমলা ধীরে ধীরে ঠাকুরমার বিছানার পাশে ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল।

বৃদ্ধা তাহার স্পর্শে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিজের শীর্ণ হাত উঠাইয়া তাহার সুকোমল হাতখানি ধরিয়া তাহাকে নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিলেন। মুমূর্ষুর এই আকস্মিক আদরে কমলার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা কমলা জগতের মধ্যে একমাত্র স্নেহময়ী দুঃখিনী ঠাকুরমাকেই জানে। শুষ্ক বংশদণ্ড যেমন করিয়া নিজের বক্ষের উপর ক্ষুদ্র মাধবীলতাটিকে ধারণ করিয়া রাখে, ঠাকুরমাও তাহাকে এতদিন অসীম দুঃখের মধ্যে তেমনি করিয়া বুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সে আশ্রয় আজ মৃত্যুর কঠোর হস্ত ছিন্ন করিতে আসিয়াছে। বৃথা আশ্বাসে এতদিন ধরিয়া নিজের মনকে সে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল—আর যেন সে আর পারে না! আশার স্থলে নিদারুণ হতাশা ক্রমেই জাগিয়া উঠিতেছে।

রোগীর রোগ-যন্ত্রণা কিছু কম থাকিলেও তাঁহার চোখ-মুখের অবস্থা ভাল দেখাইতেছিল না। সেই মুখের দিকে চাহিয়া কমলা নিজের অন্তরের বিষম ব্যাকুলতা কোন মতে চাপিয়া রাখিল।

জানালাগুলা খোলা আছে। আকাশের বিশাল ললাটে সোণার টীপের মত উজ্জ্বল সূর্য্য দেখা দিয়াছে। গৃহমধ্যেও, প্রভাতের রক্তাভ আলোক সোণালি চাদরের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার ওধারে বৃহৎ একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ফুলের গন্ধ সকালের বাতাসের সঙ্গে হাসাহাসি মাতামাতি করিয়া ফিরিতেছে। পাখীর গানে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। কমলা উঠিয়া সজল চক্ষে জানালার বাহিরে উদার আকাশের দিকে শূন্য মনে চাহিয়া রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। কে জানে, কতক্ষণই বা জগতের এই একমাত্র আত্মীয়ের গভীর-স্নেহে-ভরা স্তিমিতপ্রায় দুইটি নেত্র সে আর দেখিতে পাইবে! হায়, এ জগতে ঠাকুরমা ভিন্ন তাহার যে আর কেহ নাই!

সারা প্রকৃতি তখন জাগিয়া উঠিতেছিল। বাহিরের বাতাস কাহার স্নিগ্ধ-কোমল নিশ্বাসের মতই ধীরে ধীরে বহিয়া গেল। আকাশের রক্ত তুলিকা-পাতে সোণার জলের ছাপ গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। ঠাকুরমা ডাকিলেন, "কমল!" কমলা ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। বহু চেষ্টাতেও সে চোখ তুলিতে পারিল না! ঠাকুরমা কহিলেন, "দিদি, তুমি অত কাতর হয়ো না। দুঃখ কি? মানুষ ত মরবার জন্যই জন্মে থাকে! তোমায় যে আশ্রয়ে রেখে গেলুম, সেইখানে

তোমার স্থান ধ্রুবতারার মত অচল করে নিয়ে সুখে থেকো। আর তোমায় কি বলবো, বলবার কিছু নেইও।"

কমলার আর সহিল না। সহসা সে দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। "ঠাকুমা অমন কথা তুমি বলো না, আমার কেউ নেই!"

বলিতে বলিতে তাহার চারিধারের আলোক-রেখার উপর কে যেন একটা সূক্ষ্ম কালো পর্দ্দা বিছাইয়া দিল। সে দেখিল, সারা জগৎ যেন অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে,—সেই অন্ধকারে এত বড় একটা জগতের বক্ষে সে একেবারে একা! ভয়ে মুহূর্ত্তে তাহাকে যেন বজ্র-স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল, সে আর কাঁদিতেও পারিল না। বৃদ্ধার চোখেও আবার দুই বিন্দু জল দেখা দিল। স্বর ঈষৎ জড়াইয়া আসিয়াছিল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "দিদি, কেঁদ না। তোমার ভাবনা কি? যার হাতে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, তুমি ত রাজরাণী—এই আশীর্ব্বাদ করি—"

বলিতে বলিতে সহসা কথা থামিয়া গেল। কমলা চাহিয়া দেখিল, কষ্টের চিহ্নটা মুখের উপর বৈশাখী মেঘের মত অত্যন্ত দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। তড়িতাহতের মত যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের উপর হইতে অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার সে ভয়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুমা।"

"দিদি,—কমল?"

কমলার সর্ব্বশরীরের রক্ত এক মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দারুণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া [illegible]কিয়া বহুক্ষণ পরে ঈষৎ সংজ্ঞা পাইবার পর রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ব্যাকুল হইয়া সে ডাকিল, "মা!" সাড়া পাইল

না। আবার ডাকিল, "সত্য!" কেহ সাড়া দিল না, সম্মুখস্থিত বিশীর্ণ বিবর্ণ মুখ মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, নিশ্বাসের জন্য রোগী যেন জলমগ্নের মতই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। কমলার শক্তি-হীন কণ্ঠ আবার একবার কোন মতে উচ্চারণ করিল, "ঠাকুমা!"

রোগী উত্তর দিল না, উত্তর দিবার শক্তিও আর ছিল না। কমলা কাঁদিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল, শয্যার নিকট অগ্রসর হইয়া ঈষৎ বিজড়িতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

স্বর চিনিয়া কমলা মুখ তুলিতেই মণীশের আগ্রহ ব্যাকুল দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিয়া গেল। সেই যৌবনশ্রীসম্পন্ন তরুণ পুরুষের সান্নিধ্য আজ আর তাহার চেতনাকে সঙ্কুচিত মাত্র করিতে পারিল না, এতই সে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আর্ত্ত কণ্ঠে সে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "দেখুন—দেখুন ঠাকুমা কি রকম কচ্চেন! কি হবে।"

মণীশ তৎক্ষণাৎ জড়িতভাব ত্যাগ করিল। কমলার পাশে আসিয়া নত হইয়া রোগিণীর ললাট ও নাড়ি স্পর্শ করিয়া মাথা তুলিয়া কহিল "ভয় কি? নাড়ি আছে আমি সার্ব্বভৌম মশায়কে ডেকে আনচি। তুমি অত অস্থির হয়ো না।"

মণীশ দ্রুত পদে চলিয়া গেল এবং ক্ষণমাত্র পরে উমাকান্ত ও শিবনারায়ণ দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় হস্তের নাড়ি পরীক্ষা করিয়া শিবনারায়ণের দিকে চাহিলেন। শিবনারায়ণ ও মণীশ ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ লোক-সংগ্রহের জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন।

উমাকান্ত মাথার নিকটে বসিয়া তাঁহার পিপাসা-শুষ্ক ওষ্ঠে গঙ্গাজল প্রদান করিতে লাগিলেন। কমলা নিঃশব্দে ঠাকুরমার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। ভাষাহীন শব্দহীন নীরব হাহাকারে হৃদয় তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

নবীন সূর্য্য সহস্র তুলিকাপাতে জলে স্থলে আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘের অঙ্গে শত বর্ণ চিত্রিত করিয়া দিয়াছিল। অদূরে নগর-সংকীর্ত্তন খোল করতালের সঙ্গে বিমান পূর্ণ করিয়া হরিনাম গাহিয়া চলিয়াছিল! কর্ম্মপূর্ণ ধরণীর কোলাহল-নিশ্বাস স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে জুড়াইয়া যাইতেছিল। ক্রমে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকের উপর দিবসের প্রখর কিরণ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল—সূর্য্য দিগন্তের অনেকখানি উপরে উঠিয়া আসিল।

কমলার পিতামহী তাঁহার শীতল অবশ হস্তে নাতিনীর উত্তপ্ত কম্পিত হস্ত দুইখানি প্রাণপণে তখনও ধরিয়া রাখিয়াছিলেন — শক্তি নাই, তবু যেন ছাড়িবার ইচ্ছা করে না। অস্ফুট স্বরে কমলার পিতামহী কহিলেন, "মা গঙ্গা বাবা বিশ্বনাথ সাক্ষী পণ্ডিত সাক্ষী রইলে,— আমার কমলাকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। দাদা, একবার মুখ ফুটে বল, তুমি ওকে গ্রহণ করেচ"

উমাকান্ত মণীশের আনত মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন, মণীশ মৃদু অথচ পরিষ্কার স্বরে উচ্চারণ করিল, "গ্রহণ করলেম।"

২০

গভীর রজনীর প্রশান্ত বিশ্রাম সুখে আঘাত দিয়া শ্মশানবাসীগণ সমকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "বল হরি,—হরি বোল!"

সুমধুর হরিনাম! এই হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়! কিন্তু সময়-বিশেষে আবার এই আকস্মিক উচ্চারিত শব্দটা কি যেন এক প্রকার শিহরণও আনিয়া দেয়, প্রাণ চমকিয়া উঠে!

মুর্চ্ছিতপ্রায় কমলা এই শব্দে যেন হৃত সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল। স্বপ্নাভিভূতের মত তখন সে চারিদিকে চাহিয়া পুনরায় সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিল। বালিকার পক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য!

নৈশ আকাশের তলে চিতাবহ্নি সহস্র রক্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া উর্দ্ধমুখে গর্জ্জন করিতেছে। অর্দ্ধ জাহ্নবী-বক্ষ সেই তীব্র অনল-দীপ্তিতে আলোকিত। কমলা একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার সাতঙ্কে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। কেমন করিয়াই বা সে না চাহিয়া থাকে? ঐ অগ্নিরাশি যে আজ তাহার এ পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু সম্বল সকলই ভস্ম করিয়া জ্বলিতেছে—এতদিনে যে সে যথার্থ অনাথা হইল! দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে সে কাঁদিয়া উঠিল, "আমার কি হবে ঠাকুমা? আমায় কোথায় রেখে গেলে!"

কিন্তু মানুষের জীবনে একটানা স্রোতে কেবলই দুঃখের প্রবাহ বহে না। এ জগতে সর্ব্বপ্রকার সুখের ছায়া-স্বরূপ যেমন কিছু না কিছু দুঃখ বিদ্যমান, জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়া-স্বরূপে মৃত্যু যেমন নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তেমনি সেই মৃত্যুর ভিন্ন তালে সুখও জীবনের স্মৃতিরূপে চিরপ্রত্যক্ষ। উহারা সর্ব্বদাই একসঙ্গে থাকে; উহাদের বাস্তবিক ভিন্ন সত্তা নাই, একই বস্তুর বিভিন্ন দুইটি রূপ,—সেই এক বস্তুই জীবন, মৃত্যু, ভাল, মন্দ; দুঃখ, সুখ

প্রভৃতি পৃথকরূপে প্রকাশ পায়। তাই বুঝি কমলারও এই গভীর দুঃখের নিবিড় অন্ধকারে বিধাতা একটা আলোক-রশ্মি সেই মুহূর্ত্তেই প্রেরণ করিলেন।

চিতা নামাইয়া রাখিয়া দাহকারীগণ অদূরে বসিয়া আছে,—শিবনারায়ণ নিজেও এই দলের সহিত আসিয়াছেন, কিন্তু কমলাকে এখানে আনিয়া বিপদ বড় অল্প হয় নাই। প্রথম হইতেই সে প্রায় বীতসংজ্ঞা ছিল। বৃদ্ধার মুখাগ্নি করিবার পরই সে সম্পূর্ণ অচেতন হইয়া যায়। শিবনারায়ণ তাহাকে এতগুলি বাহিরের লোকের মধ্যে এ অবস্থায় ফেলিয়া রাখা অনুচিত বিবেচনায় মণীশের সাহায্যে একটু দূরে সরাইয়া আনিয়া তাহারই প্রতি ইহার রক্ষণের ভার দিয়া নিজে শবদাহের বন্দোবস্ত করিতে গেলেন। তখন মনে হইল, করুণাময়ী আসিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে আনিলেই ভাল ছিল।

পিতৃব্যের নিয়োগে মণীশ আসিয়া মূর্চ্ছিতা কমলার নিকটে দাঁড়াইল। এত বড় বিপদের সময়—তথাপি তাহার স্বভাবজাত একটা কুণ্ঠা প্রতিপদে তাহাকে বিপরীত দিকে ঠেলিতেছিল। কিন্তু না, ইহা দুর্ব্বলতা, এ ব্যবহার কাপুরুষের! সে নিজের চিত্তকে সবল করিয়া লইল।

শ্মশান-বহ্নির যজ্ঞকুণ্ডপার্শ্বে জাহ্নবী সৈকত বেদিকা-পরে, শৃগাল-সারমেয়-নাদশব্দিত সন্ধ্যা-যামিনীর মধ্যে যে মিলনের গ্রন্থি বিধাতা পুরুষ বাঁধিয়া দিয়াছেন সে বিবাহের বর কতটুকু লজ্জা-সঙ্কোচের অধিকার রাখে? অঞ্জলি ভ'রয়া জল আনিয়া নিস্পন্দ কমলার চোখে মুখে সে তাহা সিঞ্চন করিল। অদূরস্থ অগ্নিশিখা প্রচণ্ড

শোকদীর্ণ হৃৎপিণ্ড শোষণ করিতে করিতে অট্টহাসি হাসিতেছিল। সেই রুদ্র আলোকে মণীশ কমলার মৃত্যুবিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার নেত্র-তারকা স্পন্দিত হইয়া দুই চোখের দৃষ্টি, জলের আভাসে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল! কি অসহায় সেই মুখচ্ছবি! সহানুভূতিপূর্ণ বেদনায় মণীশের চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

কমলার কষ্ট যখন সীমার মধ্যে ফিরিল, সে মুখ ফুটিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মণীশ তখন তাহার জন্য অনেকখানি নিশ্চিন্ততা বোধ করিল। সান্ত্বনাপূর্ণ কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "তিনি তোমাকে আমাদের কাছে দিয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁর জন্য শোক করো না।" এইটুকু যেন সে কাহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এক-নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। বলা শেষ হইলে ঈষৎ লজ্জাও সে অনুভব করিল। কিন্তু এই যে কথাকয়টি সে উচ্চারণ করিল, কমলার কর্ণে তাহা দেবতার অভয়-বাণীর মতই অমৃত বর্ষণ করিল। অমনি এক মুহূর্ত্তে যেন সমস্ত ঘটনা তাহার বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতিসাগরের তলদেশ আলোড়িত করিয়া মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ তুলিয়া চাহিল। গভীর বিষাদের মধ্যেও একটা পরম আশ্বাসে তাহার বালিকা চিত্ত ঈষৎ শান্ত হইয়া আসিল। মনে পড়িল, মৃত্যুচ্ছায়াকম্পিত মুখের উপর জীবনের সেই মুহূর্ত্তেও কি গভীর স্নেহের রেখা বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই শীতল হাতখানি কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তাহার হস্তে অপর এক অপরিচিত হস্তের যোগসূত্র বন্ধন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ পরে সে নিজের কথা ভুলিয়া তাঁহাকে মনে করিয়া

কাঁদিল। সে যতই বড় হৌক্, জগতে নিজের স্ব-ই সব চেয়ে বড়,—মানুষ তাই গভীর শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসেই বলে, "ওগো, আমার কি হল!" এবং ইহার পরে বলে, "তুমি কোথায় গেলে!"

ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটীতে করুণাময়ী আসিয়া অনাথাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "এস আমার লক্ষ্মি! আমার ঘরে এস।"

দশ দিনে দশপিণ্ড ও শ্রাদ্ধাদি যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া কমলার অশৌচান্তে শিবনারায়ণ সপরিবারে স্বগ্রামে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে আর গৃহে ফিরিবেন না, ইহা জানাই ছিল; তথাপি যাত্রাকালে আবার নূতন করিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ-ব্যথা সকলের চিত্তে জাগিয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়াই করুণাময়ীর স্বস্তি নাই,—এ কয়দিন ক্রমাগতই তিনি চক্ষু মুছিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে ঢুকিয়া অছিলায় এটা-সেটা নাড়া-চাড়া করিতে করিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন, "বাবা, আপনি যাবেন না, আমরা কেমন করে সেখানে থাকব, বাবা? আমার যে একটুও মন সরচে না!"

উমাকান্ত এ কথার উত্তর একটু সকরুণ স্নেহের হাস্য দ্বারাই শেষ করিয়া দিলেন। পরে রোদন-পরায়ণা করুণাময়ীর মাথায় স্নেহপূর্ণ হস্ত রাখিয়া গভীর করুণার সহিত কহিলেন, "তোমার সব ভাল হবে,—মা আমার!"

ক্ষুদ্র কয়টি কথা! কিন্তু ইহার মধ্যে যে কত বল, কতখানি ভরসা ছিল, তাহা শ্রোতারাই শুধু বুঝিল। পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়-গামিনী নববিবাহিতা বালিকার মতই প্রৌঢ়া গৃহিণী

কাঁদিয়া বিদায় লইলেন। কমলার দুই চোখের মৌন দৃষ্টি হইতে ভক্তি-কৃতজ্ঞতার দুইটি ধারা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। কোন দিন সে বেশী কথা কহিতে জানে না, মনের যেটুকু স্বাধীন বৃত্তি ছিল, বুঝি, সেটুকুও দুঃখের চাপে আজ মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভাষা অনেক সময় যে গভীর ভাব প্রকাশে অক্ষম, আমাদের মনোদর্শন-স্বরূপ দুইটি নেত্র-তারকা তাহার সে ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া লইতে পারে। একা সত্যই আনন্দে আটখানা হইতেছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কমলার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি সে কহিল, "গৌরী বাঁদর মুখিটা আমাদের দেখে কি রকম আশ্চর্য্য হয়ে যাবে! তোমার খুব আহ্লাদ হচ্চে, না?"

কমলা এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিল না। দুঃখে তাহার বুকখানা পুড়িতেছিল। একদিন জগতের সর্ব্ব প্রধান অবলম্বন তাহার স্নেহময় দাদাকে হারাইয়া এই কাশীধামে আশাহীন হৃদয় লইয়া সে প্রবেশ করিয়াছিল। আজ সেই হৃদয়ে কি স্নিগ্ধ মধুর সুখের আশা ফুটনোন্মুখ পুষ্পমুকুলটির মতই সঙ্কোচে সরমে বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তথাপি মনে সুখ নাই! হায়, কোথায় রহিলেন, স্নেহময়ী ঠাকুরমা? কমলার জীবনে দুঃখ-তমিস্রা কাটিয়া সৌভাগ্য সূর্য্য উঠিবে,—কিন্তু দুঃখের সাথীরা ত তাহা দেখিবেন না। দুঃখ সহিয়াই যে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। এ কষ্ট কিছুতেই ভুলিবার নহে।

পরপারে পৌছিয়া সকলেই কাশীর দিকে ফিরিয়া যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। কমলার অপলক দৃষ্টি তাহার মধ্য কেন্দ্রে মণিকর্ণিকায় নিবদ্ধ রহিল। সেইখানেই সে ইহজীবনের সমস্ত

আশ্রয় হারাইয়াছে।—আর আজ যে আবার এই নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া নবীন জগতে সে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে, ইহাও সেই উহারই দান। ঐখানেই অনাথা কমলা শুনিয়াছে,—তাহার নিরাশার নিদারুণ মুহূর্ত্তে স্বপ্নাভিভূতার মত শুনিয়াছে,—করুণাদিপ্ত মূর্ত্তি পুরুষ তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, "গ্রহণ করলেম।"

পল্লীগ্রামে এত বড় অনূঢ়া কন্যা সাধারণের তীব্র আলোচনার প.ক্ষ নিতান্ত ছোট খাট বিষয় নয়! করুণাময়ীর সহিত কমলাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতিবেশিনীগণ চমকিয়া গালে হাত দিলেন। একজন অন্যরূপ বুঝিয়া সহানুভূতিতে গলিয়া বলিলেন, "আহা! এমন রূপের ডালি মেয়ে এই বয়সে কপাল পুড়ে গেছে!" কিন্তু গাঙ্গুলি-গৃহিণী যখন রসনা কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ষাট্, এটি আইবুড় মেয়ে, দিদি, এই আমার মনুর বউ হবে।" অমনি সহানুভূতিকারিণীর মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, চোখে মুখে একটা অবজ্ঞা ও অপছন্দের ছায়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। এই বয়সে তাহাকে দারুণ বিড়ম্বনাপূর্ণ বৈধব্যের মধ্যে দেখা সহিতে পারা যায়,—কিন্তু ওরে বাপ্‌রে! এত বড় ধেড়ে মেয়ে আজও কুমারী? সর্ব্বনাশ!—করুণাময়ীর স্বভাব গুণে পাড়ার লোকে তাঁহাকে সুচক্ষেই দেখিত, বাড়ীর কর্ত্তার কাছে অনেক লোকেই বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধে সম্পর্কিত, তাই অন্য বাড়ীতে হইলে এই ব্যাপার যতখানি সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইত, এখানে ততদূর ঘটিল না। বিশেষ সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজে এই বাগ্‌দানের কর্ত্তা জানিয়া নিতান্ত সাহসী ভিন্ন অবশিষ্ট লোকেরা একটু 'গাই

শুঁই' করিয়াই ক্ষান্ত হইল। দুই একজন মুখফোঁড় বলিল, "পণ্ডিত মশাই সর্ব্ব শাস্তর জেনেও এতবড় একটা অকল্যাণকর কাণ্ড করতে মত দিয়েচেন, তখন আর বলবার কি আছে? হিন্দুধর্ম্ম এবার দেশ থেকে উঠে গেল, দেখচি!"

কোন পুর মহিলা স্নানের ঘাটে সখীর সহিত চোখে চোখে ইঙ্গিতের আদান প্রদান করিয়া বলিলেন, "ওলো, এ হল ভাল,—ছেলেমেয়ের বে দিতে আর পুরুত ডাকতে হবে না, খরচ খরচা নেই, বর-কনেকে একসঙ্গে ঘর-করণা করতে দিলেই সব চুকে যাবে। শুনেচি, সায়েব-বিবিদের মধ্যে এই রকমই হয় না'কি!"

কথাগুলা পাঁচ কান হইতে হইতে ছয় কানে উঠিতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। মণীশ শুনিয়া আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার জন্য কমলাকে কেন দশজনের শ্লেষ সহিতে হয়? তখনই সে খুড়িমার নিকটে গিয়া বলিল, "সতু যা-হক করে এবার যখন ক্লাশটা উঠে গেছে, তখন আর ওকে এখানে রাখা নয়,—আমি ওকে নিয়ে কল্‌কাতা যাই। কি বল, খুড়িমা?" করুণাময়ী ক্ষণেকের জন্যও এ সম্ভাবনাকে চিত্ত মধ্যে স্থান দেন নাই, তাই চকিত হইয়া বলিলেন, "সে কি রে? দুজনে তোরা বাড়ী ছাড়া হবি?"

মণীশ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "না গেলে সতার যে পড়াশোনার সুবিধা দেখিনা, খুড়িমা! নিজের দলে একবার ভিড়লে আর কি ওকে পাওয়া যাবে? ও কি,—এরই মধ্যে তোমার চোখে জল এল, বুঝি? না, না খুড়িমা, যাব না, ওকে

থাক—তুমি চুপ কর।" বলিতে বলিতে মণীশের চোখেও অশ্রুর একটা উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছিল, সে তাহা সম্বরণ করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই করে করেই তোমরা আমাদের মাটি করে দিলে, খুড়িমা, কোথাও গিয়ে টিঁকতে পারিনে।" বলিয়া সে আনন্দোৎফুল্ল নেত্রে খুড়িমার অশ্রু-হাস্য-সম্মিলনে যমুনা জাহ্নবী সঙ্গম সদৃশ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই চুকিল না। অন্য কোন উপায় ঠাওরাইতে না পারিয়া মণীশ যখন একটা উড্ পেনসিলের মুখকে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের পর কর্ত্তনে অতি সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় একখানা পাতা ছেঁড়া মসীরঞ্জিত খাতা হাতে সত্য আসিয়া বলিল, "দাদা, অঙ্ক কষাবে না?"

মণীশ মুখ তুলিয়া একটু হাসিল, কহিল, "আজ যে এত চাড়? কি ভাগ্যি!"

সত্য কহিল, "সত্যি বলচি দাদা, এবার থেকে পড়বো,—যা বলবে, শুন্‌বো দেখো তুমি—"

মণীশ সেই কালিমাখা খাতাখানার মধ্যে একখানাও ব্যবহার যোগ্য পৃষ্ঠা যদি খুঁজিয়া পায়, তাহারই সন্ধান করিতেছিল। ভাইয়ের আকস্মিক সুমতিতে প্রীত হইয়া সে কহিল, "আমি ত জানি, তুমি খুব ভাল ছেলে, নিজেকে তুমি এতদিন বুঝতে পার নি বৈত নয়! এস—"

সত্য ঘাড় হেঁট করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে অঙ্ক কষিল। বুদ্ধিতে সে খাটো ছিল না। চিত্ত স্থির করিবামাত্র অতি সহজেই সে সফল হইতে পারিল, দেখিয়া আনন্দে মণীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে কহিল, "বেশ ত পার!" সে বিস্মিতও হইল—এই ক্ষমতাটা চাপিয়া রাখিয়া মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতি করে!

সত্য যখন দেখিল, দাদা বেশ একটু গলিয়াছে, তখনই সে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা দেখিল, বিনীত ভাব ধারণ করিয়া কহিল, "দাদা মিছি মিছি কলকাতা যাবার দরকার কি? তুমি বাবাকে বল যে, সতি এইখানেই মন দিয়ে পড়বে, বলচে,—তুমি বল্লেই বাবার মত হবে'খন।"

এতক্ষণে মণীশ কতকটা বুঝিল, তাই বটে! তাহার আশার মধ্যে সন্দেহের একটা ছায়া পড়িল। বিস্ময়ের কারণও ছিল। কাকা কেন এ কথা বলিলেন? তিনি কি করিয়া তাহার মনের কথা টের পাইলেন? ভাইকে সে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিল। সত্য কহিল, "মা বাবাকে বলেচেন, তুমি মাকে বলেচ, আমায় নিয়ে তুমি কলকাতা যাবে। বাবা তাই শুনে বল্লেন,—'খুব ভাল কথা বলেচে, তাই করুক।' ও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি—"

মণীশ সবেগে বাধা দিয়া কহিল, 'পায়ে পড়ি কি? কাকাবাবু বলেচেন, তার পরও তুমি এই সব বলচ? তাঁর আদেশ বেদ-বাক্য নয়?"

আশা ফুরাইতেই সত্যেন্দ্রর সজাগ বুদ্ধি বৃত্তি ক্ষুব্ধ রোষে অচেতন হইয়া পড়িল। দাদা তাহাকে কেমন করিয়া বিদ্বান করে, তাহা দেখিয়া লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ছাড়া পাইবামাত্র বেলের আটা দিয়া ছেঁড়া ঘুড়িখানা জুড়িয়া লাটাইয়ে বোতল চুরের মাঞ্জা-লাগানো সুতা জড়াইতে জড়াইতে সে বাড়ীর বহির হইয়া

গেল। এই রূপেই সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর প্রতিশোধ লইতে সক্ষম বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল।

২১

এত বড় থুবড়ো মেয়ে ঘরে রাখিয়া ভ্রাতা ভগিনীর কণ্ঠনলী দিয়া কিরূপে অন্ন-জল গলিতেছে. এই অভূতপূর্ব্ব কাণ্ডের কোন মীমাংসা ভট্টাচার্য্য গৃহের বড়বধূ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। মেয়ে খাইয়া খাইয়া দিন দিন হাতি হইয়া উঠিতেছে, তিনি হইলে এত-দিন কোন্ কালে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মেয়ে পার করিবার ভাবনাই ভাবিতেন। এই দেখ না, কথায় বলে,—যার বে' তার মনে নেই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই! মামা, মাসী দিব্য করিয়া নাসা-রন্ধ্রে সর্ষপ-তৈল নিসেকপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ ভোগ করি-তেছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ত অরে চোখে ঠুলি আঁটিয়া থাকিতে পারেন না কিন্তু বলিলে বোনটী ত দুই ঠোঁট এক করেন না। ভাই বলেন, সুপাত্র না মিলিলে কি করিব? সুপাত্র কি বিধাতাকে ফরমাস পাঠাইবেন? সুচক্ষে দেখিতে বাহির হইলেই সু খুঁজিয়া মিলে! সুপাত্রের ভাবনাটা কি?

একদিন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে বড়বধূ স্বামীকে গিয়া বলিলেন, "দুই ভাই বোনে মিলে ক্রমাগত যে পাত্র বিদায় করচ, এদিকে মেয়ের পানে যে আর চাওয়া যায় না!"

ভক্তিনাথ বৈশেষিক দর্শনের একখানা টীকা লিখিতেছিলেন আজ কাল তাঁহার অবসরের একান্তই অভাব। মুখ না তুলিয়াই তিনি কহিলেন, "তবে না হয় তার দিকে চেয়ো না।" এই বলিয়া

সম্মুখে ঈষৎ নত হইয়া কীট-দষ্ট পুঁথির অংশ-বিশেষ সাবধানে তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বড়বধূ এইরূপ অবজ্ঞাত হইবেন, তাহা না জানিয়াই যে, আসিয়াছিলেন, এমন নয়। যথেষ্ট সংযমের সহিত তিনি কহিলেন, "আমিই না হয় যেন চোখ বুজে রইলুম, কিন্তু পাড়াশুদ্ধ,—দেশশুদ্ধ সবাই কি চোখ বুজে থাকবে?"

"বড় বউ, তোমার কি ঘরের কাজ কিছু নেই? না থাকে ত, আমার বইগুলো ঝেড়ে রাখ না।"

বড়বধূ, এবার একটু চটিলেন, বলিলেন, "কাজ থাকবে না, কেন? যথেষ্ট আছে। তোমাদের ঘরে এসে কাজের কখনও অভাব দেখলুম না। কিন্তু যাই বল, আর যাই কও,—তোমাদের এ ব্যবহারটা ভাল হচ্ছে না। এর পর ঐ মেয়ে নিয়ে যখন ভুগতে হবে, তখন বলবে যে হ্যাঁ! তোমাদের ঘরে যদি এই হবে, তবে অন্যলোকে দেবে না কেন, বুড়ো করে মেয়ের বে?" এই বলিয়া সশব্দে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিন্তু বাড়ীর নূতন গৃহিণী যে খোঁচাটুকু বিঁধিয়া গেলেন, তাহার মধ্যে যে একটা অখণ্ডনীয় সত্যের আঘাত আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। গৌরীর বয়স এগার বৎসর হইতে যায়। তাঁহাদের গৃহে এত বড় করিয়া পূর্ব্বে আর কখনও কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় নাই। কাদম্বিনীকে নবমে ও বিন্ধ্যকে অষ্টমে দান করা হয়। একটা দুর্ব্বলতার বশেই এই মাতৃহীনা পিতৃত্যক্তা মেয়েটাকে এ পর্য্যন্ত তাঁহারা পর-হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু কাজটা যে অনুচিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ

নাই। যাহা করিতেই হইবে, তাহাতে এত মোহ কেন?

পুঁথি পত্র তুলিয়া মোটা দোবজাখানা গায়ে দিয়া ভক্তিনাথ বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর হইল।

তিনি ভিতরে আসিলে পা ধুইবার জল লইয়া বড় বধূ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর রাগ করেচ? রাগ কর, এবার থেকে না হয়, আর কিছু বলব না।"

ভক্তিনাথ পত্নীর হাত হইতে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন, "রাগ করিনি। তুমি যা বলেচ, ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিকই। তাই হরিশ ঘটকের কাছে গেছলাম। বিন্ধ্য, শুনে যাও, তোমার গৌরীর জন্য আজ একটি পাত্র দেখে এলাম।"

রান্নাঘরের রোয়াকে ছেলেরা খাইতে বসিয়াছিল। বিন্ধ্যবাসিনী তাহাদের পরিবেষণ করিতেছিলেন। এই সংবাদে পরিবেষণ পাত্র হাতে লইয়া এ দিকে তিনি একটু সরিয়া আসিলেন। ভক্তিনাথ কহিতে লাগিলেন, "ক্রোশতিনেকের ভিতরেই ছেলের বাড়ী। ছেলের বাপের নিজের চতুষ্পাঠী আছে। টোলে নব্য ন্যায় পড়ান হয়, ছেলেটি পাঠ শেষ করেচে। পাত্র ভাল, বয়স আন্দাজ,—পঁচিশ ছাব্বিশ, দেখিতে শ্রীমান, অবস্থাও স্বচ্ছল। তোমার পছন্দ হয়?"

বিন্ধ্যবাসিনী সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। দাদা বলিতেছেন, পাত্র ভাল, সুপাত্র! সে কি করিয়া বলিবে—'না'। কিন্তু ধ্বক্ করিয়া মনের মধ্যে অবাধ্য একটা 'কিন্তু' দেখা দিয়া নিমেষে বলিয়া উঠিল, এই কি তাঁহার গৌরীর যোগ্য বর?

বিন্ধ্যকে নীরব দেখিয়া বড় বধূ প্রমাদ গণিলেন। দেবতার কৃপায় যদি বা তাঁহার পণ্ডিত-মূর্খ স্বামীটির একটু সুমতি হইল, অমনি শনিগ্রহ আর একজনকে ভর করিয়া আসিয়া জুটিবে না কি? তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হইয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন, "ওমা, তা আর পছন্দ হবে না? তুমি নিজের চোখে দেখে পছন্দ করেচ, সে জায়গায় আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মেয়েমানুষে কি বেশি বুঝবো না কি? কি বল, ঠাকুরঝি? ও দিব্যি হবে। ঐখানেই তুমি ঠিক করে ফেল। অনর্থক দেরী করো না।"

বিন্ধ্যবাসিনী এই ওকালতির পর আর মুখ ফুটিয়া ইচ্ছা অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে সাহস করিলেন না, শুধু ঈষৎ মৃদু স্বরে ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খরচ পত্র কি রকম লাগবে?"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "তা কিছু ত লাগবেই। সাত আটশো টাকা খরচ করতে হবে। তা পাত্র যদি তোমার মনে ধরে থাকে, ভেবে দেখ, যে করে পারি টাকার জোগাড় আমি কোরে তুলব।"

এই কথা বলিয়া তিনি মুখ হাত ধুইবার জন্য বাহিরের দিকে ফিরিলেন। গলাটা ঈষৎ বুজিয়া আসিয়া ছিল, চোখ দুইটা ছল্‌-ছল্‌ করিতেছিল। আত্মীয়-বর্জ্জিত প্রবাসে অনাথার মত যে বোন শিশু কন্যাকে ফেলিয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে, তাহাকেই আজ মনে পড়িতেছিল।

কিন্তু টাকার কথাটা বড় বধূর মনে তেমন মোলায়েম ঠেকিল না। ঐ বাপে খেদান মেয়েটা স্বামীকে যে একেবারে গলায় আঁকৃসি দিয়া টানিবে, ইহা তিনি কোন প্রাণে সহ্য করিবেন? ওর

বাপরে! এমন অলুক্ষণে মেয়েকেও ঘরে স্থান দেওয়া হইয়াছিল! তাঁহার বাছাগুলি এইবার রাস্তার ভিখারী হইল আর কি!

দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া রাগিয়া তিনি বাড়ী মাথায় করিলেন। ভক্তিনাথকে এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন, "মেয়ে বড় হয়েছে, সুপাত্র ত্যাগ করব না।" সেখানে হাজার মাথা খুঁড়িলেও আর হুকুম টলিবে না জানিয়া সমুদয় ঝাল যে সহিতে বাধ্য, তাহারই প্রতি তাহা ঝাড়িতে চিরদিনের মত আজও তিনি দ্বিধা করিলেন না। গৌরীর প্রতিই শাসনদণ্ড উদ্যত করিয়া ক্ষতি পূরণ চাহিলেন। কিন্তু, হায়, জগতে যেমন হাসি মুখ, তেমনই রাঙ্গা চোখ,—কিছুই অর্থ প্রসব করিতে পারে না।

সত্য দেশে ফিরিয়া নিজের দলের লোকদের নিকট সংবাদ পাইল, গৌরী আজকাল আর তাহাদের দলে ভিড়িয়া আম বাগানে, জাম বাগানে ঘুরিতে পায় না। মাছ ধরার পাট ত সে বিহনে এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। শুনিয়া সত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। হুঁ, সে দেশে নাই, গৌরী কি সুখে খেলার দলে মিশিবে? এইবার সে এখনই গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সকল লোককে আপনার প্রভুত্বটা একবার দেখাইয়া দি'ব, কি!—সদম্ভে সে ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর দিকে চলিল। অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া সঙ্গীরা বলিল, "মাসির চোখে ধূলো দেওয়া যায়, কিন্তু আমীর চোখ যে উটের চোখ।" "দেখা যাক্, উট চোখ বোজেন কি, না বোজেন।"

খিড়কির দ্বারে ঘা পড়িল, জানালায় ঢিল পাটকেলের কাঁড়ি

জমা হইল, কিন্তু সমস্তই বৃথা। রান্না-ঘরের পাশ দিয়া সশব্দচরণ কোন পঠনশীল সুবোধ বালক গো-শব্দের রূপ উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে করিতে কম্ না হৌক তো পঞ্চাশ বারই আনাগোনা করিল, কিন্তু তাহাতে অদূরস্থ গোগৃহের মধ্যে গাভীদলেরই অজ্ঞাত চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়া সাড়া দিল, তথাপি গো-প্রমুখ নামধারিণী কোন নারীর সাড়া মিলিল না। কেবল ভিতর হইতে কর্কশ কণ্ঠের একটা সাড়া আসিল, "ন্যাপ্‌লা, দেখ্‌ত রে, কে.ন্ হতচ্ছাড়া ছোঁড়া পাদাড়ে বিন্থে ছড়াতে এসেচে,—কান ঝালাপালা করে তুল্লে যে!"

সম্বোধিত ন্যাপ্‌লার বহিরাগমনের পূর্ব্বেই সত্য পাড়ি গুটাইল। ক্রোধে ক্ষোভে সঙ্গীর দলে সেদিন সে আর ভিড়িল না।

বাড়ীর ভিতরে তখন মধ্যাহ্নের বিশ্রাম অবসরে বড় বধূ কাঁথার উপর বিচিত্র বর্ণের সূতা দিয়া পদ্মফুল তুলিতেছিলেন, আর বিন্ধ্য ঠাকুর আরতির দ্রব্যাদি সাজাইতেছিল। কারণ তাঁহাদের আহারাদি শেষ হইবার পর সূর্য্যদেবের পাটে বসিবার বড় বেশী বিলম্ব থাকে না।

২২

গৌরী সে দিন মামী কর্ত্তৃক সদ্য ভর্ৎসিত হইয়া তাঁহার দুইটি আব্দারে শিশুকে ঘরে লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় মঙ্গলা গাইটা দড়ি ছিঁড়িয়া উঠানে দাপাদাপি করাতে জানালার নিকট আসিয়া সে হাসিয়া কুটিকুটি হইল। এমতকালে সহসা বাহিরে সত্যর সাড়া পাওয়া গেল। বড় বধূ বলিলেন, "ওই

হল গো ঠাকুরঝি! দস্যি মেয়েকে সামলানো দায় হবে! গৌরী, গৌরী, ও কি হচ্চে?"

সম্মুখে নজর পড়িলে দেখা গেল, গৌরী পদাঙ্গুলে ভর করিয়া চুপি চুপি খিড়কির দিকে চলিয়াছে। বড় বধূ তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "অমন মেয়ের আবার বে দেওয়া কেন? গাঁয়ের চৌকিদার করে দিতে হয়। দেবে শাশুড়ি ছুদিনে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তখন টেরটি পাবেন মাসি, যেমন নাই দিয়ে দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলচেন!"

বিন্ধ্যবাসিনী কঠিন স্বরে ডাকিলেন, "গৌরি—"

গৌরীর মাথার উপর যে একটা ঘোরতর দুর্দ্দিন বজ্রের ছায়ায় উদ্যত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা সে ইহার মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ দিদিমা ও দাদাবাবু বিহনে এ বাড়ীতে তাহার অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহার উপর আবার বিবাহ। বনের চঞ্চল মৃগকে ধরিয়া শিকল দিয়া বাঁধিবার এ চেষ্টা কেন? কনে দেখা দিবার কালে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া প্রথম দিনটা সে ঘোষেদের বাড়ীর গোয়াল ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল; কিন্তু বাড়ী ফিরিলে সে দিন আর তাহার লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। ভক্তিনাথ শুধু গম্ভীর মুখে শাসন করিতে আসিয়া বলিলেন, "ছি মা, অমন কাজ করতে নেই।" এইটুকু বলিতেই সহসা তাহার অসহায় মুখচ্ছবি চোখে পড়িয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আর তিনি বলিতে পারিলেন না। বড়বধূ কহিলেন, "ভুগবেন্—নিজেরাই ভুগবেন্ আমার কি!" গৌরী যখন বুঝিল, আর নিষ্কৃতি নাই, তখন

তাহার দুই চোখ দিয়া সেই যে ধারা নামিল, তাহা আর থামিল না। আর একজন শুধু তাহার এই অসহায় রোদনের সঙ্গিনী ছিলেন, তিনি তাহার মাসিমা, বিন্ধ্যবাসিনী। এ সম্বন্ধ, কে জানে কেন, কিছুতেই তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না। অথচ ইহার চেয়ে ভাল পাত্র আনিতে মূল্যও ভালরূপ দিতে হইবে। বিন্ধ্য জানেন, এ সংসার হইতে তাহার সংস্থান হওয়া অসম্ভব। এই কয়েক শত মাত্র টাকা সংগ্রহ করিতেই ভাইকে কতখানি বেগ পাইতে হইতেছে। অগত্যা নিরুপায়া বিধবা হরিদ্রা ও কালিমাখা বসনাঞ্চলে আপনার অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রদ্বয় নিঃশব্দে মুছিয়া ফেলিয়া সাবধানে ডালের হাঁড়িতে জিরার ফোড়ন ছাড়িয়া দিলেন। সারাদিন বরং কোনরূপে কাজ কর্ম্মের মধ্যে উথলিত অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ রাখা চলে, কিন্তু গভীর নিশীথের কর্ম্মহীন অবকাশের মধ্যে শব্দহীন অন্ধকারে নিদ্রিতা বালিকার নিশ্চিন্ত আলিঙ্গনের নিবিড় বেষ্টনে সে অশ্রু আর কিছুতেই বাধা মানিতে চাহে না। গৌরী সেই তপ্ত অশ্রু-স্পর্শে কোন দিন জাগিয়া উঠিয়া বুক ফাটা বেদনায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলে, "ওগো মাসিমা, আমার বিয়ে দিয়ো না, দিলে আমি মরে যাব।" বিন্ধ্যবাসিনী দুই হাতে তাহাকে বুকে টানিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠেন, "থাম্ আবাগি, থাম্, আমায় অমন করে পোড়াস্‌নে।"

এই আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা উভয়কেই নিদারুণ পীড়া দিতেছিল। গৌরী যে ধনবানের কন্যা হইয়াও অর্থাভাবে যোগ্য পাত্রের হাতে পড়িবে না, এই দুঃখই আরও বেশী করিয়া তাহার মাসিকে বিঁধিতেছিল। তাহার উপর গ[illegible] গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞতা,

নারী-জনোচিত লজ্জাশীলতা ও গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব। এ চিন্তাও বড় সামান্য চিন্তা নয়! কে তাঁহার এই চঞ্চলা মৃগশিশুটিকে করুণার চক্ষে দেখিয়া ক্ষমা করিবে? বড়বধূ স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই যে সর্ব্বস্ব পণ করে ভাগ্নির বে দিচ্ছ, মাসি বোন-ঝির চোখে ত বান ডেকেচে, কোন্‌দিন বা বাড়ী বাগান ভাসে!"

ভক্তিনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বিন্ধ্যর কি এ পাত্র পছন্দ হয়নি?"

বড় বধূ এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়া কহিলেন, "হয়েচে, কি না হয়েচে, তা সে আমায় বলেচে না কি? আমি ত আর জান্ নই যে জান্‌ব।"

"তবে শুধু শুধু মানুষের নামে লাগাতে এসো না। কি গ্রহ! মেয়ের বিয়ে দেবে—চিরদিন মানুষ করলে,—কাঁদবে না, সে? তোমার মত পাষাণী নয় ত।"

ভক্তিনাথ বিরক্তভাবে চলিয়া গেলেন। বড় বধূ রাগ করিয়া উপরের ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলেন। ননদ আসিয়া না সাধিলে সে দিন আহার করিলেন না। এক মার পেটের ভাই বোন ত! একজনকে তিনি আঁটিতে না পারিলে অপর জনের উপর কেনই বা শোধ না তুলিবেন?

যেদিন সত্য গৌরীকে ডাকিতে আসিয়া একাই ফিরিয়া গেল, গৌরীর পক্ষে সেদিনের মত কষ্টের দিন আর কখনও আসে নাই। মাসিমার সমুদয় উপদেশ ভর্ৎসনার দিক হইতে নিজের বিদ্রোহী চিত্তকে রুদ্ধ রাখিয়া পাথরের মত নিশ্চলভাবে সে বসিয়া রহিল, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে যখন বিন্ধ্য কাছে আসিয়া "রাণু মা, উঠে এস

মা" বলিয়া ডাকিয়া তাহার গায়ে হাত দিলেন, তখন সে আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না। অজ্ঞাতে কেমন করিয়া মনটা গলিয়া গেল। উঠিয়া হঠাৎ মাসিমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সে কহিল, "আমি ভারি দুষ্টু, না মাসিমা ?"

"না মা তুমি আমার সোণা মেয়ে," বলিয়া মাতৃস্বসা দুই হাতে তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন। তারপর ত্বরিত দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, বড়বধূ দেখিতে পাইয়াছেন কি না। দেখিলে এখনই বলিবেন, "ঐ করেই তুমি মেয়েটার মাথা খেলে!" কিন্তু তিনি কি করিবেন? মা-হারা সন্তানকে যে মানুষ করিয়াছে, সেই জানে, কেমন করিয়া সে তাহার পালয়িত্রীকে আকুল করে। বিশেষ এই কুহকিনী মেয়েটাকে শাসন করা যে কি দায়, তাহা তিনিই জানেন।

সারাবেলা ধরিয়া গৌরী সেদিন মাসিমার কাছে কাছে রহিল। বৈকালে যখন উঁচু খোঁপার চারি পাশে সোণার পুঁটে সাজাইয়া বেলফুল' গা ধুইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, তখনও সে মনটাকে দুষ্ট ঘোড়ার মত রাশ টানিয়া ফিরাইয়া রাখিল, মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "না ভাই, এখন যাবনা', মাসিমার সঙ্গে যাব; তুমি যাও।"

"ক্যান্ লো! চল্ না। আজ মন্মিছরি শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেচে, সত্য দারা এসেচে, যাবিনি ?"

বড় প্রলোভন! কিন্তু তথাপি মাসিমার সে আদরের শাসনে একটা অলঙ্ঘ্য নিষেধ শক্তি নিহিত ছিল। রাণী সংক্ষেপে কহিল, "না ভাই, বড় হয়েছি।"

এক দিনের মধ্যে সে এতখানি কি বড় হইয়া গেল, ইহা না বুঝিয়া বেলফুল রাগিয়া বলিল, "বুঝেছি লো, বুঝেচি, বিয়ে ত আর কারু কখনো হবে না। দেখলুম ভাই, দেখলুম!" সশব্দে মল বাজাইয়া সে চলিয়া গেল।

এদিকে যত বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, গৌরীর প্রাণের ভিতরটা ততই ছটফট্ করিয়া উঠিতে লাগিল। একবার পুকুরঘাটে যাইতে পারিলে হয় ত সত্যর দেখা মিলিতে পারে। সে কি মনে করিতেছে! কত রাগ করিতেছে! বাড়ীতে টেঁকা তাহার দায় হইয়া উঠিল। রান্নাঘরের দালানে বসিয়া মাসিমা তরকারি কুটিতেছিলেন, পিছন হইতে তাঁহার গলাটা সে জড়াইয়া ধরিল। বিন্ধ্য চমকিয়া উঠিয়া বঁটি ছাড়িয়া দিলেন, কহিলেন, "সর্ব্বনাশি, এখনি কেটে খুন হয়েছিলি যে!"

মাসিমার স্বর স্নেহ-বিগলিত। গৌরী তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "একবারটি—মাসিমা, আজকের মত একবারটি সত্যদাদের বাড়ী যাই না? যাই না, মাসিমা!"

এ কণ্ঠকে অবহেলা করিতে কি মাসিমার সাধ্য আছে? বিন্ধ্য 'না' বলিতে গিয়া বলিয়া বসিলেন, "তা যা, শীগ্‌গির আসিস্ কিন্তু, রাস্তা ঘাটে বেড়াস্‌নি,—মনে থাকবে?"

"থু—উব্" বলিয়া একলম্ফে গৌরী গামছা ও কলসী লইয়া বাড়ীর বাহির হইল। গৃহান্তর হইতে তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া বড়বধূ বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "চলন্ দেখ্‌চ—মেয়ে যেন ঘোড়ায় নাচ নাচ্‌চেন।"

সত্যদের বাড়ী সত্যর দেখা মিলিল না, কিন্তু গৌরী একটি

অপরিচিত সুন্দর মুখ সেখানে দেখিল। এমন মুখ সে আর কখনও বুঝি দেখে নাই। ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিয়া ক্রমে সে তাহার নিকটস্থ হইল, তারপর হঠাৎ চট্‌ করিয়া কলসী নামাইয়া তাহার হাত ধরিয়া একেবারে সে প্রশ্ন করিল, "তুমি কে ভাই? কোথা থেকে এলে?"

এই সরল প্রশ্নকারিণী মেয়েটিকে কমলার ভালই লাগিল। সকলেই এখানে তাহাকে পরীক্ষার ছাঁদেই যাহা কিছু জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছিল। তাহার এতখানি বয়স অবধি অবিবাহিতা থাকা অপরাধের কৈফিয়ৎ লইয়া লজ্জায় সকলে তাহাকে মাটিতে মিশাইয়া দিতে চাহিতেছিল,—ইহার মধ্যে খোলাখুলির ভাবটা যে মোটেই ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। সে তাই এই বালিকাটিকে দেখিয়া যেন একটা সত্য বস্তু পাইয়া আশ্বস্তভাবে সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমি কমলা, কাশী থেকে এসেচি, ভাই। তোমার নাম কি?"

"গৌরী গো, গৌরী। আমার নাম তুমি জান না? সত্যদা তোমায় বলেনি? হ্যাঁ গা, সত্যদা কোথা গেল?"

"তুমিই গৌরী! তোমার কথা ঢের শুনেচি বৈ কি। এসো এসো, আমি যে তোমাকেই খুঁজছিলাম।"

কমলাই যখন তাহার পরিত্যক্ত শূন্য কুম্ভ দর্শনে তাহার গা ধুইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তখন তাহার সহিত গৌরীর বন্ধুত্ব বেশ পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। কমলা খিড়কীর দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে বিদায় দিল, বলিল, "কাল এসো।"

"আসব" বলিতে গিয়া গৌরীর হঠাৎ স্মরণ হইল, কি করিয়াই

বা সে আসিবে? সে ত আসিতে পারিবে না। তাই ক্ষুণ্ণ মনে কহিল, "আমার যে ভাই আসবার যো নেই! তুমিই যেয়ো না।"

কমলা মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিল, কহিল, "আমি কি এখানে কোথাও যেতে পারি? কেন, তোমার আসবার যো নেই, ভাই?"

গৌরী কহিল, "আমার যে বিয়ে হবে, ভাই,—তুমি শোননি? মাসিমারা তাই কোথাও যেতে দেন না।"

কমলা এ কথায় কৌতুক অনুভব করিল না, বরং সে যেন সহসা একটা ব্যথা বোধ করিল, তাই কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ের কথা শুনিনি ত! কবে বিয়ে?"

"কে জানে? বলি মাসিমাকে, যে বিয়ে টিয়ে দিয়ো না,—তা ওরা কিছুতেই শুনবে না।" বলিতে বলিতে তাহার দুঃখটা উথলাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল দেখিয়া ঘড়াটা টানিয়া লইয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

কমলা বিস্ময়ে করুণায় চাহিয়া রহিল। বাস্তবে ও কল্পনায়, সংসারে ও পুস্তকে কত প্রভেদ! সে সত্যর নিকট হইতে গৌরীর যে চিত্র পাইয়াছিল এবং আজ নিজে তাহার যে পরিচয় স্বয়ং পাইয়াছে, ইহাতে এমন কোন কঠিন চিত্ত ঔপন্যাসিক নাই, যে এই দুইটি অনভিজ্ঞ শিশু-হিয়াকে একই বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য বৎসর দুই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে না পারে। কিন্তু বাস্তব সংসার এ সব চাহিয়া দেখে না, বরং কঠিন উপহাসে এ সব ভাঙ্গিয়া দলিয়া 'ষ্টীম রোলারের' মতই নিজের পথে সে চলিয়া যায়।

গৌরী যখন ঘাটে পৌছিল, তখন সন্ধ্যার ছায়া সলিল চুম্বন করিয়াছে, সন্ধ্যার দীপ জলের মধ্যে প্রদীপ শিখার মতই স্পন্দিত হইতেছে। বাতা'ব লেবুর গাছগুলা হইতে অপর্য্যাপ্ত পুষ্পগন্ধ উত্থিত হইয়া নির্জ্জন উদ্যানে সন্ধ্যাচারিণী বনদেবীর মৃদু নিশ্বাসের মতই ঘুরিয়া বহিতেছিল। গৌরীর মনে ভয় ডর নাই,—গ্রামের মেয়েরা স্বভাবতঃ সহরের মেয়েদের চেয়ে সাহসী,—তাহারা ভূত প্রেতের কল্পিত অস্তিত্ব মানিলেও বনে বাদাড়ে ঘুরিতে ভয় পায় না। তাহা ভিন্ন গৌরী ত বন বিহঙ্গী—গৃহ-কপোতী নহে। তাহার মনে যে একটা ভয় জাগিতেছিল, তাহা ভূতের ভয় নয়, তদপেক্ষাও বড় ভয়। অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে, ইহার পর আর কখনও সে মাসিমার নিকট শীঘ্র ফিরিবার গ্যারাণ্টি দিয়া মুক্তি আদায় করিতে সক্ষম হইবে না, অথচ সত্যদার সহিত দেখাটাও হইল না!—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "গৌরি!"

"তুমি এলে!" ধড়মড়িয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। "কি করে জানলে,—তুমি? কি করে জান্‌লে যে আমি এখানে এসেচি? রাগ করনি ত? তুমি ঠিক বলচো, সত্যি বলচো, সত্যি বলচো?"

সত্য শপথ করিয়া বার বার জানাইল, সে রাগ করে নাই—বড় মামীকে কি সে চিনে না? তখন আশ্বস্ত হইয়া গৌরী তাহার পুরাতন সাথীর সহিত নূতন করিয়া সুখ দুঃখের কথা কহিতে বসিল। কহিল, "মাছ টাছ ধরা আর হবে না, সত্যদা, এক একদিন লুকিয়ে পালিয়ে আসব'খন, রোজ কিন্তু আসতে পারব না—বড় মুস্কিল!"

সত্যর মুখের ভাবও তাহারই মত সঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "এসেই বা কি করবি? আমি ত দু এক দিনের মধ্যেই দাদার সঙ্গে কল্‌কেতা যাচ্চি।" বলিয়া সে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

গৌরী চমকিয়া উঠিল; কহিল, "সে কি ভাই! কেন?"

"জানি না, ওঁরাই জানেন। তুই কমলাকে দেখেচিস?"

"হ্যাঁ, কমলা ত বেশ!"

"ও কে, জানিস্?"

"কমলা,—কে? না।"

"আমাদের বউ।"

"তোমার বউ?" বলিতে বলিতে সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাস্যস্রোত পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করিয়া কানন মধ্যে সঙ্গীতস্রোতে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। প্রকৃতি যেন এইটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল—সৌন্দর্য্য-সৌরভের সঙ্গে সঙ্গীত মিশ্রিত হইল। "বড় থাক্‌তে ছোটর বিয়ে! বড় থাক্‌বে গালে হাত দিয়ে? মণী-দার বিয়ে হল না,—তোমার বিয়ে?"

সত্য এ পরিহাসে রাগ করিয়া তাহার আঁট্ সাঁট্ বাঁধা খোঁপায় একটা টান দিয়া কহিয়া উঠিল, "হবে ত হবে,—তোর কি!"

গৌরী অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়া যখন থামিল, তখন হঠাৎ তাহার চোখ দুইটায় জল আসিয়া পড়িয়াছে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ নীচু করিয়া সে জলের দিকে চাহিল। সত্য তাহার গালে একটা চড় মারিবার জন্য হাত তুলিয়া কি ভাবিয়া সহসা আপনাকে সম্বরণ করিয়া কাঁদিতে হাসিতে কহিল,

"ওরে হিংসুকে, আমার বিয়ে নয় রে, দাদার বিয়ে। তোর যা বিত্থে হচ্ছে রাণি, কেউ তোকে বিয়ে করবে না, দেখিস্! বড় থাকতে ছোটর বিয়ে কখনও দেখেছিস্, তুই ? বল্ বাঁদরি বল্ ?"

এত বড় অপমানের কথাটা সত্যর মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র গৌরী হাসিয়া উঠিল. সগর্ব্বে কহিল, "ইঃ, হবে না ত কি! সব ত ঠিক।"

এবার শ্রোতার মুখে সেই ঈর্ষার ছায়াখানা আসিয়া পড়িল কি না, অন্ধকারে তাহা ঠিক দেখা গেল না।

২৩

শচীকান্ত এখন বেশ আছে। পড়া শুনার চাপ নাই, অভাব-অভিযোগের জুলুম নাই, স্বচ্ছন্দ ভোজন, সানন্দ বিচরণ, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ভবিষ্য কাব্যের কল্পনা করা এখন তাহার প্রাত্যাহিক কার্য্য। ইহা ভিন্ন মাসিমার নিকট হইতে সম্প্রতি সে একটা ক্যামেরা কিনিবার পয়সা আদায় করিয়াছে,—জিনিষটা এ দেশে এখনও অনেকটা নূতন, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে। কাজেই ইহার কাচের মধ্যে মসী মলিন মুখগুলার অধিকাংশই বিস্ময় বিহ্বল ভাব লইয়া প্রত্যক্ষ হইতেছিল। কিন্তু এমন করিয়া মানুষের খুব বেশী দিন কাটিতে পারে না। এবার কাশী গিয়া সে যে নূতন স্বাদ পাইয়া আসিয়াছে, তাহার প্রলোভন তাহার চিত্ত আর আপনাকে গৃহ-কোটরে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। পূজার পূর্ব্বে একবার দেশ-ভ্রমণ করিয়া আসিবার লোভে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্কল্প শুনিয়া গিরিজাসুন্দরী

গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, "না রে বাপু, না, ঘরের ছেলে ঘরে থাক্, কোথায় যাবি !"

কিন্তু গোপনে একটা পরামর্শ চলিতেছিল। এ খবরটা সহসা একদিন গিরিজাসুন্দরী নায়েব হরচন্দ্রের মুখ হইতে অবগত হইয়া বহির্বাটীতে আসিয়া বামালশুদ্ধ চোর পাকড়াও করিলেন। শচী বলিল, "কি করি, মাসিমা ? জানলে ত তুমি যেতে দেবে না, তাই শিশির আর আমি দুজনে এই ফন্দি এঁটেছিলুম।"

শিশির কলাণীর স্বামী। মাসিমা কহিলেন, "তা যাবিই ত! আমার মুখ চাইবি কেন, বল্ ? আমি তোর কে ! পূজোর সময় যদি বাড়ী ছেড়ে যাবি, তবে কাকে নিয়ে থাকি, বল্ দেখি ?"

শচীকান্ত হাসিয়া কহিল, "কেন, কলীকে আন্‌লেই হয়। পাঠাবে না বই কি, খুব পাঠাবে। কেউ ত তাকে বেচে খায়নি। সে সব আমাদের ঠিক্ হয়ে গেছে, পঞ্চমীর দিন সে আসবে। তুমি ভেতরে যাও মাসিমা, এখনি কেউ এসে পড়ে নিন্দে করবে।"

"গিরিজা বাম্‌নির নিন্দে করবে, এমন লোক এখনও এ মুল্লুকে জন্মায়নি" বলিয়া সগর্ব্ব পদ-বিক্ষেপে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী নায়েবখানার পিছনে পর্দ্দার অন্তরালে বৈষয়িক কার্য্যের তদারকে চলিয়া গেলেন। কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নাই, অপব্যয় নাই, অবিচার নাই। এই নারী সম্রাজ্যের অল্প-সংখ্যক প্রাণী এ রাজ্যে সুখেই বাস করে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কথা কহিতে সাহস পা[illegible]

শচীকান্[illegible]ঙ্গে কিছুদিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া শিশির শেষ

কাশী গমনের প্রস্তাব করিল। কাশীতে পিতা আছেন,—শচীকান্ত প্রথমটা সেখানে যাইতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু নাছোড়বান্দা শিশির নিতান্ত না ছাড়ায় তথায় যাইতে সে বাধ্য হইল। উমাকান্ত এখনও তেমনি সেই স্বল্প কয় ঘণ্টা নিদ্রার পর মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির বিশ্রাম অবসরে নীরব উপাসনা, পূজামন্ত্রে বিশ্বনাথের আরাধনা, শিশির-ঝরা ভোরের আলোয় জাহ্নবী-তরঙ্গের সুপ্তি-ভঙ্গে তেমনই অলি-গলি ঘুরিয়া আর্ত্তকে সাহায্য ও ব্যথিতকে শান্তিদান, সন্ধ্যার ঝিকৃমিকে আলো নৈশ অন্ধকারে ডুবিতে আরম্ভ করিলে দিবারাত্রির সন্ধিস্থলের সাম্যভাব, জন্ম মরণের সন্ধিরূপে স্বীয় অন্তরাত্মায় অনুভব করা—এ সকলই তাঁহার তেমনই আছে।

শিশির সবিস্ময়ে তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। কত বালক, যুবা, প্রৌঢ় শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ করিতে আসিতেছে, কত বৃদ্ধ অপরাহ্নে শ্রান্ত পদে ক্লান্ত চিত্ত বহন করিয়া আনিতেছে। অর্থার্থী, আরোগ্যার্থীর শেষ নাই। কি সৌম্য মুখ! অক্লান্ত প্রসন্ন চিত্ত! শিশির কহিল, "তুমি যাও ত যাও, আমি এখন যাব না।"

উমাকান্ত একদিন শচীকে আপনা হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার মাসি যখন তোমায় নিয়ে যান, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর স্বামীর বিষয়ের অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী দেবর কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন। মেয়েটি এখন বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে, বিবাহে তিনি আমার অনুমতি চেয়েছেন, আমারও আপত্তি নাই, লিখেছি।"

শচীকান্ত কিছু বলিল না, কিন্তু মনটা একটু অপ্রসন্ন হইল।

এ বিবাহ-প্রস্তাব সেও শুনিয়াছে, কিন্তু ইহা তাহার প্রেয় নহে। অবশ্য ইহাকে বিবাহ করিলে এক পক্ষে ভালই হয়, কিন্তু বিবাহ-সম্বন্ধে সে যখন নিজেকে এক জায়গায় মনে মনে দায়ী করিয়া রাখিয়াছে, তখন অন্যত্র তাহার বিবাহ কিরূপে সম্ভব ?

কর্ম্ম-চঞ্চল শরতের প্রভাতে সদ্যজাগ্রত পল্লীপথ ধরিয়া শচীকান্ত যখন তাহার মাসিমার গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহার উদ্যানের শিউলিতলায় ঝরোফুলের শয্যা পল্লী-বালিকাগণের বলয়-ঝঙ্কৃত হস্তের আলোড়নে বিত্রস্ত হইয়া পড়ে নাই, এবং শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদলের শিরগুলি তাহাদের আল্‌তা-মাখা পদস্পর্শে নুইয়া পড়িতে তখনও বিলম্ব ছিল। ফটকের পাশের কুঠারি হইতে দ্বারবান ছট্টু সিংয়ের মৃদু-স্বরে উচ্চারিত "হে গোবিন্দ রাখ অধম অবতু জীবন হারে" ইত্যাদি ভজনগান শুনা যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া খাটিয়া হইতে শশব্যস্তে উঠিয়া মাথা নত করিয়া সে বলিল, "পর্‌ণাম বাবু " শচী ঈষৎ হাসিয়া উদ্যান পথে চলিল।

ক্রমে পথের উপরে পশারী পশারিণীর প্রকাণ্ড ঝাঁকা ও ব্যস্ত গতি দৃষ্ট হইল। কৃষাণ গরু বাছুর তাড়াইয়া মাঠের পানে চলিতে চলিতে বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিয়া গেল। গোয়ালা গোগৃহের অঙ্গনে গাই দুহিবার জন্য বাছুর বাঁধিতেছিল, কিন্তু চঞ্চল গোবৎস সারা রাত্রির পর মাতৃদর্শন পাওয়ায় মাতৃ-স্তন্য ত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া সজল-নয়না মাতার পানে ফিরিয়া ফিরিয়া ডাকিতেছিল, "হ্বাঃ"। সে বুঝে না যে, তাহার মাও কত নিরুপায়!

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই কল্যাণী আসিয়া পায়ের কাছে

প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল, "এতকালে ফেরা হ'ল ? এসে পর্য্যন্ত তোমায় দেখবার জন্য ছটফট করে মরচি, তোমার আসবার আর বারই হয় না।"

শচীকান্ত সংসারের মধ্যে বোধ হয় মণীশ ও কল্যাণীকেই সব চেয়ে ভালবাসিত। এই স্নেহময়ী বোনটির হাসিমুখের ছায়া তাহার জীবনের অনেক দিনের স্মৃতি-সুখে মিশান ছিল। তাহার এই স্নেহ-তিরস্কারে তাই সে অপ্রতিভ হইল। একটু হাসিয়া কহিল, "সেই জন্যই ত এলাম রে! দেখচিস্ না, শিশির এখন আসবে না, বল্লে—তাই একাই পালিয়ে এসেছি। মাসিমা কোথায় ?"

"মা ঘাটে গেছেন। সেই জন্যই এলে,—নইলে আরও দেরি হত ? তাই ত বলি বাপু, বউ আনো, নৈলে ঘরে মন টিঁকবে কেন ?"

শচীকান্ত কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল, "বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই আবার ছান্‌লা-তলায় বিদেয় কর্‌তে চা'স্!"

কল্যাণী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "না, না, এসো ভাই, ও সব কথা পরে হবে, কিন্তু এবার আর ভাজের মুখ না দেখে যাচ্চি নে, তা ব'লে রাখলুম। ঝাপ্‌টা গড়িয়ে এনেছি, বউ দেখব ব'লে।"

"বেশ করেছিস! যত্ন ক'রে রেখে দিস, চুরি না যায়!" শচী হাসিতে হাসিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। কল্যাণী ভ্রূকুটি করিয়া হাসিয়া বলিল, "যাও, তোমার [illegible] তাতেই ঠাট্টা!"

গিরিজাসুন্দরী আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শচী[illegible] আপাদ-মস্তক

নিরীক্ষণ করিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন, "কৈরে, পশ্চিমে বেড়িয়ে গায়ে সারলি কই ?"

"উঃ, সারিনি আবার! এই দেখ না—" বলিয়া শচীকান্ত কামিজের আস্তিন গুটাইয়া বাহু প্রদর্শন করিল। মাসিমা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "এবার ত সখ মিটেছে, বাছা ? এইবারে বে-থা ক'রে সংসারী হও। তারাও ব্যস্ত হচ্চে,—আমিও আর দেরি কর্‌তে পারিনে।"

দ্বিপ্রহরে দিব্য একটি ফুটফুটে ছেলে কোলে কল্যাণী আসিয়া দাদার খাটের প্রান্ত দখল করিল। শিশু অপরিচিত মামার আহ্বান উপেক্ষা করিয়া মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। কল্যাণী কহিল, "তোমাদের বেড়ানোর গল্প কর।"

শচীকান্ত বলিতে লাগিল—আর নাট্যশালার অভিনীত নাটকের এক একটা অঙ্কের মত সেই বিচিত্র দেশের বিচিত্র স্মৃতি কবির নিপুণ তুলিকায় জীবন্ত চিত্রবৎ সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চিরগৃহ বদ্ধা মুগ্ধা কল্যাণী শুনিতে শুনিতে পুলকে বিস্ময়ে শতবার স্তম্ভিত হইল।

শচীকান্ত এবার কাব্য-কলা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছে। "মঞ্জু-গুঞ্জন," "ক্ষণিকের দেখা" পাতায় পাতায় পূর্ণ, তাহার উপর আবার শরৎকালের স্বর্ণরেণু মাখান রাঙ্গা আলোয় "শারদার" পৃষ্ঠাগুলিও ঝল্‌মল্ করিতেছে। সে লিখিতেছিল,—

"আজও কি [illegible]খী তোমারি শিখানো গান ?
চাহি[illegible] তোমার মুখে জগত পেতেছে প্রাণ ?

বসন্তের রাণী তুমি, শরতও তোমারি পায়,
নিমেষে সঁপিয়া তনু আপনা বিকাতে চায়।

* * * *

আমি কতদিনে সখি! পাব তব দরশন?" ইত্যাদি

টুন্ করিয়া চাবির শব্দ হইল। চমকিয়া কবি মুখ তুলিল। হা রে ভ্রান্ত কল্পনা! এক মুখ হাসি লইয়া কল্যাণী ঘরে প্রবেশ করিল। শচীকান্ত বলিল, "কি রে? শিশিরের চিঠি এসেচে বুঝি? সে আস্‌চে?"

"সেই ভাবনায় ত ঘুম হচ্চে না" বলিয়া সে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "মা তোমায় ডাক্‌চেন। কাকাবাবুর শ্বশুর তোমাকে দেখ্‌তে এসেচেন যে।"

শচীকান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "কেন, বল্ দেখি, আমি এমন দর্শনীয় হয়ে উঠলুম? পশ্চিম বেড়িয়ে এসে আমায় কি আজকাল হাতি টাতি ব'লে ভ্রম হচ্চে না কি?"

কল্যাণী সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল, কহিল, "এমন কথা ত কখনো শুনিনি, দাদা, তুমি যেন কি হচ্চ!" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। "কাকাবাবু কাকিমা মারা গেলে তাঁর শ্বশুরই ত বাসন্তীকে নিয়ে যান, তা তিনি বিয়ের আগে তোমায় একবার না দেখে কেমন ক'রে বিয়ে দেবেন?"

"তা না হয় দয়া করে নাই দিলেন?"

"ও কি কথা, দাদা? গুরুজনকে কি অমন ক'রে বল্‌তে আছে? এস,—উঠে এস,—কাপড় চোপড় ছেড়ে নাও। তিনি ব্যস্ত হ'চ্চেন, বল্‌চেন,—আজই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন।"

শচীকান্তর মুখ এবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, এ বিবাহ লোভনীয়, সন্দেহ নাই! মাসিমার বিষয়ের অর্দ্ধাংশ, তা ছাড়া মেয়ের মাতামহও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সেখানে আদর আপ্যায়নের আশাও যথেষ্ট। মেয়েটি—বাসন্তী, দিব্য নাম! সহসা এমন একটি নাম ত শু'নতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই যে বসন্তের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সে একদিন দর্শন করিয়াছে, তাহার কাছে ধন, মান, নাম সকলই তুচ্ছ—সে মুখ যে ভুলিবার নয়! কল্যাণী তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার কহিল, "বাসন্তীকে দেখতেও বেশ। খুব সুশ্রী। ছোট্ট বোনটিকে আমার চতুর্দ্দোলে বেশ মানাবে।"

শুনিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শচীকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "বউ ত আর চতুর্দ্দোলা থেকে নাম্‌বে না! তার চেয়ে এক কাজ কর্ না, একটা মাটির সখীকে সাজিয়ে তাকের উপর তুলে রাখ্, মনে কর্‌বি, ওই তোদের বউ। যা, যা,—বল্‌গে যা, আমি বিয়ে করব না।"

এই সৃষ্টি-ছাড়া কথা শুনিয়া কল্যাণীর মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ভদ্রলোক বাড়ীতে—এমন সময় বিবাহের বর বলে, বিবাহ করিব না!

কথাটা শুনিয়া গিরিজাসুন্দরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে, এমন আহাম্মক আজকালের দিনেও জন্মায়? আসামীকে ডাকাইয়া কঠিন স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের কত বিষয় জান?"

উত্তর হই[illegible] জান।"

"তোমারই জন্য এই সব আজ সাত বচ্ছর ধরে নিজে তদারক ক'রে আস্‌ছি। ছোট বউয়ের বাপের হাতে কিছুতে দিইনি,—তা জানো?"

অপরাধীকে নীরব দেখিয়া তাঁহার মুখ রোষে লাল্‌ হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এমন সুযোগ ত্যাগ করলে চিরকাল পস্তাতে হবে, এ জেনো। বসন্ত এমন কিছু মন্দ নয়, যাতে তাকে মনে না ধরে। সবাই কি আর পরী হয়ে জন্মায়? কি বল?"

শচীকান্ত তথাপি কোন উত্তর দিল না। সে নিজের মনের কাছে যে উত্তর পাইয়াছে, তাহা মাসিমার প্রশ্নের অনুকূল নহে। গিরিজা কঠিন নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মানুষের মুখে তাহার অন্তরের সমাচার সুস্পষ্ট লেখা থাকে, তাহা পাঠ করিতে অভিজ্ঞ পাঠকের বেশী বিলম্ব হয় না। তীব্র হতাশা দারুণ বিরক্তির আকারে তাঁহার চিত্তকে একান্ত পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই বোনপোটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া ইহার জন্য প্রাণান্ত খাটুনি খাটিলেন, আর সে কি না অবহেলায় এই দারুণ পরিশ্রমলব্ধ ফল ছুড়িয়া ফেলিতে উদ্যত! কোথাকার আহাম্মক! একটু সামলাইয়া লইয়া আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মত হ'ল, সেটা ব'ল্লে হত না—ভদ্রলোক অনর্থক ব'সে আছেন যে।"

শচীকান্ত এবার কথা কহিল, নত মুখে বলিল, "আমি জানি, তুমি আমার জন্য অনেক করেচ, মাসিমা! আর এতে আমারই মঙ্গল, তাও জানি, কিন্তু আমার এ বিয়ে করবার উপায় নেই। কি করব বলো?"

গিরিজাসুন্দরীর ক্রোধ ঘোর বিস্ময়ে পরিবর্ত্তিত হইল ; কহিলেন, "কেন ?"

"আমি অনেক দিন হতে অন্যত্র বাগ্‌দত্ত।"

"কই, এ কথা এতদিন শুনিনি ত !" মাসিমার পাংশু মুখ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিল। শচী নতনেত্রে কহিল, "আমি লজ্জায় কারুকে ব'ল্‌তে পারিনি, মাসিমা, কিন্তু তুমি যদি রাগ কর, তাহলে—"

গিরিজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তুমিও যেমন, আমার বাসন্তীও তেমনি। তোমার নিজের মত যখন নেই, তখন থাক্ কাজ নেই।"

বাসন্তীর মাতামহকে গিয়া তিনি কহিলেন, "ভেবে দেখ্‌চি, শচী ও বসন্তে বয়সের তফাৎটা বড্ডই বেশী হয়। মেয়েও যখন তেমন বাড়নসই নয়, তখন না হয়,—কাজ নেই।"

মাতামহ ইতঃপূর্ব্বেই নিজের ইচ্ছামত একটি পাত্র স্থির করিয়াছিলেন, গিরিজাসুন্দরীর ভয়েই তাহা ফুটিতে পারেন নাই, খুসি হইয়া তিনি বলিলেন, "ছেলেটিকে বারান্দা হতে দেখলাম, আমারও তাই মনে হল বটে।"

২৪

ব্যাপার চুকিল বটে, কিন্তু অনেকখানি বিপর্য্যয় সে ঘটাইয়া দিয়া গেল। যে মুহূর্ত্তে শচীকান্ত এ বাড়ীর কনিষ্ঠ জামাতৃ পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইল, সেই সময় হইতেই যে তাহার আসন এখানকার জমি[illegible] হাত নীচে নামিয়া পড়িল, এ কথাটা

শচীকান্তর বুঝিতে বাধে নাই। বাসন্তীর বিষয় অল্প নয়, আর বিষয়ও নিগরচা, মাসিমার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্তে তাহা ছোট খাট জমিদারীতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। মেয়েটিকে গ্রহণ করিলে, লক্ষ্মীকে ঘরে আনা হইত, সন্দেহ নাই। মনের মধ্যে দ্বিধার একটা প্রবল সংগ্রাম চলিতেছিল। মাসিমা প্রথম হইতেই তাহাকে এ আভাস দিয়া আসিয়াছেন, এ পক্ষে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। সেও অনেকবার এই ক্ষুদ্র বাসন্তীকে নিজের ভবিষ্যৎ প্রিয়ার পদে অভিষেক কল্পনা করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু হায়, সমস্ত কবিতা, সমুদয় কল্পনা যে সেই একখানা চকিতে-দেখা মুখ অধিকার করিয়া লইয়াছে। কেমন করিয়া সে তাহার হারাণ চিত্তকে খুঁজিয়া আনিয়া অপরকে দান করিবে?

জগতে যত অদ্ভুত বস্তু আছে, তাহার মধ্যে কবি-চিত্তই বোধ করি, সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর! ক্রুদ্ধ সমুদ্র-তরঙ্গের উন্মাদ তাণ্ডব, ভীষণ ঝটিকার সৃষ্টিসংহারিণী মূর্ত্তি যাহাদের চক্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করে, তাহাদের চিত্তে সহজ সরলের চেয়ে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য বস্তুই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আকাশে ফাঁদ পাতা, তারকার মালা গাঁথা, সাগর ছেঁচিয়া রত্ন আহরণ করার মত একটা অসম্ভব কল্পনার উপর নিজের সমুদয় ভবিষ্যৎটাকে এক কথায় নিঃসার করিয়া নিঙড়াইয়া ফেলিতে এই স্বপ্নপরায়ণ কবি ভিন্ন জগতের অপর কোন লোকই পারে না। কবি যেখানে মধু মক্ষিকার গুঞ্জন-গানে ভাব-বিভোর, সাংসারিক সেখানে মধুচক্রের মধু আহরণে রত। কবি শচীকান্ত তাহার নিরুদ্দিষ্টা প্রিয়ার স্মৃতিকেই বড় করিয়া দেখি[illegible] ...ন না, তাহা

না হইলে কল্পনার সহিত বাস্তবের দ্বন্দ্ব বাধে না, জীবনটা নিতান্তই গদ্যময় হইয়া উঠে।

সন্ধ্যালোক-বিস্তৃত বারান্দায় স্বহস্ত-সজ্জিত ফুলগাছের টবগুলার নিকট একখানা চৌকিতে বসিয়া শচীকান্ত ভাবিতে লাগিল। আকাশ ভরিয়া নক্ষত্র উঠিয়াছে, তাহারা তাহার চিন্তা-ভারাকুল মস্তকের উপর নীরব উপহাসের হাসি হাসিয়া জ্বলিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ পবন তাহার মনের বার্ত্তা বহন করিয়া কচি কিশলয়গুলির কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিতেছিল। অদূরে গাছের ডালে "পিউ—কাঁহা" রবে পাপিয়া সুর সাধনা করিতেছে। কল্যাণী আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। আজিকার ব্যাপারে সে একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া নিজের ঘরে আসিয়া যখন খোকার জন্য দু কাটির গলাবন্ধ বুনিতে বসিয়াছে, এমন সময় গিরিজাসুন্দরী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সব ত শুন্‌লে, এখন শচীর মনের কথা জেনে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে ফেলো। এত দিন বল্লেই চুকে যেত। এখনকার ছেলেপিলেরা গুরুজনের কাছ থেকে সব কথা লুকোতেই তো ভালবাসে।"

কল্যাণী মাকে চিনিত। সে বুঝিল, তিনি যখন যেদিকে ঝোঁক দেন, তখন তাহার একটা পুরাপূরি ব্যবস্থা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না। তবু সে সাহস করিয়া বলিল, "দাদাকে ভাল করে বুঝিয়ে মত করালেই ভাল হয় না মা? বাসন্তীকে বিয়ে করলেই ওঁর পক্ষে যে ভাল হত।"

মাতা ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন, "সে কথা আমিও জানি, সেও জানে। ... যখন আগে থেকে অন্য লোককে কথা

দিয়েচে, তখন সে কথার কি দাম নেই? মানুষের কথা নড়ে না। তুমি ওকে জিজ্ঞাসা পড়া কর। তোমার থেকে কিছু ওকে দিতে হবে আর কি! তা হোক, ঈশ্বরের কৃপায় তোমার ত আর অভাব নেই!"

কল্যাণী আসিয়া ডাকিল, "দাদা—"

"কে? কল্যাণ, আয়!" নিকটে আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া শচীর পাশে সে বসিল। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। আজিকার ব্যাপারে এখানকার সকলের নিকটই শচীকান্ত একটু কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। কল্যাণীও একটা বাধার হাত ছাড়াইতে পারিতেছে না,—কি বলিয়া কথাটা সে আরম্ভ করিবে? দাদা তাহাকে ত কিছু বলে নাই। ভাবিয়া সে শেষে বলিল, "তবে কি ভাজের মুখ না দেখেই যেতে হবে, দাদা? জানো ত, গেলে আর সহজে আমার আসা ঘট্‌বে না।"

কল্যাণীর স্বরে শচীকান্ত ব্যথা পাইল। ঈষৎ লজ্জার সহিত সে তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "কি করি কল্যাণ, উপায় কৈ?"

কল্যাণী সূত্র পাইয়া কহিল, "বেশ, তবে সেই মেয়েকেই বিয়ে কর। মা'র ত আর তাতে অমত নেই। কে সে?"

শচীকান্ত চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরে স্মৃতির তরঙ্গ গভীর আবেগে উছলিয়া হৃদয়-তটে আঘাত করিতেছিল। ব্যাকুল চিত্ত স্ফীত বক্ষ সমুদ্রের মতই আর্ত্তস্বরে কহিতেছিল, কোথায় সে? সে কোথায়?

সহসা একটা কথা কল্যাণীর মনে পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "তার নাম কি দাদা, রাণী ?"

"কে বল্লে ?" শচী ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল।

"তোমার অনেক কবিতায় দেখছিলুম 'রাণী' নামটা আছে,—

"বজ্রানল লিখে যায় পাষাণে যে রেখা রাণি,
মুছিতে কি পারে তাহা শত বরষার ধারা ?"
"আয় রাণি, দে যা দেখা, ভাঙ্গিস্‌নে ভুল,
ক্ষণিক মিলন হোক্ চির অনুকূল।—"

এমনি কতকগুলো কবিতা পড়েছি।"

শচীকান্ত ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় মুখ তুলিয়া চারি দিকে চাহিল। চাঁদের আলো সেই অতীত দিনের প্রভাত-রৌদ্রের কথা মনে পড়াইয়া দিল। অস্ফুট-স্বরে প্রীতিবিহ্বল কণ্ঠে সে কহিল, "তার নাম কমলা।" বলিতে সর্ব্বশরীর যেন তড়িৎ স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল।

"কমলা! বেশ নামটি ত! কাদের মেয়ে সে, দাদা? খুব সুন্দর, বোধ হয়?"

"সুন্দর বলে থামলে তাকে অপমান করা হয়। সে রূপ কল্পনার অতীত!"

কল্যাণী চমৎকৃত হইল, কহিল, "তবে দেরি কেন করছো, দাদা? শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়ে করে তাকে আনো না, লক্ষ্মীটি! আমার তাকে বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে করচে। নিশ্চয় তার সঙ্গে আমার খুব মিল হবে।"

"সে কোথায়, [illegible] তাকে কোথায় পাব? অভিশপ্তা

কমলার মত সে কোন্ অতল সমুদ্রে তলিয়ে গেছে, তা' কে ব'লে দেবে ?"

কল্যাণী এ হেঁয়ালির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, সভয়ে বলিল, "সে কি বেঁচে নেই ?"

"না, না, সে বেঁচে আছে বই কি,—সে কথা ত বলিনি।"

হাঁফ্ ছাড়িয়া কল্যাণী কহিল, "আহা, তাই বল। তবে কি হয়েচে ?"

তখন শচীকান্ত সকল কথাই তাহাকে খুলিয়া বলিল—কেবল মাত্র তাহারা রাঢ়ী শ্রেণী, সেইটুকুই সে ভাঙ্গিতে পারিল না।

সব কথা শুনিয়া কল্যাণী একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কহিল, "তবে ত তাকে খুঁজে পাবার কোনই আশা দেখিনে, ছোটদা! কতদিন হয়ে গেল, কোথায় তারা গেছে, কে জানে। এত দিনে তার বিয়ে হয়েচে কি না, তাই বা কে বলতে পারে ?"

কল্যাণী সহসা একটা অস্ফুট বেদনার ধ্বনি শুনিতে পাইল, "ও কথা বলিস্‌নে, কল্যাণি! আমি নিশ্চয় তাকে পাব। আমার মন বলে, সে আমারই প্রতীক্ষা কর্‌চে।"

কল্যাণী মুখ তুলিয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল, প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় দুই স্নেহপূর্ণ নেত্র দাদার মুখের উপর স্থাপন করিয়া স্নেহ-তিরস্কারের সহিত কহিল, "না ছোট্‌দা, অমন ক্ষ্যাপামী করো না। কোথায় কমলা, তার ঠিক নেই—তুমি বাসন্তীকে বিয়ে কর। পৃথিবীটা সত্যিকার, এটা ত গল্পের কেতাব নয়। সে মেয়ের এখন প্রায় পনের ষোল বছর বয়স হ'ল, সে কক্ষণো এত দিন আইবুড় নেই।"

শচীকান্ত নীরবে উদ্‌ভ্রান্তভাবে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল। কল্যাণীর কথাগুলায় অখণ্ডনীয় সত্যের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল ; ইহাকে যুক্তি দ্বারা কাটান যায় না, তাই সে ঔদাস্যে উড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কল্যাণী তাহার মৌনকে সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উঠিয়া গেল।

গিরিজাসুন্দরীর প্রকৃতি সাধারণের চেয়ে কতকটা বিভিন্ন ধরণের। কল্যাণী যখন আসিয়া জানাইল, শচীকান্ত বাসন্তীকে বিবাহ করিতে সম্মত তখন তাঁহার চিত্ত হইতে এই ঈপ্সিত বিবাহ সম্বন্ধে সমুদয় আকর্ষণ সরিয়া গিয়াছে। দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া তিনি কহিলেন, "আর হয় না।" সবিস্ময়ে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা ?"

"ভদ্রলোককে 'না' বলে যখন ফিরিয়ে দিয়েছি, আবার কোন্ মুখ নিয়ে তাঁকে আমি ডাকতে যাব ? ওর পছন্দ মেয়ে না পাওয়া যায়, অন্যত্র বিয়ে হোক, কথা আমি বদলাব না।"

গিরিজাসুন্দরীর দেবর-কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করার দিন হইতেই শচীকান্ত নিজের জন্য কতকটা চিন্তিত হইয়া পড়িল। বসিয়া থাকিলেও চিরদিন চলিতে পারে, এমন উপায় যখন সে ত্যাগ করিল, তখন কিছু ত একটা উপায় করা চাই। 'ক্ষণিকের দেখা' যন্ত্রস্থ—বিপুল উদ্যমে সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপনের আয়োজন করা হইতেছে। কিন্তু এ দেশে এখনও এমন সময় আসে নাই যে, লোকে কবিকে চিনিবে, আদর করিবে। তবে কি উপায় ? চাকরি ? অধীনতা ? এই শান্ত পল্লীভবনের বাধাহীন বিশ্রাম ভঙ্গ করিয়া কর্ম[illegible]াহল ক্লান্ত সহরের বদ্ধ গৃহে আত্ম-নির্ব্বাসন।

বড় কঠিন ত্যাগ—তবু দিনের পর দিন বিদায়-কালে বলিয়া যাইতেছিল,—পথ খুঁজিয়া লও, আর কত দিন!

শেষকালে একদিন মাসিমার কাছে কোন অছিলায় বিদায় লইয়া সে কলিকাতা যাত্রা করিল। কলেজে থাকিতে কয়েকটি ছেলের সহিত আলাপ হইয়াছিল। দুই একজনের সঙ্গে চিঠি পত্রও চলিত, তাহাদের মধ্যে একটি যুবক সম্প্রতি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটশিপ্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বন্ধুকে সাদরে সে গ্রহণ করিল। এই ঘটনা সহসা শচীকান্তকে যেন জাগরিত করিয়া দিল। মনে পড়িল, কাশীর সেই জ্যোতিষী তাহাকে বলিয়াছিল, "তুমি হাকিম হইবে।" কর্ত্তব্য স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। মনের সহিত যখন মিলিয়া যায়, তখন অতি ক্ষুদ্রতমের উপদেশ বা আদেশ আমরা গ্রহণ করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু মন যখন নিষেধ করে. দেবাদেশও তখন পরিত্যাজ্য বোধ হয়।

শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনে সহসা এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার হাত ধরিল। নারী হস্তের মত কোমল স্পর্শে শচীকান্ত চকিত হইয়া চাহিতেই একখানা অত্যন্ত পরিচিত সানন্দ মুখ তাহার দুই চোখের বিস্মিত দৃষ্টিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। সে মণীশ।

মণীশকে গ্যাসালোকে সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার হাস্যময় চক্ষু প্রীতি-বিকশিত,—পূর্ব্বাপেক্ষা যেন মুখের উদারতা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। যৌবনের পূর্ণ তেজ একটি সলজ্জ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া তাহার উপর যেন একটা স্নিগ্ধ গোলাপি আলোরই রেখাপাত করিয়াছিল। শচীকান্ত আজ তাহার চিরদিনের বন্ধুকে যেন নূতন করিয়া দেখিল।

বন্ধু কহিল, "বাড়ী চল, আজ আর ছাড়চিনে। কতদিন পরে দেখা হল, এখন কি ছেড়ে দেওয়া যায়?"

শচীকান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহাতে অসম্মত হইতে পারিল না। মায়ের মৃত্যুর পর যখন কাশীর ফেরত সে বাড়ীতে উঠিয়াছিল, বড় বধূর ব্যবহার তাহার ভাল লাগে নাই। মা হারাইয়া সে বুঝিয়াছে, সেই দরিদ্র গৃহে মা তাহার জন্য কতখানি যোগাইয়া রাখিয়াছিলেন। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, এ বিষয়ে বড়বধূরও দোষ দেওয়া চলে না। গরীবের ঘরে মা তাঁহার ছেলেটির সুখের জন্য যাহা পারেন, সাধারণে সাধারণভাবে অন্যকে সেটুকু যোগাইবে কিরূপে?

গাড়ীতে উঠিয়া শচীকান্ত কহিল, "তোমার 'হিন্দু-বিজ্ঞান' বইটার ত খুব নাম হয়ে গেছে। দেখলুম, মস্ত বড় সব পণ্ডিতের দল প্রশংসা-পত্র দিয়েচেন। ও কিন্তু তুমি বৃথা সময় নষ্ট করেচ, মণীশ! সাধারণের কাছে নাম নিতে চাও ত কবিতা লেখ, গল্প লেখ, পার, নাটক লিখে অভিনয় কর্‌তে দাও। দু দশটা পণ্ডিত ভট্‌চায্যির সীমায় যে যশ বদ্ধ রইল, পেঁটরায় পোরা জহরতের মতই শুধু সে নিজস্ব!"

মণীশ অন্তরে ব্যথা পাইল। সে এই পুস্তকখানির জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছে। সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বয়ং ও তাহার খুল্লতাত এ বিষয়ে তাহার সাহায্য করিয়াছেন। শচীকান্ত এতখানি কঠোর অবজ্ঞার সহিত এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিল! সে কহিল, "সাধারণের কাছে যশ পাওয়াই কি লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য?"

"তা বই আর কি! এক আত্ম-বিনোদন, আর খ্যাতি। তা সে কথা এখন থাক্—তারপর মনীষার খবর কি? না, না, বড় অন্যায় হচ্ছে কিন্তু, আর দেরি না।"

মণীশ দৃষ্টি নত করিল, কোন মতে লজ্জা ঠেলিয়া কহিল, "আমিও ত সেই কথাই বল্‌চি, আর দেরি করা মানায় না, কবিকুঞ্জ কি শূন্য থাকা সাজে?"

"কবিকুঞ্জ শূন্য নয় মণীশ, তা পূর্ণই আছে। এ অসম্পূর্ণতায় পরিপূর্ণ, বিচ্ছেদে মিলন, এ হারাণ রতনের স্মৃতির মন্দির, কমলার কমলাসন!"

"কার?"

"কমলার।"

"ক-ম-লার?"—মণীশ চমকিয়া উঠিল। "কে,—কে?" তাহার স্বর সন্দিগ্ধ।

শচীকান্ত কহিল, "কেন, তোমায় কি তার নাম বলিনি?"

২৫

বাড়ী ফিরিয়া মণীশ দেখিল, সকলই গোল হইয়া গিয়াছে,—খুড়িমা বাড়ী নাই। ত্রিবেণীতে করুণাময়ীর পিত্রালয়। বহুদিন সেখানে তাঁহার যাতায়াত ছিল না, মা বাপ কেহই বর্ত্তমান নাই। এমন সময় হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ম্মস্থল হইতে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছেন, জীবন সংশয়, একবার ভগিনীকে দেখিতে চাহেন। শিবনারায়ণ তৎক্ষণাৎ স্ত্রী পুত্র সঙ্গে শ্বশুর গৃহে যাত্রা করিলেন। কিন্তু [illegible]লাকে কোথায়

রাখিয়া যাইবেন? লইয়া যাওয়াত চলে না। যদিও সেখানে কমলার মাতুলালয়, তথাপি কেহ সেখানে আছে, কি না আছে, জানা নাই। অগত্যা বিন্ধ্যবাসিনীর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। মণীশ তাঁহাদের অবর্ত্তমানে শূন্য গৃহে বসিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন বোধে শীঘ্র ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া স্ব-প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি দেখিতে বাহির হইল। তাহার অনুপস্থিতিতে শ্রীপতি বাবু ইহার তদারকভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিবনারায়ণ ও ভক্তিনাথ উভয়েই মণীশের কার্য্যভার অংশতঃ বহন করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

দ্বিপ্রহরে শচীকান্ত মধ্যাহ্ন-নিদ্রা ব্যতীত দিন কাটাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এখন শয্যাত্যাগ করিয়া নিদ্রালস দৃষ্টি সম্মুখের মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিল। হেমন্ত প্রকৃতি ইতঃমধ্যেই শীত জড়ভাব ধারণ করিয়াছে। দ্বিপ্রহরের হাওয়া রুক্ষ, কিন্তু তপ্ত নহে। অলস চিত্তে জড়তা বহাইয়া দিয়া মন্দ গতিতে বায়ু বহিতেছিল। পাশের চালাঘরের অধিবাসীদিগের অঙ্গনে একটি পরিপুষ্ট গাভী আলস্যে শয়ন করিয়া মুদ্রিত নেত্রে রোমন্থন করিতেছে। কোথায় একটা অদৃশ্য চক্রের স্থিতি বারতা মধুমক্ষিকাদলের দূর হইতে ভাসিয়া-আসা গুন্ গুন্ ধ্বনিতে বহিয়া আনিতেছিল। শচীকান্ত জানালার ধারে আসিয়া পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে চাহিল। বীচি-বিক্ষেপহীন স্থির সমুদ্রের মত অনন্ত নীল স্বর্ণাভ [illegible] বৃহৎ নীলকান্ত মণিখণ্ডের মতই জ্বলিতেছিল। একটি পিপাসাতুর পক্ষী দূর হইতে উড়িয়া

আসিতেছে, দুই একটি বন্য কপোত বৃক্ষশাখায় ক্লান্ত পক্ষ ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। পশ্চাতে একটা মৃদু শব্দ পাইয়া শচীকান্ত মুখ ফিরাইল,—এ কি! পৃষ্ঠবিলম্বী কৃষ্ণকেশভার মধ্যবর্ত্তিনী এ মূর্ত্তি কাহার?

তাহার বক্ষঃশোণিত নিশ্চল হইয়া পড়িল। মুকুল কুসুমে পরিবর্ত্তিত হইলেও চিনিতে বাধে না। সেই বিদ্যুদ্দামতুল্য যুগল নেত্রতারকা, দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের অদর্শনেও অবিস্মৃত মধুর মুখ! এ যে তাহার সেই হারান রতনেরই প্রতিকৃতি! সেই অনিন্দ মুখ, সেই সুললিত গঠন। তাহার সর্ব্ব শরীরের স্নায়ু সহসা এমনই স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, সে ভাল করিয়া তাহার দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি সম্মুখবর্ত্তিনীর সেই চির-ঈপ্সিত মুখের উপর ধরিয়া রাখিতেই পারিল না। গভীর স্বরে সে কহিতে গেল, "এতদিনে দেখা দিলে কি? এলে কি তুমি?" কিন্তু একটা অর্দ্ধস্ফুট সুর মাত্র তাহার কম্পিত ওষ্ঠাধরের গণ্ডী অতিক্রম করিল। পরক্ষণে সে যখন জোর করিয়া আপনার নত নেত্র উত্তোলন করিল, তখন আর কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাইল না। সম্মুখের মুক্ত দ্বার পথে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খর করজালে চোখ ধাঁধিয়া উঠিল মাত্র। শচীকান্ত মূঢ়ের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তনেত্র মেলিয়া ভাবিল, মরুভূমে মরীচিকার ন্যায় সে এ কি দেখিল! জাগিয়াও কি স্বপ্ন দেখা যায়?

কিন্তু নিজের দৃষ্টিকে সহজে অবিশ্বাস করাও যায় না। এক সময় সে গৌরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল; "আজ কে বেড়াতে এসেছিল রে?" গৌরী মাথা নাড়িয়া কহিল, "না ত, কেউ ত না।"

"তুই ঠিক জানিস্‌, কে-উ আসে নি ?"

"খুব জানি, কেউ না।" শচীকান্ত নীরব রহিল। কল্পনা কি প্রভাতকে মধ্যাহ্নে পরিবর্ত্তিত করিতেও সক্ষম! এ সেই— কিন্তু সে বালিকা মূর্ত্তি ত নয়!

সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে দুই বন্ধুতে স্ব স্ব স্থানে যাত্রা করিল। শচীকান্ত আজ অত্যন্ত চুপ্‌চাপ্‌। মণীশ বহুক্ষণ পরে এক সময় চেষ্টা করিয়া কথা কহিল, "তোমায় আমার একটা কথা বলা হয় নি।"

শচীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

স্বরে কৌতূহলের লেশমাত্র ছিল না। মণীশের কথা এমন কি হইতে পারে?

মণীশের চোখে মুখে অতি কোমল মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে নতনেত্রে কহিল, "মনে করেছিলাম, খুড়িমার কাছেই শুন্‌বে, তাই আর কিছু বলিনি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে কাশীর ঘটনাটা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলিয়া গেল। নিজের কথা কিছুই বলিল না; কতকটা লজ্জায়, আর কতকটা বন্ধুর তামাসার ভয়ে, সে তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে কি না, এ কথাটাও বলিল না। নিস্পন্দ থাকিয়া শচীকান্ত সকল কথা শুনিল, তার পর শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটির নাম ?"

মণীশ মৃদু হাসিল, কহিল, "এরও নাম কমলা।"

অকস্মাৎ শচীকান্তর বক্ষে মস্তকে সর্ব্ব শরীরে যেন সহস্র সহস্র জ্বালাময় বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। রুদ্ধ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "সে এখন কোথায় ?"

"তোমাদের বাড়ী খুড়িমা তাকে রেখে গেছেন, শুনলুম। তোমার হারানো কমলাকে যদি খুঁজে পেতে ত' বেশ হত শচি—।

গাড়ীর কম্পিত আলোক অকস্মাৎ যেন জ্যোতিঃহারা হইয়া গেল। মন্দগতি লৌহযান সদর্পে প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল। কুলি হাঁকিল, "নৈহাটি।"

মণীশ নামিয়া পড়িল। একটা বিদায় সম্ভাষণও সে বন্ধুর নিকট হইতে পাইল না। ব্যথিত বক্ষে ধীর পদে সে চলিয়া গেল। তখন নির্জ্জন কক্ষের অনাবৃত ভূমে বিদ্ধ বন্যজন্তুর ন্যায় লুটাইয়া পড়িয়া শচীকান্ত আর্ত্তস্বরে উচ্চারণ করিল,—"কমলা, কমলা।" সে স্বর মর্ম্মভেদী হতাশার আকুল ক্রন্দনের মতই জনহীন দারু কক্ষে পুনঃ পুনঃ আহত হইল।

২৬

হেমন্তের শুভ্র জোৎস্না ফুরাইয়া আসিয়াছে। আসন্ন শীতের আশঙ্কা জীব-জগতের নিম্নোচ্চ সর্ব্বস্তরেই অল্প বিস্তর প্রকটিত। গৃহস্থ রমণীরা সংসারের সঞ্চিত ছিন্ন বস্ত্র বিছাইয়া রঙ্গিন সূত্রদ্বারা তাহার উপর বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তখনও পল্লীগ্রামে জর্ম্মণির সস্তা র‍্যাপারের প্রচুর আমদানি হয় নাই।

শুক্ল পক্ষ চলিয়া যায়। নূতন চালে নূতন গুড়ে নবান্ন ক্রিয়া সাঙ্গ হইবার পর ঘরে ঘরে তখন বড়ি দিবার শঙ্খ-ধ্বনি উঠিতেছে। প্রতি ছাদে শুভ্র বস্ত্রে দূর্ব্বা-সিন্দুর সজ্জিত [illegible] কোরার "বুড়া-বুড়ি" দোদুল্যমান। পল্লীবালকগণ এখন সেখানে জড় হইয়া

তালের কল কাটিয়া খাইতেছে, কালীপূজার অবশিষ্ট দুই একটা তুব্‌ড়ি বা আছাড়ে-পট্‌কার শব্দে সীতারাম, প্রতাপাদিত্যের, আমল চকিতে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

গৌরীর বিবাহ আসন্ন। ভট্টাচার্য্য-গৃহে তাহার আয়োজন চলিতেছে। পাড়া পড়সীরা অবসরমত জুটিয়া বাড়ীর লোকের সহিত ডাল বাচিতেছে। সুপারি কাটা, সলিতা পাকান, মসলা-ঝাড়া প্রভৃতি সমুদায় খুঁটিনাটি কাজগুলা সারিতে সারিতে গল্পের মজলিস জাঁকিয়া উঠিয়াছে। যে যেমন লোক, সাধ্যমত সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত ছিল না। পুরোহিতগৃহের কর্ম্মে সকলেরই হাত পড়া চাই।

বিন্ধ্যবাসিনীর আজকাল অবসর বড়ই অল্প। তথাপি তাঁহার মৌন হৃদয়ে কি যে একটা শত মণ ভার চাপিয়া আছে সে পাষাণ-খানা কোন মতেই যেন নড়িতে চাহে না। চোখের জলে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলন্ত চুল্লী হাঁড়ি কুড়ি সমেত ঝাপ্‌সা হইয়া উঠে।

গৌরী নিজের বিবাহের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিদ্রোহ করিয়া করিয়া এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎসবের আয়োজনটা তাহাকে হয়ত বিবাহ সম্বন্ধে একটু কৌতূহলীও করিয়া থাকিবে!

যেদিন পাত্র আশীর্ব্বাদ করা হইবে, সেইদিন হইতে চতুর্থ দিবসের প্রথম প্রহরে বিবাহ-লগ্ন। গৌরীকে সে দিন কোন শাসনই আটক করিতে পারিল না। এক সময় সে কাঁখের ছেলেটাকে ভূমে নামাইয়া কর্ম্মে ব্যস্ত অভিভাবিকাদের মাঝখান হইতে সরিয়া পড়িল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চারিদিক তখন ঝাঁঝাঁ করিতেছে, পথ প্রায় জনহীন, কেবল একটা গৃহস্থ গৃহের দ্বারে

দাঁড়াইয়া ভিন্ন গ্রামের একজন ভিক্ষার্থী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"কোথায় ছিলি ও নীলমণি,
আয়রে বুকে আয়!
নয়নমণি হারিয়ে আমার নয়ন জলে বুক ভেসে যায়,
ওরে, নয়ন জলে বুক ভেসে যায়।"

গৌরী সহসা শুনিল, তাহার পিছনে, খুব নিকটে কে বলিল, "উমাকান্ত সার্ব্বভৌম মশায়ের বাড়ী কোন দিকটায় বল্‌তে পার মা?" সে এই মাতৃসম্বোধনে নিজেকেই সম্বোধিত বোধে ফিরিল, কিন্তু পথে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় একটু ভীতও হইল। এখনই কেহ দেখিলে বাড়ীতে খবর দিয়া দিবে। কয়েদ-খালাসী দাগী চোরের উপর পুলিশ যেরূপ সন্দেহ-সতর্ক দৃষ্টি রাখে, পাড়াশুদ্ধ লোক আজকাল এই বিবাহ-পণবদ্ধা মেয়েটির উপর তেমনই পর্য্যাবেক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। গ্রামের নিকটবর্ত্তী বর, পাড়ার মেয়ের নিন্দা উঠিয়া বিবাহ ভাঙ্গিলে সকলেরই তাহাতে অপমান। তাই স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত নরনারীগণ বড়বধূর গুপ্তচরের কাজ লইয়াছেন। একজনের নিকট হইতে খবর গিয়া পৌছিতেছে, অমনই তাহার উপর লাঞ্ছনার ঝড় বহিতেছে। যাহারা সর্ব্বদা তিরস্কার সহে তাহাদের ইহাতে অপমান বোধও কমিয়া যায়, গৌরীর পক্ষেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। গঞ্জনা যত বৃদ্ধি পাইতেছিল, ততই তাহার রোখও চড়িয়া উঠিতেছিল।

যে ব্যক্তি পিছন হইতে তাহাকে সম্বোধন করিলেন, তিনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বেশভূষায় তেমন পারিপাট্য না থাকিলেও

প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ললাটে চিন্তার ছায়া রেখাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উচ্চ হৃদয় বৃত্তির চিহ্ন পরিব্যাপ্ত উজ্জ্বল নেত্রতারকার মধ্যেও সেই সুগভীর চিন্তা বিষণ্ণতার আকারে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। সে মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের চিত্ত মুহূর্ত্তে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। গৌরী দেখিল, এ ব্যক্তি তাহার অপরিচিত! বোধ হয়, ভিন্ন গাঁয়ের লোক হইবে, নহিলে তাহার অচেনা হইত না। নূতন লোক কে তাহার দাদামশায়ের বাড়ী খুঁজিতেছে? একবার ইচ্ছা হইল, ভুল পথ দেখাইয়া দেয়! কিন্তু তখনই লজ্জা বোধ হইল। দাদামহাশয় মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন যে। সে দক্ষিণে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "এই দিকে।"

আগন্তুক প্রথমে মেয়েটির দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন নাই, এখন মাথা তুলিয়া কহিলেন, "অনেক দিন আসি নি কি না, তাই পথ ঠাহর করতে পারছিলাম না। তাঁরা এখানে আছেন ত?"

গৌরী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বিরক্ত হইল। এখনই কে আসিয়া পড়িবে—আজ তাহার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ! তথাপি মনে কি একটা কৌতূহল জাগিল এবং ভাবী শ্বশুরবাড়ীর কেহ নয়, বুঝিয়া প্রসন্ন চিত্তে কহিল, "আপনি তাহলে অনেক দিন আগে এখানে আসতেন? দাদু ত এখন এখানে থাকেন না, শুধু বড় মামা থাকেন। তিনিও আজ বাড়ী নেই।"

আগন্তুক এই কথা শুনিয়া স্থিরনেত্রে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। গৌরী চোখ তুলিতেই তাঁহার দুই

নেত্র-তারকা ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। দৃষ্টি নত করিয়া একটু দুঃখিতভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি—ভক্তিনাথ, কোথা গেছেন?"

"তিনি—" বলিয়া গৌরী একটু থামিল, "সে একটা কাজে গেছেন।" বলিয়াই সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। শীগ্‌গিরই আসবেন। আসুন না। আমি বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি—" বলিতে বলিতে সে গলির মধ্যে অগ্রসর হইল।

আগন্তুক আর কিছু বলিলেন না, নীরবে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া কি যেন একটা বহুদিনের হারান স্মৃতিকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেন কি একটা মনে পড়িতেছিল, অথচ সেট সম্পূর্ণ স্মরণও হয় না।

সহসা গৌরী তাহার কাঁধের উপর কাহার মৃদু স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিল। আগন্তুক উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিলেন। সহসা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সেই বাড়ীর মেয়ে? কি বল্লে মা,—সার্ব্বভৌম মশায় তোমার কে হন?"

"দাদু? আমার দাদামশাই হন।"

"ভক্তিনাথ তোমার মামা বল্লে বুঝি?"

"হাঁ।" বলিয়া গৌরী একটু দ্রুতপদে চলিল। দূর হইতে বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাঁচে। আগন্তুকও তাহার দেখাদেখি নিজের মৃদু গতি একটু বর্দ্ধিত করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে দুই চারিবার চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতে ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার তিনি কহিলেন, "তাহলে তুমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌ... ত্রী?"

দৌহিত্রী বলিতে কি বুঝায়, সে কথা বালিকা জানিত না। সে নীরব রহিল। গতি একটু হ্রাস করিয়া ঈষৎ ঘাড় ফিরাইয়া প্রশ্নকর্ত্তার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিল। তাঁহার ব্যগ্র দৃষ্টির মধ্য হইতে একটা ব্যাকুল স্নেহের ক্ষুধা অভিব্যক্ত হইতেছিল। তিনি তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া হঠাৎ গতি বন্ধ করিয়া তাহার একখানা ক্ষুদ্র হাত নিজের হস্তে ধারণ করিলেন, কহিলেন, "তোমার নাম কি ?"

অপরিচিতের এ ব্যবহার গৌরীর মত মেয়েকেও বিস্মিত করিয়াছিল। সে বিস্ময়ে দুই চোখ তাঁহার উদ্বেগ-চঞ্চল মুখের উপর স্থাপন করিয়া উত্তর দিল "গৌরী।"

আগন্তুক তাহার সেই হাতটা চাপিয়া ধরিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন, "তা হলে বিন্ধ্যার মেয়ে!"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রচুর কম্পনে উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অপর কোন মেয়ে হইলে হয় ত অপরিচিতের এরূপ ব্যবহারে একটু ভীত হইত, কিন্তু গৌরীর মনে ভয়ের লেশ ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "না ত, আমি ত বিন্ধ্যার মেয়ে নই,—তিনি যে আমার মাসিমা।"

আগন্তুক যেন একটা ভাড়তাঘাত প্রাপ্ত হইলেন; চমকিয়া বালিকার হাত ছাড়িয়া তাহার মুখের দিকে তিনি ব্যাকুল নেত্রে চাহিলেন, কহিলেন, "তবে তোমার মা কে ?"

"মা! আমার মা নেই।" এই কথা অতি অগ্রাহ্যভাবে বলিয়াই গৌরী [illegible] পুনঃ প্রশ্নের পূর্ব্বেই আবার কহিল,

"সকলেই বলে,—আমি জন্মেই আমার মাকে খেয়ে ফেলেচি। দাদু বলেন, মানুষ কি মানুষকে কখনও খেতে পারে? মা - স্বর্গে গেছেন।"

আগন্তুকের সর্ব্বশরীর কি এক অনির্দ্দেশ্য আবেগে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নিজের উভয় হস্ত মর্দ্দন করিয়া যেন একটা দুরাশাপূর্ণ সুগভীর মানসিক আলোড়নকে সুস্থির রাখিবার চেষ্টা করিলেন। একটু পরে একবার গৌরীর রৌদ্রতপ্ত রক্তিম মুখখানির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তোমার মা নেই—বাবা আছেন?"

"উঁহু"—বলিয়া গৌরী সবেগে ঘাড় নাড়িল, "আমার বাবা কথ্‌খনোই ছিলেন না। বড় মামী বলেন, "বাপ যে থেকেও নেই। তা নৈলে পরের আপদ আমরা কেন পোয়াই?" কে জানে বাপু, আমি ত জানি ন', বাবা কোথায় আছেন। থাক্‌লে বোধ হয় ভাল হত। ঐ দেখুন, বেল্‌তলার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, ওরই ঠিক সাম্‌নে ওই বাড়ীটা।"—এই বলিয়া যেমনই সে গমনোদ্যত হইয়া পিছন ফিরিতে গেল, অমনি দুই ব্যাকুল বাহুপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়া একটি অশ্রুমথিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ তাহার বিস্মিত কর্ণকুহর ধ্বনিত করিয়া কহিল, "মা, মা, মা আমার। আমিই তোর অভাগা বাপ!"

২৭

নন্দকিশোর লাহিড়ী উমাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রথম জামাতা, সুদূর পশ্চিমে সরকারী ডাক্তার হইয়া প্রথম যাত্রাকালে

বালিকা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই বটে, কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আত্মীয় বন্ধুদের অনেক নিন্দা তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়াই স্ত্রীকে নিজের সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। পত্নী তখন সবে মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসরের কিশোরী।

একে বালিকা, তাহাতে পল্লীগ্রামের মেয়ে, কাদম্বিনী নিজের নিঃসঙ্গ বাসা-ঘরে সর্ব্বদা শঙ্কিত ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। স্বামী সর্ব্বদাই বাহিরে থাকেন, রাত্রেও হয়ত ধনাঢ্য রোগীর আত্মীয় জন চতুর্গুণ ফী হাঁকিয়া তাঁহাকে আটক করে। কিশোরী তাহার একমাত্র সঙ্গিনী দাসীর বিছানার দিকে ক্রমেই সরিয়া সরিয়া আসে। ইহাতেও কি কিছু সুখ আছে? যে সকল দাসী-চাকর লইয়া সারাদিন ও অধিকাংশ রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হয়, তাহাদের একটি কথাও সে বুঝিতে পারে না। 'চিরুণি' আনিতে বলিলে ইহারা চেটাই বুঝিয়া মাদুর লইয়া আসে, 'নাউ' কিনিতে আদেশ দিলে 'নাপিত' ডাকিয়া আনে। সে হাসিবে কি কাঁদিবে, স্থির করিতে পারে না।

তখন সে সকল স্থানে বাঙ্গালী পরিবারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। সঙ্গহীনতায় কাদম্বিনী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একটা বাঙ্‌লা শব্দ, পরিচিত একটা মুখ চাহিয়া তাহার প্রাণটা যেন হা-হা করিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় তাহার একটি সঙ্গী জুটিল। একটি নবপ্রসূতা কন্যা লইয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে তাহাদের প্রতিবেশী হইয়া আসিল। মেয়েটি সবে এক মাসের। এই সময় আবার একটা অভাবনীয় ঘটনায় অকস্মাৎ অনেক[illegible] উলট পালট হইয়া গেল। কাবুলে তখন

ইংরাজদের সহিত আফ্‌গানদের যুদ্ধ চলিতেছে, মিরাটেও সে যুদ্ধের অল্প বিস্তর ঢেউ আসিয়া পৌছিতেছিল ; হঠাৎ সংবাদ আসিল, অবিলম্বে একজন অস্ত্র-চিকিৎসা নিপুণ চিকিৎসক চাহি। নন্দকিশোর এ দেশীয় লোক হইলেও তাঁহার অস্ত্রবিদ্যার যশ ইতঃমধ্যে ও-অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি যুদ্ধ-যাত্রী সৈন্যদলে যোগ দিবার আদেশ আসিল। এ নিয়োগ সমস্ত বাঙ্গালীর দিক হইতে গৌরবের, সন্দেহ নাই,—কিন্তু মানুষের অবস্থাই তাহার সব চেয়ে বড় শত্রু। উচ্চ পদ, সম্মান, অভিজ্ঞতা, অর্থ, সবই তিনি পাইতে পারেন সত্য, কিন্তু যে আজ তাঁহার এই সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, তাহাকে যে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইবেন! আসন্ন সন্তান সম্ভবা পত্নীকে কাহার নিকটই বা রাখিয়া যান! একটা মানুষের মত মানুষও যে এখানে নাই! প্রতিবেশিনী সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার মৃত্যুতে তাহার স্বামী শিশুটিকে লইয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাদম্বিনী শিশুটিকে গ্রহণ করিলে তিনি ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নন্দকিশোর ভাবিয়া দিশাহারা হইলেন।

কাদম্বিনী সব কথা শুনিল। শুনিয়াই সে স্বামীকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিল। একটি কথাও সে মুখে উচ্চারণ করিল না, শুধু নীরব অশ্রুধারায় তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল, এই শেষ!

উপায় নাই, উপায় নাই! এই নির্ভর বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া যাইতেই হইবে! জীবন্ত শরীরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত করা যাহার নৈমিত্তিক কার্য্য, প্রেমপূর্ণ কোমল অন্তঃ... ব্যথাদান, তাহার

প্রাণে ছুরির চেয়েও তীক্ষ্ণ হইয়া বিঁধিল। কিন্তু এখন কর্ম্মত্যাগ বা ছুটী, কিছুরই সম্ভাবনা নাই! নন্দকিশোর নিজের দিক হইতে নিরাত্মীয়, শ্বশুরালয়ে তারের সংবাদ পাঠাইয়া আহত বক্ষে আহতের শিবিরোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কাদম্বিনীর তখনকার সে অবস্থা-বর্ণনার চেষ্টা না করাই ভাল।

নন্দকিশোরের প্রেরিত সংবাদ যখন ভট্টাচার্য্য গৃহে আসিয়া পৌছিল, ভক্তিনাথ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতার রোগশয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট। শিবনারায়ণ সে সময় নিজের কর্ম্মস্থানেই থাকিতেন। বিদ্যুৎ নিজ ক্ষিপ্র গতিতে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিলেও সাধারণের তাহা গোচর হইল না—এক পাশে ধূলা মাখা হইয়া কাগজখানা পড়িয়া রহিল।

সব চুকিয়া গেলে সপুত্র সার্ব্বভৌম মহাশয় তেমনি শান্তভাবে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভিতরে উচ্চ ক্রন্দনের রোল উঠিল। ভক্তিনাথ উভয় জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উমাকান্ত নয়ন মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মময়ি মা!" তার-প্রেরণের মাসাধিক কাল পরে ভক্তিনাথ ডাক্তার বাবুর শূন্য গৃহদ্বারে আসিয়া ডাকিলেন, "কাদু!" কে কোথায়! ভিতর হইতে রোরুদ্যমানা শিশুক্রোড়ে হিন্দুস্থানী দাই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহারাই এই মাতৃত্যক্তা অপোগণ্ডটিকে পালন করিতে ছিল। দুই দিনের মধ্যে সেখানকার পাঠ উঠাইয়া ভক্তিনাথ ক্ষুদ্র শিশুকে বক্ষে ধরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ লইয়া জানিলেন, নন্দকিশোরের [illegible] ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। দুই চারিখানা পত্র

ও টেলিগ্রামও পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনই প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই।

ইহার পর হইতে তাঁহাদের পক্ষ হইতে সকলেই গৌরীর পিতার আশা ত্যাগ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, ধনী নন্দকিশোর বন্ধন কাটাইয়া নবীন জীবন উপভোগ করিতেছেন, আর তাঁহার নাগাল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হায়, বুঝিবার ভুল কত সময়েই এমন সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়।

আফগান যুদ্ধের কামান গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে নন্দকিশোর সে সময় নিজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এতদিনে হয়ত কাদম্বিনী তাহার নবপ্রসূত সন্তানের মুখ দেখিয়া একটু শান্ত হইয়াছে। পিতা, ভ্রাতা নিশ্চয় এতদিনে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে আসিয়াছেন।

কার্য্যদক্ষতার জন্য যশ, মান ও ধন দ্বারা পুরস্কৃত নন্দকিশোর যখন মিরাটে ফিরিলেন, তখন তাঁহার অধিকৃত গৃহে অন্য এক বাসিন্দার বিবাহের বাদ্য বাজিতেছে। প্রতিবাসীগণ সংবাদ দিল, তাঁহার এখান হইতে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়, সে আজ প্রায় পাঁচ ছয় মাসের কথা। পত্নীর মৃত্যুর পর একটি মেয়েকে একটি লোক আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, অপরটি কাদম্বিনীর মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খুব সম্ভব সেইটীই তাঁহার সন্তান! নন্দকিশোরের মনে এই কথাটাই সঙ্গত ঠেকিল। যে মেয়েটিকে কাদম্বিনী পালন করিতেছিল, তাহারই পিতা আসিয়া নিশ্চয় তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। ছুটীর দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি নিজের কাজে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে তাঁহার মুখে কেহ কোন দিন হাসি দেখিতে পায় নাই। লোকে বলিত, হাড়ের উপর ইস্পাত চালাইয়া মানুষটাও ঐ দুইটা জিনিষের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে।

অকালবৃদ্ধ নন্দকিশোর পেন্‌সন লইয়া বৎসর দুই কলিকাতায় আসিয়া বসিয়াছেন, ইতঃমধ্যে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার হাত-যশের খ্যাতি প্রচারিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। আকাঙ্ক্ষাহীন ধনে ঘর নিত্য ভরিয়া উঠিতেছিল।

রাণাঘাটে রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় সেই কৈশোর-যৌবনের স্মৃতিপূর্ণ গৃহখানা আজ তাঁহাকে নিতান্তই এই পথে টানিয়া আনিয়াছে। কাদম্বিনীকে ত তিনি এই গৃহ হইতেই একদিন তাঁহার পাশে তুলিয়া লইয়াছিলেন, ইহা তাহারই পুণ্য-স্মৃতির পবিত্র তীর্থ!

নন্দকিশোর যখন গভীর আবেগে গৌরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার বাপ"—তখন এই অপরিচিত শব্দটা গৌরীর কর্ণে কঠিন উপহাসের মতই উৎকট ঠেকিল। সে একটু আড়ষ্ট থাকিয়া ঈষৎ বিস্মিত ও বিরক্তভাবে অপরিচিতের বাহু ঠেলিয়া কহিয়া উঠিল, "আমার বাপ নেই। তুমি ও রকম করচ কেন? পাগল নও ত?" চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল—যদি সত্যই সে উন্মাদ হয়!

নন্দকিশোর ধীরে ধীরে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুখে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মুখখানা বেত্রাহত অপরাধীর মুখের মতই পাণ্ডু দেখাইল।

এমন সময় [illegible] মোড়ে দুইজন লোক প্রবেশ করিলেন।

তাহাদের দিকেই তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন। নন্দকিশোর সেদিকে লক্ষ্য মাত্র করেন নাই, তিনি যেমন তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রসারিত বাহুদ্বয় অবসন্নভাবে দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, অবসাদে ও গভীর বেদনায় মস্তক নত হইয়া পড়িয়াছিল। পথিকদ্বয় নিকটবর্ত্তী হইল,—একজন ভক্তিনাথ, অপর ব্যক্তি তাঁহারই একটি ছাত্র। নিকটে আসিলে গৌরীর উপর ভক্তিনাথের দৃষ্টি পড়িতেই তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "গৌরি, তোর শাপই ফলেছে রে! তোর শ্বশুরের অসুখ করেচে।—কে ?—নন্দকিশোর বলেই যেন—"

"চিনতে পারচ, ভক্তিনাথ ? অভাগা তার পৃথিবীর একমাত্র আত্মীয়ের কাছেও আজ অপরিচিত—"

কলের মত আগন্তুকের কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে গৌরী আপনার ক্ষুদ্র মস্তক রাখিল, অজানা মনোদ্বেগে কম্পিত স্বরে ডাকিল, "বাবা!"

২৮

পৃথিবী সচলা, তাহার সুখ-দুঃখও সচল। তালে ছন্দে বাঁধা জগতের নিয়মসমূহ কখনও তাল কাটাইয়া চলে না। গৌরীর ভাগ্যচক্র এক সময় নীচের দিকে নামিয়াছিল, তাই বুঝি এবার উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে!

ভক্তিনাথ কহিলেন, "নীলমাধব পীড়িত। শুনে এলাম, তার স্ত্রী বলেছেন, বিয়ের কথাতেই যখন বাড়ীতে রোগ ঢুকেচে, তখন ও অপয়া মেয়েকে ঘরে আনা হতে পারে না।"

নন্দকিশোর তখনও বেশী কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া পান নাই, কন্যার দিকে চকিত নেত্রপাত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন "ক্ষতি কি!"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "এখন মনে হচ্চে, মঙ্গলময় ঈশ্বর কি মঙ্গলই ঘটিয়েছেন! তোমার মেয়ে তুমি যোগ্য পাত্রে দিয়ো ভাই—আমি আর কি করতে পারছিলুম।"

ভক্তিনাথের কণ্ঠ সজল, নেত্রে রুদ্ধ আনন্দাশ্রু। নন্দকিশোর তাঁহার বাহুর উপর হস্ত রাখিয়া গভীর স্বরে কহিলেন, "তুমিই সব করেছ, ভক্তি! তুমি ওকে না আনলে ও কোথায় যেত!" বলিতে বলিতে সেই ভয়াবহ কল্পনায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগিনিপতিকে কঠিন তিরস্কার করিতে আসিয়া তাঁহার অজস্র অশ্রুজলের স্রোতে বান ডাকাইয়া বসিলেন। আহা, এ অবস্থায় মানুষকে কি আর কিছু বলা যায়?

চোখের জল শুকাইলে নন্দকিশোর কহিলেন, "যাহোক, বিন্দু এখন তোমার মেয়েটিকে নিয়ে যে একবার ওদিকে যেতে হচ্চে, বোন! তার কি ঠিক করলে, বল?"

বিন্ধ্যবাসিনী যে এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির না করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। বড় বধূ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে একটু টিপ্পনী কাটিয়া রাখিয়াছেন, "হ'ল ভাল। ঠাকুরঝি এখন দিন কতক বোনাই-বাড়ীতে গিন্নিপনা করে আসচেন, বোধ হয়?" এই মন্তব্য ভাই ভগিনী কাহারও ভাল লাগে নাই। ভক্তিনাথ তখনই উত্তর দিয়াছিলেন "তাই বা ও যেতে গেল কেন?"

বড় বধূ ঠোঁট টিপিয়া কহিলেন, "তা গেলই বা! গরীবের ঘরের চেয়ে বড় মানুষের আঁস্তাকুড়টাও ভাল।"

বিন্ধ্য নিজের মনে এই নিশ্চিত আমন্ত্রণের উত্তর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই অঞ্চলপ্রান্ত অন্যমনস্কভাবে পাকাইতে পাকাইতে উত্তর দিলেন, "এখন নয়। যখন গৌরীর বিয়ে দেবে, তখন আমায় নিয়ে যেও।"—কথাটা যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত শুনাইল। সুখ এবং বেদনা, উভয়ই ইহার মধ্যে তুল্যাংশে মিশ্রিত ছিল।

নন্দকিশোর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তাহলে, কেমন করে আমি ওকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাই? ও তোমারই—"

"পোড়াকপাল! আমার হয়ে তার ত সবই হয়েচে! এমন মানুষের আবার মেয়ে! তোমার ধন তুমি নিয়ে যাও, ভাই,—"

উচ্ছ্বসিত বেদনা-ভরা সুখে বিন্ধ্যবাসিনী রুদ্ধবাক্ হইয়া রহিলেন। হায় স্বার্থান্ধ মানব হৃদয়! নিজেকে দিয়াও যে সে ফিরিয়া পাইতে চাহে! অহংকে দলিত কীটবৎ পদতলে চাপিয়া ধরিলেও যে সে মরে না।

বড়বধূ ঘরের সব চেয়ে ভাল আসনখানা পাতিয়া ঠাকুর-জামাইকে খাওয়াইতে বসিয়া ঘন ঘন পাখার বাতাস দিয়া কহিলেন, "নে যাও ভাই তোমার জিনিষ তুমি নে'যাও, মা-খেকো-মেয়ে একরত্তি থেকে বুকে করে মানুষ করা—যত্ন-টত্ন করো! আমাদের প্রাণ কাঁদচে, পরের মেয়ে, জোর ত নেই, শুধু এতকাল করে মরাই সার! দেখ না, বিয়ের নামেই কি ছর্‌কোট! প্রায় দু-তিন শো টাকার জিনিষ-পত্তরই কেনা হ'ল!"

নন্দকিশোর কহিলেন, "সে কি কথা! আপনাদের জোর নেই? সে বরং আমারই কোন জোর নেই: দয়া করে দিচ্চেন তাই দুদিন নিয়ে যাচ্চি। যখনই আদেশ করবেন, তখনই আমি ওকে আপনাদের চরণ দর্শন করাতে আন্‌বো। আপনাদের ঋণ কি শোধ হয়?"

পরদিন অতি প্রত্যূষে পাড়ায় পাড়ায় প্রচারিত হইয়া গেল, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিরুদ্দিষ্ট জামাতা এতকাল পরে হঠাৎ মেয়ে দেখিতে আসিয়াছেন। এবং শুধুই তাহাই নহে,—এই নন্দকিশোর লাহিড়ী টাকার ছালা সঙ্গে করিয়া সেই অজানা দেশ হইতে ফিরিয়া এক রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া এই গরীব ঘরের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। বরপক্ষ এ সংবাদ শুনিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন।

যেমন উৎসাহে লোকে শারদা-গৌরী-প্রতিমা দেখিতে আসে, তেমনই দলে দলে পাড়ার মেয়েরা গৌরীকে দেখিতে আসিল। উৎসাহের গভীরতায় তখন আর কাহারও মনে রহিল না, সে একটি দুর্দ্দান্ত অশিষ্ট গ্রাম্য-বালিকা। ধনী পিতার আদর তাহার উপর যেন একটা হীরার খোলস পরাইয়া দিয়া সাত রাজার ধন মাণিকটুকুর মতই তাহার মূল্য বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

করুণাময়ীর দাসী আসিয়া তাহাকে কমলার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানাইয়া গেল। সেও শুনিয়াছিল, গৌরী পরদিন পিতার সহিত চলিয়া যাইবে। মানুষের মনে কোন অবস্থাতেই বুঝি তৃপ্তি নাই! বিবাহ বন্ধ হইল, পিতৃহীনা পিতৃস্নেহ লাভ করিল, তথাপি সে সুখী হইল না,—মাসিমা সঙ্গে যাইবেন না শুনিয়াই

তাহার সকল আনন্দ ঘোর বিষাদে পরিণত হইয়া উঠিল। চিরকাল এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে এই গৃহ ও এই মাসিমার কোলের গণ্ডির বাহির হয় নাই, আজ একসঙ্গে এত বড় দুইটা বিরহ কেমন করিয়া সে সহ্য করিবে? ক্রন্দনের মাঝখানে এক সময় সে বলিয়া বসিল, "তবে ত বিয়ে বন্ধ হয়ে আমার সব হল! সে তবু ত তোমায় দেখ্‌তে পেতুম।"

অশ্রুধারার মধ্যে শরত রৌদ্রের মত মৃদু হাসিয়া মাসিমা সস্নেহে কহিলেন, "পাগ্‌লি!" সে দিন তরকারিতে লবণ ও চালতার গুড় অম্বলে মিষ্ট রসের অভাব ঘটিল। পদে পদে রন্ধনকারিণীকে অনুযোগের পাত্রী করিয়া তুলিল।

নদীবক্ষে সুদৃশ্য তরণী ভাসিতেছিল। অশ্রুপরিপ্লুতা রোদনোচ্ছ্বসিত গৌরী পিতার সহিত তরণী-বক্ষে পদার্পণ করিতেই দাঁড়ি মাঝি ও ভৃত্যের দল উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল। মুহূর্ত্তের বিস্ময়ে গৌরী সব ভুলিয়া গিয়া স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল। জলের উপর ভাসমান, গৃহের মত সুবৃহৎ বজরার দ্বারে লতা-চিত্রিত পর্দ্দা বাতাসে উড়িয়া বিবিধ উপাদান-পূর্ণ সুখ-বিলাসের গৃহমধ্যে যেন তাহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছিল। ব্যগ্র কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীটা তোমার?"

"হ্যাঁ মা, এ বজরা আমিই কিনেচি।" কিন্তু হায়, মাসিমা ত এ বজরায় তাহার সহিত যাইবেন না! গৌরী পিতার হাত ছাড়িয়া তীরের দিকে তীরবেগে ফিরিল, "মাসিমা, চলে গেছ, মাসিমা? আমি যাব না, ওগো, আমি যাব না। আমায় নামিয়ে

দাও।" উর্দ্ধস্বরে এবার সে কাঁদিয়া উঠিয়া সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ততক্ষণ মাঝি-মাল্লারা ক্ষিপ্র হস্তে সিঁড়ি তুলিয়া লইয়াছে।

বন্দী মৃগশিশু যেমন ব্যাধের জালমধ্য হইতে গভীর হতাশায় বনান্তরালবর্ত্তিনী ব্যাকুলা জননীর প্রতি আকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কাঁদিতে থাকে, তেমনই করিয়া তীরাভিমুখে ভট্টাচার্য্য-পরিবারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গৌরী লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "আমি যাব না গো, আমি যাব না।" ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি আর একটি পরিত্যক্ত চিত্তে তেমন প্রাণফাটা হাহাকার বহন করিয়া আনিতেছিল। সে ক্রন্দন আরও করুণ, আরও মর্ম্মভেদী, কারণ তাহা অব্যক্ত।

"মা গৌরী! তবে কি আমি তোকে জোর করে তোর আত্মীয়দের কাছ থেকে কেড়ে আনলুম মা? তোকে কি নিজের স্বার্থের জন্য কষ্ট দিচ্চি!"

যে গভীর সংশয়পূর্ণ বিষাদের স্বরে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইল, তাহা গৌরী ভিন্ন অন্য কোন সংসার-জ্ঞান অভিজ্ঞা বালিকা বোধ হয় সহিতে পারিত না।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, গৌরীর মনে তাহার পিতার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। জন্মাবধি যাহার কাছে সে কণামাত্র স্নেহ পায় নাই, ইহার তাহার নিকট হইতে বরং শুনিয়াই আসিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার প্রতি অন্যায় করিয়া আসিতেছেন,—সহসা একদিন তিনি আসিয়া কাছে টানিলে সে এখন কেমন করিয়া তাহার এতদিন-

কার জগৎ ছাড়িয়া একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিতে পারিবে ?
সে তীব্রভাবে কহিল, "কেন, তুমি আমায় নিয়ে এলে ? আমি ত মাসিমাকে সত্যদাকে আর দেখতে পাব না ! মাসিমাকে ছেড়ে যে আমি কক্ষণো থাকিনি—" বলিতে বলিতে নদী তীরবর্ত্তী শ্যামল বৃক্ষচ্ছায়াঢাকা গ্রাম্য পথে অনেকগুলি পরিচিত মূর্ত্তির মধ্যে এক শুভ্রবসনা বিধবার অশ্রুজলে রুদ্ধ দৃষ্টির ব্যথিত ছায়া কল্পনা নেত্রে উদিত হইবামাত্র আবার সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, "ও মাসিমা, আমায় নিয়ে যাও— আমি যাব না ।"

ক্ষেপনিক্ষেপ-চূর্ণিত তরঙ্গ ছল-ছল- ছলাৎ শব্দে বজরার তলায় অঘাত করিয়া যাইতে লাগিল। সোণার রৌদ্র মাখিয়া সেই ফেন-মুকুট ঢেউগুলা মীনা-করা জড়োয়া জিনিষের মতই দেখাইতে লাগিল। গৌরীর ক্রন্দনে প্রকৃতি যেন কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখানো আবশ্যক বোধ করিল না। নৌকা দ্রুত চলিতেছিল। তীরে কোথাও পাকা ফসলে ক্ষেত হাসিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বাঁধা ঘাটে বাবুরা বায়ু সেবনে আসিয়াছেন, বটের ছায়া-ঢাকা কোন মেটে ঘাটে গ্রামের মেয়েরা গা ধুইতেছে ! ছোট ছোট মেয়েগুলি জলে গা ডুবাইয়া মুখে জল পুরিয়া বিবিধ শব্দ সৃষ্টি করিতেছে, পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া অভিভাবিকাদের গালি খাইতেছে। কোন ম্যালিরিয়া-প্রপীড়িতা বালিকা জলে নামিতে না পাইয়া কাদায় বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। কোথাও নির্জন ঘাটে ছাঁকনি জালে জেলের মেয়ে ক্ষুদে চিংড়ি ধরিতেছে। গ্রীবা বাঁকাইয়া দুইটি রাজহংস ইচ্ছা-সুখে সন্তরণ দিতেছে। নন্দকিশোর কন্যার শেষ কথায় অন্তরের মধ্যে আঘাত

পাইয়াছিলেন। প্রথম ধাক্কায় মনে হইল, নৌকা তিনি ফিরাইতে বলেন, কিন্তু মানুষের মন আশা-সূত্রে মালা গাঁথিতে বড় ভালবাসে। মুহূর্ত্তে আবার সে ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হয় ত দুই দিন পরে এ ভাব চলিয়া যাইবে! কিছুই না বলিয়া তাই স্থিরভাবে তিনি বসিয়া রহিলেন। অতীতের স্মৃতি ব্যথিত বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রুও ফুটাইয়া তুলিল। সহসা একবার কি ভাবিয়া মুখ তুলিতেই সেই বেদনার কষাঘাতস্বরূপ অশ্রুবিন্দু দুইটি গৌরীর চোখে পড়িল। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিল। তখন সূর্য্যের অস্তগমনোন্মুখ রশ্মিগুলা পশ্চিম আকাশের প্রান্তটাকে আশ্চর্য্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, স্বর্ণ-মিশ্রিত লালের আভায় বিদ্যুৎপ্রভ শ্বেত মেঘপুঞ্জে নূতন নূতন রং ফলিয়াছে! যেন ইন্দ্রালয়ের চারু শিল্পী স্বর্গবাসিনী সুরকন্যাগণের বিচিত্র বসনপুঞ্জ নিজের পণ্যশালায় সাজাইয়া রাখিয়াছে! মেঘের ছায়ায় জল পর্য্যন্ত বর্ণময়, তরঙ্গের মুখে মুখে নূতন রংয়ে যেন একগাছি বিভিন্ন বর্ণের ফলে গাঁথা গোড়ের মালা ভাসিতেছে। দুই ধারের সবুজ শোভা ও হেমন্ত-সায়াহ্নের ঈষৎ শিহরণকারী বাতাসে মৃদু স্পন্দিত ঘন তরুরাজি ভেদ করিয়া অদূরস্থ অট্টালিকা-বাতায়ন-পথে সান্ধ্য নক্ষত্রের মত একটি ক্ষীণ সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। কোথাও নির্জ্জন নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। গৌরীর অশ্রু-পরিপ্লুত মুখে রাঙ্গা আলো আসিয়া পড়ায় তাহা যেন পরী-কন্যার মুখের মতই অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাইতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া অবশেষে সে পিতার দিকে ফিরিল। জানুর উপর চিবুক রাখিয়া নত মুখে তিনি বসিয়া আছেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে সে স্পর্শ করিল,

কহিল, "আকাশে কি আগুন লেগেছে? তবে এত রাঙা কেন?"

২৯

পরদিন যখন নন্দকিশোরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, চোখ চাহিয়া প্রথমেই তিনি তাঁহার বিছানার নিকটে অপর শয্যার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। গৌরী তখনও ঘুমাইতেছে। হেমন্ত প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল তপনের দুই একটি রশ্মি সার্সির কাচের উপর পড়িয়া নাচিতেছে, গৃহের মাঝখানে গৌরীর ঘুমন্ত মুখ স্বপ্নপুরির রাজকন্যার মতই মোহ বিস্তার করিতেছিল। নন্দকিশোর নিঃশব্দে উঠিয়া বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে বোধ হয় তিনি নিশ্বাসও লইতেছিলেন না।

একটা উড়ন্ত পাখী বাতাসে ডানা মেলিয়া নদী পার হইবার সময় তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল। সে শব্দে চমকিয়া বালিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চোখ মেলিল। নন্দকিশোরের মনে হইল যেন সেই মুদিত নেত্রের ছায়াতলে বিশ্বের সমুদয় পুঞ্জীভূত আলোক এতদিন ঘুমাইয়াছিল, তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহিত রাত্রি-শেষে তপনোদয়ের মতই এখন তাহা পুলকের স্পন্দনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। কি এক অননুভূত আবেগে তাঁহার বক্ষ দুরু দুরু করিতে লাগিল। গৌরী তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই। সে ব্যস্তভাবে উঠিয়া আপনা-আপনি কহিয়া উঠিল, "মাসিমা ডেকে দেয়নি! এত বেলা হয়ে গেছে, এখনি বড় মামী বকবেন! কখন ফুল তুলব? ঝাঁটই বা দেব কখন।" সহসা নন্দকিশোরের সহাস মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে স্থির হইয়া

বলিল, "ও হরি! সব ভুলে গেছলুম!" নন্দকিশোর তাহার মুখের ব্যস্ত ভাব সহসা অবসাদে পরিবর্ত্তিত-প্রায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িলেন, কহিলেন "তুমি পড়তে জান?" গৌরী মুখ না তুলিয়া ঘাড় নাড়িল, "জানি।"

"কি পড়?"

"দ্বিতীয় ভাগ।"

"তুমি ফুল ভালবাস?" এবার নত মুখ ঈষৎ উঁচু হইল; গৌরী কহিল, "বাসি।"

"আমার বাড়ী অনেক ফুল গাছ আছে।"

"তোমার বাড়ী খুব বড়?"

"খুব বড়। তাতে সন্ধ্যাবেলা কল টিপ্‌লেই আলো জলে ওঠে, তাকে বিদ্যুতের আলো বলে। কল খুললে বৃষ্টির মত জল পড়ে, তাকে বলে জলের কল।"

গৌরীর ভগ্ন মনে ক্রমে একটু উৎসাহ জন্মিতেছিল, সে কহিল, "সেখানে তা হলে নদী নেই?"

"আছে। সে অনেক দূরে, সেখানে আমরা বিকালে বেড়াতে যাব। সেখানকার গঙ্গা, অনেক বড় বড় জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকায় ভর্ত্তি থাকে, তারে কত আলো জ্বলে।"

এবার কৌতূহলের জয় হইল। "কলকাতাটা চাকদার চাইতে অনেক বড়?" তারপর পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অধিক স্থলেই প্রৌঢ় শ্রোতা ও বালিকা বক্তা। কোথাও বা তিনি উত্তরদাতা গৌরি প্রশ্নকারিণী। সে প্রশ্নের সীমা ছিল না, সকল প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে

অপরিচিত পিতা-পুত্রীতে অনেকখানি কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন।

নন্দকিশোর তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে আজ সম্পূর্ণ নূতনতর আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন! চিরশুষ্ক শীর্ণ নদীতে অকস্মাৎ পাষাণ বক্ষবিদারী তীব্র জলস্রোত ছুটিয়া আসিলে সে যেমন নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনই এই নব-ভাবের বন্যা তাঁহাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পিতৃ-হৃদয়ের গভীর উন্মদনাপূর্ণ স্নেহে তাঁহার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে, অথচ এই অনাস্বাদিত সুখ কাঙ্গালের মত সঙ্কোচে তাঁহাকে পীড়িত করিতেও ছাড়িতেছিল না। ব্যাকুল আগ্রহ স্নেহপাত্রীকে বুকে টানিয়া লইতে মুহুর্মুহু বাহু প্রসারিত করিয়া ছুটিতে চাহিতেছিল, কিন্তু দারুণ সন্দেহ মনকে টানিয়া রাখিতেছে। প্রায় পঞ্চাশত বর্ষ বয়সে যে অবলম্বনটি মিলিল, সে শিশু প্রকৃতি, তথাপি সে শিশু নহে। তাহাকে বাহুতে দোলাইয়া বুকে চাপিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া রাখা যায় না। এ দিকে দুরন্ত ক্ষুধা যেন সর্ব্বগ্রাসীভাবে জাগিয়া উঠিয়া অকস্মাৎজাগ্রত কুম্ভকর্ণের মতই চিরদিনের পাওনা খোরাক দাবী করিতেছিল।

নন্দকিশোর ইতিঃপূর্ব্বে আর কখনও এমন করিয়া কাহাকেও ভালবাসিবার অবসর লাভ করেন নাই। মধ্যের এই দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল হৃদয়ের বৃত্তিগুলা অনাহারেই একরূপ জীর্ণ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও শৈশবে পিতৃমাতৃহীন নন্দকিশোর একমাত্র পত্নী কাদম্বিনীকেই তাঁহার সমুদয় হৃদয়-ভাণ্ডারের অধিকার প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেও বা কত-

দিন! কঠোর অধ্যয়ন-কালে বালিকা পত্নীর সহিত ভাল করিয়া দেখা-শুনারই অবসর ঘটিয়া উঠে না; শেষ বৎসরের স্মৃতিটুকুই তাঁহার পক্ষে একমাত্র সুখের স্বপ্ন ও জীবনের অবলম্বন, কিন্তু তাহাই বা কতটুকু!

গৌরও তাহার অজ্ঞাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। প্রথমকার গভীর দুঃখপূর্ণ বিদ্রোহের ভাবটা মন হইতে অল্পে অল্পে সারিয়া আসিতেছিল। পিতার প্রতি সূক্ষ্ম অভিমান নিজে স্পষ্ট না বুঝিলেও মনের মধ্যে অনেক খানি স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেখানে একটা সহানুভূতির ক্ষীণ ছায়া ক্রমই জলে পতিত তৈল-বিন্দুর ন্যায় বিস্তৃত হইতেছিল। মাসিমা ও সত্যদাদা, এই দুইটি প্রাণী ব্যতীত তৃতীয় আর এক ব্যক্তি তাহার হৃদয় মধ্যে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, সে কমলা। কিন্তু তাহার অপেক্ষা যেন ধীর-ভাষী, সজলনেত্র বৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি তাহার পিতা,— তাঁহার আসন আর একটু বিস্তৃত হইতেছিল। প্রথম পিতৃস্নেহের পরিচয় বিচ্ছেদের বেদনায় বাধা প্রাপ্ত না লইলে আরও পূর্ব্বে সে ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারিত। নন্দকিশোর নৌকা যাত্রা দীর্ঘ করিয়া দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বিপ্রহরে বৃহৎ তরণী মৃদু-মন্দ গতিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকে, কিছুদূর আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটা জায়গায় নোঙ্গর ফেলে। পিতাপুত্রী নৌকা হইতে নামিয়া তীরে খানিকটা ঘুরিয়া আসেন, গৌরীর মনে তখন আর কিছুমাত্র ক্ষোভ থাকে না। বনের ফল ছিঁড়িয়া, ফুল তুলিয়া, হাজার হাজার প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া সে যখন নির্জ্জন ভূমে বনচারিণী পল্লিবালিকার মত হাসির লহর তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, নন্দ-

কিশোরের সারা চিত্ত তখন সেই আনন্দের তালে তালে নাচিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে আনন্দাতিশয্যে তিনি গভীর চিন্তামগ্নের মত স্তব্ধ হইয়া বহুক্ষণ বসিয়া থাকেন। অধিক সুখ গভীর বেদনার মতই বক্ষে যেন বহিতে পারা যায় না।

এমনই করিয়া জলযাত্রা ফুরাইয়া আসিল। একদিন শেষ বেলায় প্রকাণ্ড মাস্তুল-ওয়ালা কত জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকা ও তীরের পিপীলিকাশ্রেণীবৎ ব্যতিব্যস্ত লোকজনসমেত একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব নূতন দৃশ্য চোখে পড়িয়া মুগ্ধা গৌরীকে চকিতে স্তম্ভিত করিয়া দিল। জানালার নিকটেই দ্বিতীয় বেত্রাসনে অর্দ্ধ-শয়ান নন্দকিশোর নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন, সে বিস্মিত দৃষ্টি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে কি হয়েচে, বাবা ?"

এই প্রথম সে তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিল। সে আনন্দে পিতার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাঁহার জীবন সার্থক ও বাঁচিয়া থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল। অতীতের সহিত তুলনায় ভবিষ্যৎ অকস্মাৎ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। তিনি কহিলেন, "ওই কল্‌কাতা।" "ও—ঐখানে আমরা থাকব ?"

গৌরীর দুই নেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, সে আর কিছুই বলিল না। দুই ধারের উজ্জ্বল দীপমালা অকস্মাৎ গৌরীর চোখ ধাঁধিয়া দিল। সুন্দর অশ্বযানে পিতার পাশে বসিয়া সে নীরব নিস্পন্দভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সারি সারি দোকানে কত বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। অসন, বসন, ক্রীড়নক, পুস্তক, কত প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় রাশি রাশি পরিচিত অপরিচিত দ্রব্যসম্ভার এক সঙ্গে জমা করা। গাড়ী ঘোড়া লোকজন!

অস্বা·াবিক রূপসম্পন্ন নূতন ধরণের স্ত্রী-পুরুষ, শিশু বালক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোলা গাড়ী চড়িয়া সদর্পে নিমিষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। গগনস্পর্শী অট্টালিকা সকল একটার পর একটা এমনই করিয়া সাজানো, যেন একটা বির ট প্রাচীর-শ্রেণীর মত কোন সীমাহীন পথের দুইটি ধারকে তাহারা ঘেরিয়া আছে। ইহার মধ্যে একবার পড়িলে বুঝি আর কখনও বা হিরে লইয়া যাওয়া যায় না। যখন বহু পথ বহু দৃশ্য অতিক্রম ক রয়া গাড়ী একটা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিল, তখন সে পিতার সহিত তেমনই নিস্পন্দভাবে নামিয়া আসিল। কোথা আসিল, কি বৃত্তান্ত, কিছুই সে জিজ্ঞসা করিল না। সমস্ত কলিকাতা যেন যাদুকরের যাদু-যষ্টির মত তাহার মনকে স্পর্শ করিয়া রহিল। সম্মুখে ফুল গাছের টব-সজ্জিত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া নন্দকিশোর একটা প্রকাণ্ড হল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, দ্বারে গৌরী দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। হাত ধরিয়া সস্নেহে তিনি কহিলেন, "এস মা।" সে নড়িল না। "এস মা, এই তোমার বাড়ী।" গৌরী আড়ষ্ট হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল, "এখানে রাজা থাকেন না?"

নন্দকিশোর মৃদু হাসিলেন, "না, তোমার গরীব বাবা থাকেন।"

সে ধীরে ধীরে বক্ষরোধকারী নিশ্বাসটা ছাড়িয়া দিল, ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "কিন্তু পায়ে কাদা ধুলো,—বিছানা নষ্ট হয়ে যাবে যে।

"যে ঘরের বুকে তোদের পায়ের চিহ্ন পড়েনি, তার মত

অভাগা কি আর কিছু আছে ? কোন দ্বিধা করো না, এ সবই ত তোমার।"

গৌরী হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এ সব তাহার! বড়মামীর বকুনি বাঁচাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান ও গৃহে ফিরিয়া ভর্ৎসনা-লাভ যাহার নিত্য পাওনা ছিল—সেই সে-ই আজ এই বাড়ীর মালিক! ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য কাণ্ড জগতে আর কিছু ঘটিতে পারে কি!

প্রভাতে যাদুকরী নগরী আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। অশ্ববাহন ট্রামের প্রকাণ্ড বপু অদূরে দেখা যাইতেই গৌরী নিশ্বাস-রোধ করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কত রকম শব্দ, কতপ্রকার গাড়ী, কতই মানুষ! রাস্তায় ফেরিওয়ালা কত সুরে বেসুরে, 'চাই মটর ভাজা', 'ভালো ভালো জরির সাড়ি', 'কৃষ্ণনগরের সরভাজা', 'জামাই-ভুলান লেডক্যানী' হাঁকিতেছিল। জানালা ছাড়িয়া গৌরী নড়িতে পারিতেছিল না, যেমন সে সরিয়া আসিবে মনে করে, অমনি একটা-না-একটা আশ্চর্য্য কিছু ঘটিয়া বসে। সে বদ্ধদৃষ্টি বদ্ধপদে দাঁড়াইয়া থাকে। নন্দকিশোর আড়াল হইতে দেখিয়া অনেক সময় পা টিপিয়া ফিরিয়া যান। যে সময়টায় অবসর করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে জানালা হইতে সরাইয়া আনিতেন, সেই অবকাশে সে এই বাড়ীর অদ্ভুত রহস্য সকল উদ্ঘাটন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। পাখা, আলো, জলের কল, আহ্বান-ঘণ্টা, ঔষধের আলমারি, পুস্তকের সেল্‌ফ হইতে ছোটখাট খুঁটিনাটি শত বস্তুই তাহার অপরিচিত। কোথায় সেই পল্লীগ্রামের আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণীগোষ্ঠের ঘরকন্না, আর

কোথায় এই কলিকাতাবাসী বিখ্যাত ডাক্তারের সুসজ্জিত ভবন! সবই তাহার নিকট নূতন ও আশ্চর্য্য! যেটা সে দেখে তাহাতেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকে, কোন সময়ে মুগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠে, কি চমৎকার! নন্দকিশোরের সকল আয়োজন এত দিনের পর সার্থক মনে হইতে থাকে। কিন্তু এমনই করিয়া নূতনত্বের বিস্ময় খুব বেশী দিন তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। একদিন সে সন্ধ্যায় ছাদে উঠিয়া দীপান্বিতার উৎসব-রজনীবৎ আলোক-মালামণ্ডিতা নগরীর দৃশ্য হইতে চোখ ফিরাইয়া যখন কি একটা বিষয় জানিবার চেষ্টায় পিতাকে খুঁজিতে নীচে নামিয়া গেল, তখন দেখিল, তিনি বাড়ী নাই। কৌতূহল রোধ করা তাহার স্বভাব নয়, আশু উত্তর পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল।

সেদিন নন্দকিশোর বাবুর বাড়ী ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, গৌরী তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গ্যাসের আলোকে অতৃপ্ত নেত্রে সে মুখ দেখিতে দেখিতে কতবারই পিতৃহৃদয় সেই ক্ষুদ্র জুঁই ফুলটির মত ছোট মুখখানিতে চুম্বন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছিল,—কিন্তু পাছে সে জাগিয়া উঠে, সেই ভয়ে তাহাকে স্পর্শ করিতেও তাঁহার সাহস হইল না। মায়ের কাছে তাঁহার নবজাত শিশুটি যেমন অসহায়, যতটুকু ক্ষুদ্র, তাঁহার চোখে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব ধনটুকুও তেমনই শিশুবৎ প্রতীয়মান হইত। কিন্তু সেদিন হইতে আবার গৌরীর মনে বিদ্রোহ দেখা দিল। সে পরদিন দাসীর হাত হইতে ঝাঁটা টানিয়া মার্ব্বেলমণ্ডিত দালান ঝাঁট দিতে আরম্ভ

করিল। দাসী নিবারণ করিলে সে তাহা গ্রাহ্য করিল না, বলিল, "আমার খুসী, আমি ঝাঁট দোব। তুমি অন্য কাজ করোগে না।"

"এমন আশ্চয্যি মেয়ে কক্ষণো দেখিনি, বাবা, যা ধরবে তাই।" দাসী রাগ করিয়া বাবুকে খবর দিতে চলিয়া গেল। ক্ষণপরে নন্দকিশোর আসিয়া শশব্যস্তে কহিলেন, "এ কি হচ্চে মা?"

গৌরী কোমরে কাপড় জড়াইয়া একমনে কাজ করিয়া যাইতেছিল, কাজে কামাই না দিয়া উত্তর করিল, "কেন, সেখানে ত করতুম।"

পিতা আসিয়া হাত ধরিলেন, "তা হোক, ও সব ঝিয়েরা করবে। ঝাঁটা ফেলে দাও, চলে এস।"

গৌরী এবার সম্মার্জ্জনী ত্যাগ করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "তবে আমায় কেন নিয়ে এলে? আমি কি করে থাকবো একলাটি, দিন-রাত্তির?"

সত্য, এ কথা সে বলিতে পারে! তাঁহার সারা জীবনটা নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে! তাই বলিয়া এই পল্লী-বালিকা সে দুর্ব্বিসহ জীবনের অংশ কেমন করিয়া বহন করিবে!

ঈষৎ আহত, ঈষৎ লজ্জিতভাবে তিনি কহিলেন "একা তোমার বড্ড কষ্ট হচ্চে! আচ্ছা, আমি তোমার একজন সঙ্গীর চেষ্টা করচি।"

গৌরী সাহ্লাদে মুখ তুলিল, কহিল, "সত্যদাদা ত কল্‌কাতায় থাকে!"

"সে কে?"

"সত্যদাদা গো, গাঙ্গুলী বাড়ীর সত্যদাদা, এর মধ্যেই ভুলে গেছ? কত দিন ত বলেচি!"

নন্দকিশোর এই দাদাটির সংবাদ অনেকবারই পাইয়াছেন, তবে বড় একটা মনোযোগ করেন নাই, তাই প্রথমটা স্মরণ ছিল না। সামলাইয়া লইয়া তিনি কহিলেন, "সে এখানে আসবে কেন?" আগ্রহাতিশয্যে গৌরী পিতার হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে তাহা নাড়িতে নাড়িতে কহিয়া উঠিল, "আসবে না আবার, আসবে, খুব আস্‌বে।"

অপরাহ্ণে সেদিন নন্দকিশোর কোনমতে সময় করিয়া তাহাকে ইডেন উদ্যানে বেড়াইয়া আনিলেন। সেই মনোরম দৃশ্যাবলী, পরি-শিশুবৎ ইংরেজ বালক-বালিকাগণের স্বাধীন-বিচরণ, নূতন নূতন বিবিধ বস্তু তাহার মনকে মোহিত করিয়া তুলিল। দুই চারিটি বাঙালী বালক-বালিকা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাছে কাছে ঘুরিল, তাহাদের বেশভূষা চলন-বলন সবই যেন স্বতন্ত্র! সে ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করিল। মন চাহিলেও তাই সে তাহাদের সহিত আলাপ করিতে পারিল না।

ফিরিবার সময় গাড়ীতে বসিয়া পিতা বলিলেন, "তোমার একজন জ্যেঠাইমা আছেন। তাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। তিনি মধ্যে মধ্যে তোমার কাছে এসে থাকতে পারবেন।"

"আর সত্যদাদা?"

নন্দকিশোর কি করিয়া ইহাকে এ আবেদনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া কেবল গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আচ্ছা, চল দেখি।"

যে গৃহে গৌরীকে তিনি লইয়া আসিলেন, সে গৃহও তাঁহার নিজগৃহবৎ সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছিল। গৌরী দেখিল

মস্তকার্দ্ধে টাক-সমন্বিত তামাক-পোড়া-রঞ্জিতাধরা বৃদ্ধা গৃহিনীর পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ অপরিচিত-বেশভূষায় সজ্জিতা এক হাস্যমুখী প্রৌঢ়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস!" দুইচারি পদ অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি প্রথমেই তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "মাগো, কি বিশ্রী করে চুলবাঁধা! দাসীরা দিয়েছে বুঝি? তুমি নিজে পার না, না? পাড়াগাঁয় মেয়েরা অনেক বয়স অবধি নিজের গায়ের যত্ন করতেও শেখে না। আমাদের কল্‌কাতায় ন'বছরের মেয়েটিও নিজের নিজে চুল বাঁধতে শেখে। এ কাপড় পরা ত ঠিক হয়নি, জামার নীচে কি শাড়ি পরে!"

নন্দকিশোর এই ভ্রাতৃজায়ার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া রোগী দেখিতে চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন, ফিরিবার সময় গৌরীকে লইয়া যাইবেন।

এখানকার সঙ্গ গৌরীর পক্ষে বিশেষ লোভনীয় হইল না। জ্যেঠাইমার একটি বিশেষ বন্ধু এখনই আসিয়া পড়িবেন, ইতঃমধ্যে এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটির সংশোধন আবশ্যক। দাসীকে চিরুণি আনতে আদেশ দিয়া তিনি তাহার চুল খুলিতে বসিলেন। গৌরী একবার আপত্তি করিয়া নিরুপায় ক্ষুব্ধ চিত্তে শেষে মাথাটা ছাড়িয়া দিল, মনে মনে ভাবিল, "বেশ ছিলুম সেখানে। বাবা আমায় কেন আন্‌লেন!"

দামিনী ঝি কেশবন্ধনের পর সাবান দিয়া মুখহাত ধোয়াইয়া দিলে কতকগুলা মৃদু গন্ধ, তীব্র গন্ধ, লাল, সাদা হরিদ্রা বর্ণের তরল পদার্থ দ্বারা জ্যেঠাইমা দেবর-কন্যার প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া পছন্দ-

মত ফ্যাসানে শাড়ি পরাইয়া কহিলেন, "দেখ ত কেমন দেখালো! দিব্যি মুখখানি, গড়নটা একটু কাঠ-কাঠ আছে, গায়ে ত মাংস নেই, ও দুদিনে সেরে যাবে। এস, একটু জলটল খেয়ে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করগে।"

গৌরীর হাত ধরিয়া ভোজন-স্থানে লইয়া যাইতে যাইতে তিনি কহিলেন, "এই বয়সে হাত এমন শক্ত হয়ে গেছে কেন, গা? খুব কাজ করতে, বুঝি?"

গৌরী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। "তাই জন্যে এমন ঝান্ খেয়ে গিয়েছে। আহা, মা নেই বলেই ত এত কষ্ট!" আহারে বসিয়াও সে দুইএকবার জ্যেঠাইমার নিকট অনুযোগ লাভ করিল, "মেয়ে মানুষের এত তাড়াতাড়ি খাওয়া কি! জলের গ্লাসটা নামাবার সময় সাবধান হবে, হাত থেকে পড়ে গেল। দেখ দেখি, যদি পাশে অন্য লোকের পাত থাকত!" আহারান্তে বাড়ীর মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলেই মিতভাষিণী, হাস্যে বাক্যে পদবিন্যাসে কৌতুক ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার প্রাণের ভিতরে একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা সাড়া দিয়া উঠিতে চাহিল। হায়, তাহার চাকদা!

বাড়ীর মেজ মেয়েটি একটু প্রগল্‌ভা। সে এই নূতন আলাপীর সহিত একটু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল। কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কে তোমার বন্ধু ছিলেন?"

"বন্ধু, কেউ না।"

"কারুর সঙ্গে খেলতে টেলতে না?"

গৌরী ঢোক গিলিয়া বলিল, "খেলতুম বই কি। চুণী, নালু,

কালী, আর সব চেয়ে বেশী সত্য দাদার সঙ্গে খেলতুম।"

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "সবাই পুরুষ মানুষ ?"

"উঁহুঃ, কালী শুধু মেয়ে, সে তেমন দৌড়ুতে পারত না,—কেবল চোর হ'ত। সত্য দাদা কখনও চোর হ'ত না, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হ'ত,—সেও আমাকে রাগাবে বলে—"

"তুমিও দৌড়োদৌড়ি খেলতে ?"

"হ্যাঁ ত, তোমরা খেল না ?"

মেজ মেয়েটি ঘাড় নাড়িল; সকলেই একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। একজন কহিল, "সত্য দাদা কে ?" গৌরী এবার প্রীতিপ্রফুল্ল হাস্যের সহিত উত্তর দিল, "সে আমার বন্ধু।"

তাহার নূতন বন্ধু কহিল, "সে কি ভাই! মেয়ে মানুষের বুঝি আবার ব্যাটা ছেলে বন্ধু হয়!" এই আশ্চর্য্য যুক্তি শুনিয়া গৌরীর পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইল। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, "কেন হবে না ভাই ? সত্যি সত্যি সে আমার খুব বন্ধু!"

৩০

কলিকাতায় সত্যকে লইয়া থাকিবার জন্য মণীশ যে বাসা বাড়ীটা ভাড়া করিয়াছিল, তাহার নীচের তলার ঘর কয়টা দিনে পাড়ার দরিদ্র বালকদিগের পাঠশালা ও রাত্রে নৈশ বিদ্যালয় রূপে ব্যবহৃত হইত। পাঠ্য পুস্তক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় এবং সংস্কৃত নীতি শ্লোক হইতে সরল বঙ্গানুবাদ—হস্তলিখিত একখানি চটি বই। এ [illegible] বালির কাগজ

স্ত থাকের কলমের সর্ব্বদা প্রয়োজন। একখানি ছুরি হাতে মণীশ হাসিমুখে মুখভাঙ্গা কলম কাটিয়া ছাত্রদলকে যোগান দিতেছে, লেখার ঘটায় ক্ষণে ক্ষণে সমরক্ষেত্রে ব্যবহৃত তরবারিবৎ লেখনী বিগতশীর্ষ হইয়া পুনশ্চ তাহার হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। পাঠকলরব পাশের কামারের দোকানে লোহা পেটার শব্দ ছাড়াইয়া উঠিয়া পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, কিন্তু এই অশুদ্ধ অস্পষ্ট-উচ্চারিত শব্দলহরী শিক্ষক মণীশের চিত্তে বিশুদ্ধ আনন্দ-রসের সঞ্চার করিত। দেশের শ্রমজীবি-দলই দেশের আশা,—কৃষিকার্য্যে, শিল্পোৎপাদনে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এ সমস্ত বিষয়ে তাহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি; ইহাই মণীশের ধারণা। মণীশ যেথানেই থাকুক, এ কথা সে ভুলিয়া থাকিতে পারে না।

প্রাচ্য সাহিত্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পুণ্য তপোবন তাহার সম্মুখে সুরচিত, এবং পাশ্চাত্যের স্বদেশ-প্রেমের জলন্ত জীবন্ত ইতিহাস তাহার নেত্রপথে পার্থিব জীবনের বিশাল রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্তরের মধ্যে প্রাচ্যকে বরণ করিয়া বাহিরে উদীচির সাধনায় তাই সে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল। মণীশ বুঝিয়াছে, যাহা প্রতীচ্যে পাওয়া যায়, প্রাচ্যের মধ্যে তাহার কোন সাধনার অভাব নাই, তাই আধুনিক প্রতীচীকে তাহার বাহিরের আড়ম্বর-আবরণ-মুক্তরূপে বরণ করিলে পুরাতন প্রাচীকে গ্রহণ ভিন্ন ত্যাগ করা হইবে না। বিশ্বপ্রেমিক আর্য্য ঋষি স্বদেশ-প্রেমের গণ্ডীতেই শুধু বদ্ধ ছিলেন না। যাঁহারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই উদ্দেশ্যে মৈত্রী পোষণ করিয়া

আসিয়াছেন, তাঁহারা দেশকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করেন নাই,—এত বড় হাস্যকর কথা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ! জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, সে এই দেশেরই কথা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়া মণীশ আপনার জীবনটাকে গড়িতেছিল বলাও যা, এবং সে নিজেকে তাহার গুরুর আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, বলাও সেই একই কথা। সে এই দুই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কার্য্য-প্রণালীর মাঝখানে বড় একটা ব্যবধান দেখিতে পাইল না, এখানে যাহা ছিল, সেখানে তাহারই অনুসরণ চলিতেছে, চক্র ঘুরিয়া গিয়াছে মাত্র। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে হিন্দুশাস্ত্রের ছাঁকা তথ্যগুলিই সাজান দেখিয়া সে পুলকিত হইল। খৃষ্টের জীবনে প্রাচ্য যোগীর সিদ্ধৈশ্বর্য্যের সহস্র উদাহরণ-দর্শনে সে বিস্ময়ানন্দ উপভোগ করিল। যেখানে তাহার চিত্ত ও কল্পনা দ্বিধা বা বাধা প্রাপ্ত হইল না, সেখানে চারিদিকেই সে নিজের দেশকে ও ইহার অধিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইল। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন এক অবিচ্ছিন্ন পরিবারের মত তাহার চক্ষে আপনার হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এত দিন সে সম্পূর্ণরূপে না তাহার দেশকে না তাহার গুরুকে চিনিতে পারিয়াছিল। এত দিনে সে উভয়ের প্রতিমান্তরালবর্ত্তী প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইয়াছে। আনন্দে বিস্ময়ে ভক্তির গাম্ভীর্য্যে তাহার সমস্ত হৃদয় নত হইয়া আসিল। ইহার মাঝখানে সে নিজের পিতা ও পিতৃব্যের স্থানও নিতান্ত নিম্নে দেখিল না। ত্যাগ, আনুগত্য, দৃঢ়তা অনুকরণীয় মহত্ত্বে পূর্ণ

এই দুই সহোদর এই দেশেরই আদর্শ। কিন্তু হায়, আদর্শ ক্রমেই মলিন হইয়া আসিতেছে। দেশকে যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যাবেক্ষণ করিতেছিল, ততই তাহার অন্তরের মধ্যে একটা গভীর বেদনা জমিয়া উঠিতেছিল, একটা যন্ত্রণার নিশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বলিতে ছিল, হায়, এ কি হইয়াছে! আরও কি হবে? আমেরিকা-প্রবাসী বিবেকানন্দ স্বামীর কার্য্য-কলাপ প্রতি পত্রে সে নিশ্বাস রোধ পূর্ব্বক সংগ্রহ করিতেছিল। তাঁহার উপরই যেন সে এই দেশের ভবিষ্য ভাগ্যটা অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে, এমনই ভরসা স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। কত বিনিদ্র রাত্রে সে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে করিতে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িত যে, তাহার চক্ষের সম্মুখে সেই সুদূর আমেরিকার বিশাল জনসঙ্ঘপূর্ণ মহাসভা জীবন্তরূপে ভাসিয়া উঠিত। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সকৌতুক দৃষ্টিতলে সেই বাল-কান্তি তরুণ মূর্ত্তি বঙ্গ যুবা,—বালক বলিলেও চলে,—কি উন্নত মহামহিমার মুকুটমণ্ডিত শিরে দাঁড়াইয়া! সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মসঙ্ঘের মহামনীষীগণের মুকুটমণি ম্লান করিয়া এই নবীন বালক আজ সমুদয় জগতের সম্মুখে জগতের একমাত্র সত্য প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম-জগতের বিজয় মালা গ্রহণ করিয়াছেন। বিজয়ী শঙ্করের মত সেই তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি মণীশ নিঃস্পন্দ নেত্রে চাহিয়া দেখিত। তাহার কর্ণে যেন সেই দূরাৎদূর হইতে অপার জলধি ভেদ করিয়া তাঁহারই কণ্ঠ পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিত, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" সে মন্ত্র মুগ্ধবৎ যেন কাহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া মুক্ত জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইত। স্বপ্নভাবময় দুই নেত্র

সীমাহীন নীল আকাশের মধ্যস্থ, পৃথিবী হইতে দ্বাদশ গুণ বৃহৎ সমুজ্জ্বল বৃহস্পতি গ্রহের উপর স্থাপন করিয়া সেই অভয়মন্ত্র আহ্বান মন্ত্র যেন শব্দবহ আকাশের মধ্যে স্পষ্টস্বরে ধ্বনিত হইতে শুনিত, "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" তাহার উপর হইতে একে একে সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার আবরণ শিথিল হইতে হইতে একেবারে খসিয়া পড়িত। সে নিজেরও অজ্ঞাতে যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নিয়োজিত, কোন সবল বাহু কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া সেই অসংখ্য গ্রহজ্যোতির্ম্মণ্ডিত অনন্ত রহস্যময় আকাশের মধ্যে নিজের সীমা হারাইয়া ফেলিয়া, আত্মহারাবৎ সেই আহ্বান-মাত্র শ্রবণ করিতে থাকিত। কখনও দুই বাহু জানালার বাহিরে প্রসারিত করিয়া দিয়া গভীর স্বরে সেই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিত, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

কিন্তু তাই বলিয়াই কি মণীশ পৃথিবীর অপর কোন ছোট বড় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছিল? কিছু না,—জগতের বড় বড় মনীষীরা বিশ্বরহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনকার্য্যে যে মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন, ক্ষুদ্র শিশুর চিত্ত-হর ক্রীড়া কৌশল আবিষ্কারেও সে মস্তিষ্ক বাধা প্রাপ্ত হয় না। মণীশ চিন্তা ও কল্পনায় অনেক বড় বড় বিষয়ে চিত্ত নিযুক্ত রাখিলেও সেখানে আর কিছুর প্রবেশাধিকার ছিল না, এমন নহে। স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা, আত্মীয়-জনের প্রতি প্রত্যাকর্ষণ প্রভৃতি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সহিত মানব-চরিত্রে আর একটা যে মানবীয় ভাবের স্ফুরণ স্বাভাবিক, মণীশের মধ্যে সেই শক্তিও ক্রমে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী, জড় চেতন সমুদয়ের উপরই যখন সে প্রীতি ও প্রেমানুভব

করিতেছিল, তখন তাহার মাঝখানে যে নিতান্তই তাহার আপন ;—জন্মজন্মান্তর ধরিয়া যাহার জীবন তাহার সহিত সংযুক্ত ;—সেই কমলাকে বাদ দিলেই বা চলিবে কেন? দেশকে, কাকাকে, সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সে তাহার জীবনের আদর্শ করিয়াছিল, কিন্তু কমলা ও সত্য তাহার জীবনের কেন্দ্র। দিবসে কর্ম্মের কলরোলে যদি বা সে বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তথাপি রজনীর বিশ্রামমুহূর্ত্তে জলন্ত চিতা-বহ্নির লোহিতালোকে সৈকত-শয়ানা কমলার সকরুণ মুখচ্ছবি তাহার জাগরিত নেত্রে এবং সুপ্ত চিত্তে অকস্মাৎ ভাসিয়া উঠিতে বাধা পাইত না। আবার এক দিনের কথা! সেই অস্তগামী তপনের সম্মোহন গোধূলি-আলোকে সদ্যঃস্নাতা কুমারীমূর্ত্তি! মণীশের সারা প্রাণ পুলকে শিহরিয়া উঠে। সেই কমলা, সেই সন্ধ্যা-তারকা, আজ তাহার জীবনের ধ্রুবতারা।

মণীশ কবি নয়, তাহার আশা-স্বপ্নে মরক্কোমণ্ডিত খাতার পৃষ্ঠা পূর্ণ হয় না, তাই তাহার সবটুকুই তাহারই শান্ত হৃদয়ের নিভৃত নিরালয় গোপনে অথচ তাহাদের পরিপূর্ণ শোভা-গৌরবে মধ্যরজনীর সুগন্ধ কুসুমের মত বিকশিত হইয়া থাকে। একটু অবকাশ পাইলেই সে একা বসিয়া নিজেই তাহার গন্ধ ঘ্রাণ করে, চয়ন করিয়া মালা গাঁথে, এ গোপন আনন্দে তাহার অংশী কেহই ছিল না। তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার আশা, তাহার কল্পনা সোণার জলের অক্ষরে ছাপাইয়া সে যেন তাহার বুক্-সেল্‌ফে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অপরের হস্তস্পর্শে সে খাতার নূতন মলাট সে মলিন হইতে দেয় নাই।

মণীশ কল্পনা করিত, একটা গ্রহের চারিদিকে যেমন কয়েকটা

উপগ্রহ অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই তাহার খুড়া ও খুড়িমাকে আশ্রয় করিয়া প্রতি সুখে দুঃখে লাভে লোকসানে বিশ্রামে উদ্দীপনায় কর্ম্মে অবসরে সে ও কমলা নিজেদের উৎসর্গ করিয়া রাখিবে এবং দিবস ও রজনীর মাঝখানে মধুর সন্ধ্যার ন্যায় তাহাদের দুইজনের মাঝখানে তাহার লক্ষ্মণ ভাইটি চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বাধাহীন বিপ্লব-বিরোধবিহীন এবং বিচ্ছেদ পরিশূন্য এ জীবন,—ইহা সত্য উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সফল।

মণীশ এখানে একজন সহকর্ম্মী পাইয়াছিল। সে ছেলেটীর নাম ইন্দুভূষণ। ইন্দু গরীবের ছেলে। কষ্টেসৃষ্টে মেসের একটি একতালা ঘরে বাসা লইয়া পড়িতেছে। বয়সে মণীশের অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও দুইজনের মধ্যে অল্প দিনেই একটু বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। সকালে নিজের পড়াশুনা থাকে, রাত্রে নৈশ শিক্ষায় ইন্দুভূষণ মণীশের সহকারী। এক একটা ছুটীর দিনে সে আসিয়া মণীশকে তাহার গৃহের কোটর হইতে টানিয়া বাহির করিত। সত্য এই একমাত্র কারণেই শুধু ইন্দুদা'র উপর সন্তুষ্ট। একদিন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ছেলেদের চড়ি-ভাতি উপলক্ষে ইন্দুর মারফৎ মণীশের পুরাতন সহপাঠী দল হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। এ সকল স্থলে সঙ্গীত তর্ক প্রভৃতি অনেক ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা; তাই সে সহজে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হয় নাই। কিন্তু অনুরোধ এড়ানও তাহার কর্ম্ম নয়, কাজেই যাইতে হইল।

স্বভাবের অনুকরণে মানব হস্ত গঠিত সুবৃহৎ উদ্যান তখন প্রসন্ন সূর্য্যকিরণে অতুল শ্রী ধারণ করিয়াছে। ডেলি পেসেঞ্জারির

হাত এড়াইয়া পাখীগুলা কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দ কলরব করিয়া ঘুরিতেছিল, তাদিকুঞ্জের শান্তিভঙ্গ করিয়া এক সঙ্গে কতকগুলি তরুণ কণ্ঠের তরল হাস্য নিশ্চিন্ত কানন দেবতাকে চকিত করিয়া তুলিল এবং সেই শব্দে কমলদাম কাঁপাইয়া সন্তরণশীল রাজহংস দুইটি ত্রস্তে গভীর জলে পলাইয়া গেল।

শ্যামল শষ্পাসনে বসিয়া পড়িয়া দুই চারিটী বন্ধুতে এক অজানিত গাছের পরিচয় লইয়া তুমুল তর্ক পাকাইয়া তুলিল। একদল রন্ধনের জন্য সহস্র-শাখা-প্রসারিত প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষতলে সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ইহাদের মধ্যে ভাবপ্রিয় বন্ধু কয়টি মিলিয়া না তর্কে না কর্ম্মে যাগ দিয়া কেহ নির্জ্জন প্রকৃতির অতুলীয় শোভা সম্পদ উপভোগ করিতে লাগিল, কেহ বা গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

মলয় বাতে সুপ্রভাতে তারেই পড়ে মনে,
সে যে মিশে আছে ফুলের বাসে—
ও সে জেগে আছে পাখীর গানে।

নলিনাক্ষ নীরব মণীশকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শচীর 'ক্ষণিকের দেখা' পেয়েছ ?"

"আমি ? কই না, আমি ত পাইনি ছাপা শেষ হয়ে গেছে না কি ?"

"সে কি ? তুমি জান না ! কাগজে কাগজে সমালোচনা বেরিয়েছে, দেখ নি ? চমৎকার বই হয়েছে। কবি ত আমাদের কবি !"

মণীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমি ত কই দেখিনি।"

"দেখনি! আশ্চর্য্য মানুষ তুমি মণীশ! সংসারের কোন খবরই রাখ না! যাক্,—এখন শচী যে তোমায় বই পাঠালে না, এর মানে কি? চিঠিপত্র লেখে ত?"

এবার নৈহাটী ষ্টেশনে সেই বিদায়ের পর শচীকান্ত তাহাকে একখানাও পত্র লেখে নাই। মণীশ ক্রমান্বয়ে তিনখানা পত্র লিখিয়া এখনও পর্য্যন্ত উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিল। বন্ধুর ব্যবহারে সে একটু আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু এ ভাব প্রকাশ না করিয়া কথাটা সে ঘুরাইয়া লইল, বলিল, "বইখানা বেশ ভাল হয়েছে না?"

"চমৎকার!"

দেখিতে দেখিতে আরও দুই এক দল আসিয়া উপস্থিত হইল। অমল লৌহ বেঞ্চ অধিকার করিয়া বেহালা বাজাইয়া গান ধরিল।

এই সময় কুমুদ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চমৎকার?"

"শচীকান্তর 'ক্ষণিকের দেখা'।"

"ওঃ, প্রেমের কবিতা! রাবিস্!" এই বলিয়া সে গুন্ গুন করিয়া গাহিল, "ছেড়ে দাও প্রেম-গীত ভারত ভিতরে রে।"

নলিনাক্ষ শচীকান্ত-কবির প্রধান ভক্ত। সে কুমুদের এই তাচ্ছল্য সহিতে পারিল না, উত্তেজিত স্বরে কহিল, "প্রেমের কবিতা এত তুচ্ছ! ত হলে বল্‌তে চাও, শেলি, বায়রন্, কীট্‌স, সবই রাবিস্! মেঘদূত বিরহী যক্ষের প্রেমলিপি যখন, তখন সেও তোমার মতে রাবিস্?"

কুমুদ মৃদু হাসিল, "তা না ত কি!" পরে গাহিয়া বলিল, "জান না কি কিসে সদা তপো নাশ করে রে!"

নলিনাক্ষ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, "বল কি, তুমি? সমস্ত সাহিত্যের পুষ্টি, সংসারের প্রধানতম ঐশ্বর্য্য, সেই জিনিষটাকে তুমি—ছ্যাঃ, এমন অর্ব্বাচীনদের মধ্যেও কবির অভ্যুদয় হয়! বল্‌লুম শচীকে ইংরেজিতে বইটা তর্জ্জমা করে ছাপা, তারা যোদ্ধার জাত বটে কিন্তু তারাই যথার্থ বোদ্ধা। বেনাবনে মুক্তো ছড়ালে এই ফল হয়! দেখচ, কাগজগুলো কি বলেচে? তুমি, আমি, রামী শ্যামী 'রাবিস' বল্লেই ত আর রাবিস হবে না। দশের কাছেই সাঁচ্চা ঝুটোর বিচার। বলে কি? বিরহী যক্ষ!—হাঃ কালিদাস!"

কুমুদ অনুত্তেজিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল, রেখে দাও তোমার বিরহী যক্ষ! ঐ দেখ না, মে-ঘ-দূ-ত! উদ্ভট ব্যাপার! তার চেয়ে পড়—'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।' হাঁ, বুঝি, কিছু সার আছে। কাব্য বল ত মেঘনাদবধ।—'রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে! ফুলদল দিয়া কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে!' এতে গাম্ভীর্য্য কত! যেমন ভাষা তেমনি ভাব! তা না প্যানপ্যেনে সুরে নাচারি ছন্দে একঘেয়ে কাঁদুনির গান 'নয়নজলে গেঁথেছি মালা পরাব কায়? তোমার সাথে ক্ষণিক দেখা বিজলী প্রায়,'—একে বলে, কবিতা? আরে বাপু, 'বিজলী-প্রায়' যার সঙ্গে 'ক্ষণিক দেখা', তার জন্যে এত কান্না-কাটিই বা কেন? যেন শকুন্তলা! "হলা সহি অনসূয়ে'—বলে ডেকে পদ্ম-পত্র পেতে শুলেই হয়!"

"অরসিকেষু রহস্য নিবেদনম্"—কবি বড় দুঃখেই একথাটা বলে

গেছেন।” নলিন মুখ ভার করিয়া ঘাসের উপর সজোরে ছড়ি ঠুকিতে লাগিল। বেহালা-বাদকের সঙ্গীত আপনার মাধুর্য্যের ভারে আপনি কম্পিত হইতেছিল। অনেকগুলি শ্রোতা জমিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন তার্কিকদলকে তাড়া দিয়া বলিল, “আরে ছিঃ! এমন কতকগুলা অসার জল্পনা নিয়ে কথা কাটাকাটি! তোদের প্রাণে একটুও রস নেই!”

আর একজন বলিল, “তোরা না শুনিস্ নাই শুন্‌বি বাপু, এত বড় বাগান আছে,—উঠে যা না। তোদের ও সব লিরিক্‌ফিরিক্ ওর তার তর্কর চেয়ে অমলের গলা আর আর বেহালার স্বর দুটোই ঢের মিষ্টি।”

ইন্দুভূষণ এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আগাগোড়া স্তব্ধ মণীশের নিকট সরিয়া আসিল। কহিল, “চুপচাপ বসে যে? শ্রোতা না অন্য কিছু?”

মণীশ চকিতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি উঠাইল। তাহার ললাট ও কর্ণমূল লাল হইয়া গিয়াছে। সে কহিল, “অন্য কি আবার?”

“এই কবি কিম্বা—? না দুটোই?”

সে “না” বলিয়া হাসিতে গেল কিন্তু হাসিটা ভাল ফুটিল না। বুকের মধ্যে খানিকটা রক্ত একটু জোরে হৃৎপিণ্ডে গমনাগমন করিতে লাগিল। যাহা সে নিজের মনে প্রাণে প্রত্যক্ষ করিতেছে, কেমন করিয়া তাহাকে অস্বীকার করিবে? সে সফল কবি—সার্থক প্রেমিক। ইন্ধন-প্রাপ্ত দীপ্তশিখ হোমানলের মত নির্ম্মল প্রেম তাহার জীবন-যজ্ঞ-কুণ্ডে চির-অনির্ব্বাণ। সে মুখ নত করিয়া জলের উপর রাজহংসের ক্রীড় দেখিতে লাগিল। বেহালাটার তালে তালে

পুলকের একটানা স্রোত হৃদয়-তটের উপর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া ব্রীড়াবনতমুখী নববধূর মত তাহাকে রাঙ্গাইয়া তুলিতে লাগিল, তাহার মানস-নেত্রে তখন স্বর্ণরেণু মণ্ডিত অপরাহ্নে নম্র-মুখী তরুণীর মধুর মূর্ত্তি সলিলোত্থিত কমলের মতই অতর্কিতে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভাগ্যে আজ বন্ধু শচীকান্ত এখানে উপস্থিত নাই. থাকিলে এখনই হয়ত তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহার ভয় বৃথা! লোকে তাহাকে এতই অপদার্থ ঠাহর করিয়া রাখিয়াছে যে এমন সন্দিগ্ধ ভাবেও কেহ তাহার প্রতি সন্দেহ করিল না। ইন্দুভূষণের প্রশ্নটার উত্তরে থতমত খাইয়া "নাঃ"—বলিয়াই সে থামিয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার সমুদয় চেহারা ও ভাবটা উচ্চৈঃস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিতেছিল, বলিতেছিল, "হুঁ"। কিন্তু ইন্দুর দিকে লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই নলিনাক্ষ তর্কের বিরক্তি প্রশমিত করণার্থ অগ্রাহভাবে কহিয়া উঠিল, "ইস্ প্রেমিক! কবি! মণীশ?—হরি বলো! পুস্তক-কীট মণীশ না হলে—ইন্দু, তুই যাহোক প্রেম ও কাব্যের খুব দর বুঝেছিস! মণীশ,—কল্পনা যার কাছে ঘেঁসতে ভয় করেন, কাব্যলক্ষ্মী যার জানালার ধারে উঁকি দিতে কোন দিন সাহস করেন ন, সেই কলির মহাদেব হলেন,—তোদের জালায় আর বাঁচিনে।"

মণীশ মুখটা আর একটু নত করিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিল! সে হাসিটুকু সুস্পষ্ট অক্ষরে যেন বলিল, "ওগো, মহাদেবকেও অতখানি বিশ্বাস করিও না। একদিন তরুণী পার্ব্বতী তপোবনে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য দেবলোকের ষড়যন্ত্র কৌশলে সেই যোগি-রাজেরও তপোবিঘ্ন সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তারপর কঠোর

আরাধনায় সর্ব্বজয়ীকেও পরাজিত করিয়াছেন। কাহাকেও আর ভরসা নাই।”

কুমুদ গুন্‌গুনানি পরিত্যাগ করিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে লাগিল, “পূত রামায়ণী কথা, প্রতাপের বীরগাথা, গাও সবে প্রাণ ভরে নগরে নগরে রে!”

সে দিনের আমোদ প্রমোদ শেষে প্রত্যাবর্ত্তন কালে স্তব্ধ মণীশ নৌকায় বসিয়া গঙ্গাতীরে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল। সে আজ কমলার প্রতি তাহার অন্তরের আকর্ষণ আরও যেন প্রবলভাবে অনুভব করিতেছে। সে পুস্তক-কীট হউক, তাহার প্রকৃতি গম্ভীর হউক, তাহা প্রকৃতির মতই স্নেহ-সম্পন্ন। চপলতা শূন্য চিত্ত বরং নিস্তরঙ্গ জলরাশিবৎ এক গভীরতা মাত্রকে আবরণ করিয়া অন্তর-কেন্দ্রে একখানি চন্দ্রচ্ছায়াকে প্রতিফলিত রাখিতে সক্ষম। স্নিগ্ধ শীতল একনিষ্ঠ প্রেম সে মনে মনে তাহার একমাত্র প্রেমপাত্রীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত করিয়াছে। সে নাই হোক কবি,—কিন্তু সে যে প্রেমিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশাল বারিধির মতই তাহার এ অফুরন্ত প্রেম এক জন্মের নয়, অনাদি প্রভাতে এই জীবনী-ধারার সহিতই তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, অনন্ত জীবনে ইহার স্থিতি! যদি এ জীবন সান্ত হয়, তবেই ইহারও অন্ত হইবে। মণীশ কল্পনা সুখ পূর্ণ চিত্তে প্রস্থানোন্মত সূর্য্যের দিকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়াই যেন চাহিল। নদীর প্রশস্ত বক্ষ ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণীর বিচিত্র রেখায় খচিত, দুই তীরে জনপদ, জনপথ, তীর তরুদল, হিমায়মান হেমন্ত-সন্ধ্যায় ধূমায়মান, ছায়াচ্ছন্নপ্রায়। সারি সারি কলের চিমনির ধূমে আকাশের ম্লানতা

মলিনতর দেখাইতেছিল। জীবনের পথে প্রবেশোদ্যত তরুণের সহিত, জীবনের শেষ প্রস্থানোদ্যত প্রবীণের এক মূহূর্ত্তে যেন চোখে চোখে মিলিয়া রহিল। সারা জগৎ—জড় অচেতন জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তখন তাঁহারই মধ্য দিয়া "তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্" বলিয়া বিশ্বস্রষ্টা বিধাতাকে বন্দনা করিতেছিল। মণীশ নীরবে চাহিয়া রহিল। আসন্ন সন্ধ্যাতলে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর রক্তরাগের মধ্যে একখানি করুণ মুখের ছায়া তাহারই নেত্রের সম্মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কে যেন কাণের কাছে বলিতেছিল "এক ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষরূপে, জীব ঈশ্বর রূপে দ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" পুলকোচ্ছ্বসিত-বক্ষে মণীশ স্বপ্নমুগ্ধবৎ মনে মনে উচ্চারণ করিল, "তাই তোমায় দেখে আমার সব বদলে গেছে কমল!"

সুখস্বপ্নাভিভূত শিশুর মত মৃদু হাসি অধরে লইয়া মণীশ গৃহে প্রবেশ করিতেই সত্য কহিল "এই যে একটা চিটি এসেছে দেখছি—বাবার লেখা। দেখ ত আমাদের বড় দিনের ছুটিতে যেতে বলেছেন কিনা?"

মণীশ খামটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "তোর কেবল বাড়ী যাবার ভাবনা। তবু ত দলের সেরা সঙ্গীটি সেখানে নেই।"

দলের সেরাটি হইতেছেন, গৌরী। তাহার আকস্মিক প্রস্থানে সত্য বিশেষ খুসি হয় নাই, বরং ইহা যে তাহার পক্ষে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, এই যুক্তির উপরে সে তাহার প্রতি একটা দুর্জ্জয় অভিমান পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। সম্ভ্রভঙ্গে তাই তাহার প্রতি তাচ্ছল্য দেখাইয়া কহিয়া উঠিল—

"ওঃ! সে না থাকলেই বা, আমার ত ভারী তাতে বয়েই গেল! বৌদি ত আছে।"

মনীশ চিঠিখানার ভাঁজ খুলিয়া সস্নেহ-নেত্রে ভায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসি হাসিল, কহিল,—"এখানে আমিও ত আছি। আমার চেয়ে বুঝি তোর—যে সে একজন বেশী হল?"

"ও কি দাদা! বৌদি বুঝি যে সে?" সত্যর স্বর তিরস্কারপূর্ণ। দাদা যেন এই গঞ্জনাটুকু শুনিতে চাহিতেছিলেন, তৃপ্তচিত্তে সকৌতুকে হাসিয়া তিনি পত্রপাঠে মন দিলেন।

কিন্তু এ কি সংবাদ! কাকা লিখিয়াছেন,—"ছুটী হইলেই দুই-জনে চলিয়া আসিও। ভ্রাতৃবিয়োগে তোমার খুড়ীমা একেই অত্যন্ত কাতর, তাহার উপর সম্পূর্ণ একা,—বিশেষতঃ কমলার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। এ সময় তোমাদের কাছে পাইলে আমরা একটু শান্তি পাই—"

কমলার জন্য ব্যাকুল! সম্পূর্ণ একা! কি অর্থ ইহার,—অর্থ কি? অপঠিত অংশে হয় ত এ ঘোর সমস্যার পূরণ হইতে পারে, কিন্তু পড়িতে যে আর সাহস হয় না! কমল,—কমলা কি তবে ঋষিশাপ ভ্রষ্টা কমলার মতই অতল সমুদ্রের তলদেশে অকস্মাৎ অন্তর্হিতা হইয়াছে? সে কি তবে নাই?

৩১

শচীকান্ত যখন রত্নপুকুরে ফিরিয়া আসিল, গিরিজাসুন্দরী ও কল্যাণী উভয়েই অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কয়লার চুল্লী হইতে সদ্য উঠিয়া আসিলে, মানুষের যেমন ঝলসান

চেহারা হয়, তাহাকে ঠিক তেমনই দেখাইতেছিল। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে সে গম্ভীর মুখে কহিল, "অসুখ করেছিল।"

মাসি কহিলেন,—"মরে যাইরে! শরীরটা একেবারে কিছু না। একটু অনিয়ম হলেই রাংয়ের মত গলে যায়। যেন ডাইনে চুষে খেয়েছে!" বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও গ্রামের কবিরাজ আসিয়া শিরঃ-পীড়ার জন্য ভৃঙ্গরাজ তৈলের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। 'পোষ্টাই' হইবে বলিয়া গৃহিণী দুই মোড়া রসসিন্দুর মকরধ্বজ কাঁচা দুগ্ধের সহিত প্রাতে সন্ধ্যায় স্বহস্তে মাড়িয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। শচী-কান্ত বিশেষ আপত্তি তুলিল না। অকস্মাৎ একটা ভয়ানক আঘাত লাগিলে মানুষ অনেক সময় যেন কি এক প্রকার উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়,— সে যেন সেইরূপ বিহ্বলপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। এ আকস্মিক আঘাত যে স্বপ্নেরও অগোচর!

গিরিজাসুন্দরী কয়দিন ছেলের অসুখ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, রোগ সারিলেও তাহার মুখের উপর একটা আরোগ্য-বিহীন ক্লান্তির ঘন ছায়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মৌরসী পাট্টা লইয়া বিস্তৃতই হইতে থাকিল, তখন হঠাৎ খপ্‌ করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, এ অসুখটার মূল শরীরের মধ্যে হয়ত না-ও থাকিতে পারে! একদিন সুযোগমত হতাশার কালিমা-ব্যাপ্ত তাহার ললাটে হস্ত বুলাইয়া গভীর স্নেহের সহিত তিনি কহিলেন,—"এমন হয়ে যাচ্চিস্ কেন,—বল্‌ত শচি? কি ভাবিস্? মনে একটুও সুখ নেই কেন?"

মানুষের মন যখন বড় দুর্ব্বল থাকে, তখন সে নূতন আর কোন সুখ দুঃখ বা সহানুভূতির ভর সহিতে সক্ষম হয় না। মাসি-

স্বর আদরে তাই অকস্মাৎ তাহার ব্যথিত চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল : দুই চোখের কোণে জল দেখা দিল। দৃষ্টি নত করিয়া গাঢ় স্বরে সে কহিল,—"কি আর ভাববো মাসিমা ?"

"তাই ত বল্‌চি, তোর ভাবনা কি ? আমি যত দিন আছি, তুই নিশ্চিন্ত থাক্। আমার যা কিছু আছে, দু ভাগ করে দেবো।" শচীকান্ত গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এ আশ্বাস আজ আর তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, সাংসারিক লাভ ক্ষতি আজ তাহার নিকট নিতান্তই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর একদিন অসময়ে গিরিজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ছোট বউয়ের বাপ বলে পাঠিয়েছেন, যে পাত্রটি বসীর জন্য ঠিক করেছিলেন, সেটি বে-হাত হয়ে গেছে। তোর সঙ্গে বিয়ে হয়, তাঁর খুব ইচ্ছা, কি বলিস্ ?"

শচীকান্ত কোন কথা বলিল না। সে কি বলিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যে আশা জন্মের মত ফুরাইয়াছে, তাহারই স্মৃতি বক্ষে জড়াইয়া কাঁদা ভাল, না, হাহাকার রুদ্ধ করিয়া নবীন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা উচিত ? একজন তাহার করতলাগত এবং অপরজন অতল জলতলে স্খলিত। কিন্তু মন তথাপি সেই প্রার্থিত-দুর্ল্লভের জন্য অস্থির ! আর বাসন্তী বালিকার নির্ম্মল জীবনকে বিষদিগ্ধ করিবার তাহার কি অধিকার আছে ? তাহাকে নীরব দেখিয়া গিরিজা প্রসন্নমুখে কন্যাকে কহিলেন,—"তোর কথা ঠিক রে! বসীকে বিয়ে কর্‌তে শচীর অমত নেই।"

শচীকান্ত মাসিমার মনের কথা বুঝিতে পারিল না। সে গভীর চিন্তায় আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়াছিল। তেমনই অর্থহীন,

আশাহীন, নিরানন্দ চিন্তাস্রোতে সে ভাসিতে লাগিল। প্রাণটা তাহার অকূলের তীরে পারের-যাত্রীর মতই হতাশ্বাসে ক্রমাগত লুটাইয়া পড়িতেছিল, কেবলই মর্ম্মভেদী স্বরে বলিতেছিল,—তাহাকে আর না দেখিতাম, সে সহ্য হইত, কিন্তু এ যে অসহ্য,—অসহ্য! আজ এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ কি বজ্রাঘাত! সে দিন সেই তরুণী তাহার এই অলস চিত্ত-বীণার তারে তারে যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, আজও তাহার ললিত সুর স্তব্ধ হয় নাই। প্রাণ যে সেই এক দিন অকস্মাৎ পূর্ণ হইবার জন্য তাহার সমুদয় আশা-তৃষ্ণাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, আজও সে তৃষ্ণা তেমনই প্রবল! কবি-কুঞ্জে সঙ্গীতের সুরে পুষ্পবাসে, পত্র-মর্ম্মরে, এবং জীবন-নিকুঞ্জে একমাত্র সুখশান্তিরূপে সে যে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে! কিন্তু মৃত্যু আসন্ন হইলে হাত পায়ের তলা গুলা প্রথমে যেমন ঠাণ্ডা হইয়া আসে, কিন্তু শরীরের মধ্যে তখনও নাড়ীর সঞ্চারে প্রাণের স্পন্দন বুঝিতে পারা যায়, এই সুগভীর হতাশার মধ্যেও তেমনই বিন্দুমাত্র সংশয়পূর্ণ আশা শচীকান্তর বক্ষকে ঘন ঘন স্পন্দিত করিতেছিল। মণীশ লজ্জায় অস্ফুট কণ্ঠে যাহাকে তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ বলিয়া উল্লেখ করিল, বহু পূর্ব্বেই যে শচীকান্তর সহিত তাহার বাগ্‌দান হইয়া গিয়াছে,—এ কথা তাহারা কেহ জানে না। তাহার ধর্ম্মভীরু পিতা নিশ্চয় এ সংবাদ পাইলে কমলাকে মণীশের পরিবর্ত্তে শচীকান্তর ভাবী বধূরূপেই অঙ্গীকার করিবেন। এই আশার উপর নির্ভর করিয়া বারবার দ্বিধা সরাইয়া অবশেষে সাহস-সঞ্চয়পূর্ব্বক তাঁহাকে সে একখানি পত্র লিখিল।

"প্রণাম শতকে টি নিবেদন—

বহুদিবস আপনার সংবাদাদি প্রাপ্ত না হইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। আপনার নিকট একটি বিশেষ নিবেদন আছে। এই পত্রখানি পাঠ করিলে নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ হইবে যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে ইহা আপনি শিবু-কাকার মারফৎ আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। যে অনাথা বালিকা শিবু কাকার বাড়ীতে আশ্রিতা রূপে অবস্থান করিতেছে, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং একমাত্র অভিভাবক নিখিলনাথ বাবু তাহার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া আপনার আদেশ আনিতে আমাকে অনুরোধ করেন; আপনার আদেশ পাইলে তিনি ঐ কন্যা অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেন না, আমার সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তাও হয়। আপনার লিখিত আদেশ লইয়া ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, আকস্মিক বসন্তরোগে নিখিলনাথ মারা গিয়াছেন--কমলা ও তাহার পিতামহী কোথায় গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না।

সে পর্য্যন্ত বহু স্থানে তাহাদের সন্ধান করিয়াছি। সন্ধান পাই নাই। শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্তবয়স্কা বাগ্‌দত্তা কন্যা পরিণীতারূপেই গণ্যা হয়। যাহাকে মণীশের বাগ্‌দত্তা বলা হইতেছে, সে পূর্ব্ব হইতেই উৎসর্গিতা। আশা করি, আপনি এ বিষয়ে অনুধাবন করিয়া যথোচিত মীমাংসা করিবেন। মণীশ আমার আবাল্য বন্ধু; কিন্তু ধর্ম্ম তাহা অপেক্ষাও বড়। আমার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। সেবক—শচী"

পত্রখানা স্বহস্তে রেজিষ্ট্রী করিয়া আসিয়া সে কথঞ্চিৎ শান্ত

হইল। মন যখন নানা ছুতায় খুঁৎ খুঁৎ করিয়া উঠে, সে তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলে, এতই কি ভয়? লোকে বলে তিনি ন্যায়বান্‌, ন্যায় বিচার করিবেন না? মণীশ হয় ত দুঃখিত হইবে,—কিন্তু সেই মণীশ, সেই নারীদ্বেষী শঙ্করাচার্য, তাহার ইহাতে সুখ দুঃখ কি? হয় ত এ বোঝা নামাইতে পাইলে সে তাহাকে আশীর্ব্বাদই করিবে।

গিরিজা ও কল্যাণী দেখিল, এত দিন পরে শচীকান্তর মুখের ক্লিষ্ট ভাবটা অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। উভয়েই প্রসন্ন চিত্তে ভাবিল,—খেয়াল বাস্তবের নিকট চিরপরাস্ত হইয়া থাকে, বাসন্তীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শচীকান্ত গভীর অনুশোচনা ভোগ করিতেছিল, এত দিনে তাহা দূর হইয়াছে।

সে দিন চন্দ্র গ্রহণ। বাড়ীর প্রাচীনা আত্মীয়াদের সহিত ছপ্পর ঘেরা গো-যানে চড়িয়া গৃহিণী স্নানাদিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নদী-তীরে যাত্রাকালে কল্যাণীকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "ওরে, তোরা এই বেলা খেয়ে দেয়ে নে' না! কখন গ্রহণ লেগে যাবে, খাওয়া হবে না শেষে।"

শচীকান্ত ইজি-চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল,—কল্যাণী গিয়া ডাকিল, "ছোট্‌দা!"

"কিরে?"

"খাবে এস। গ্রহণ লাগবে কোন্ সময়।"—শচী মুখ তুলিল, কহিল লাগবে—লাগবেই,—তার জন্যে এখনি খেতে গেলাম কেন?"

কল্যাণী বিস্মিত স্বরে কহিয়া উঠিল,—"ওমা, গ্রহণের সময় বুঝি খেতে আছে! গ্রহণ রোগ হয় যে!"

"কারও হতে দেখেছিস ?"

কল্যাণী রাগ করিয়া বলিল,—"কেউ খায়, যে হবে? এস, এস, গ্রহণপাওয়া খাবারে পাপ স্পর্শ করবে। সব ফেলা যাবে আবার।"

শচীকান্ত আজ কয়দিন পরে একটু লঘুচিত্ত হইয়াছে; স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের লোভ ছাড়িতে পারিল না; হাসিয়া কহিল,—"পাপ লাগবে? আকাশের চাঁদে লাগবে গ্রহণ, আর মর্ত্ত্য বাসী বেচারা আমাদের খাবার গুলিতে লাগবে পাপ,—কোন্ অপরাধে?"

কল্যাণী এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মুখ চুণ করিয়া বলিল,—"কি জানি ভাই, সবাই এ কথা বলে ত, যে রাহু চাঁদকে খেয়ে ফেলে কি না, সেই জন্ম।"

"খেয়ে ফেলে না তোর মুণ্ডু করে! পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়লেই চন্দ্র-গ্রহণ হয়।"

তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া এই সময় গিরিজাসুন্দরী ডাকিতে আসিতেছিলেন; শচীকান্তর কথাগুলা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলে অবিশ্বাসে মৃদু হাসিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"তোদের যত গাঁজাখুঁরি কথা। চিরকাল ধরে রাহু চাঁদকে গিলে ফেলে, শুনে এলুম, চোখে দেখে এলুম—এখন হল, পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়ে! অবাক্ করলি! যা, যা, এখন খেতে যা, দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি চললুম।"

আহারে বসিয়া কল্যাণী বলিল,—"গ্রহণের সাত দিন কেটে গেলে পাকা দেখা করে এইবার বিয়ের দিন ঠিক হবে। ২৮শে অঘ্রাণই আমার ইচ্ছা, বিয়েটা হয়ে যায়। সে বেশ হবে, এদিকে পৌষ মাস পড়ে যাবে, আমাকেও আর শীঘ্র যেতে হবে না।"

শচীকান্ত যেন আকাশ হইতে পড়িল ; কহিল,—"কার বিয়ে রে ?"

"কিছু যেন জানেন না ! কার আবার ? তোমার।"

"আমার বিয়ে ? কার সঙ্গে ? সে কি ?" শচীকান্ত অন্ন গ্রাস পাত্রে নামাইয়া রাখিল।

কল্যাণী ঈষৎ রাগ করিয়া বলিল,—"কি যে বল ! কার সঙ্গে ? কেন, বাসন্তীর সঙ্গে। বিয়েতে তোমার মত আছে, মাকে বলনি ?"

"আমি ? না, কোন দিন না। কে বল্লে, আমি বলেছি ?"

কল্যাণী ভ্রাতার উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সহিত ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"তবে বোধ করি মার বুঝবার ভুল ! বাসন্তীকে বিয়ে করবে না, তা হলে ?"

শচীকান্ত পরিত্যক্ত আহার্য্য পুনর্গ্রহণ করিয়া কহিল,—"না, কোন মতে না। সে অসম্ভব !"

ক্ষুব্ধা কল্যাণী কিছু না বলিয়া যথাকার্য্য-সম্পাদনে মনোযোগী হইল। ক্ষণপরে প্রথম উত্তেজনাটা ঈষৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে একান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া শচী একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং সান্ত্বনা দিবার ইচ্ছায় পুনশ্চ কহিল,—"কেন জানিস ? আমি তার সন্ধান পেয়েছি।"

সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কল্যাণী কহিল,—"সত্যি ?"

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। যথাসময় কাশীধাম হইতে পত্র আসিল। তাহাতে অন্যান্য কথাবার্ত্তার সহিত লিখিত ছিল—

"তোমার বুঝিবার ভুল ! কমলা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মণীশেরই

বাগ্‌দত্তা বধূ। নিখিলনাথ তোমায় যথাশাস্ত্র বাগ্‌দান করেন নাই। অতএব বন্ধুপত্নীবোধে তাহার সহিত স্নেহ-সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক চিত্ত হইতে ভিন্নভাব বিদূরিত করিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার চিন্তার বিষয় জানিতে পারিলে মণীশের পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভব। সে তোমার প্রকৃত বন্ধু। বন্ধুর সুখে ঈর্ষা করিও না। শাস্ত্রে আছে,—"ব্রহ্মহা মুচ্যতে লোকে মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।"—বাসন্তীকে বিবাহ করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

হায় শাস্ত্র! হায় নীতি! হৃদয় লইয়া কোথাও বিচার নাই! পাষাণস্তূপবৎ দুর্লঙ্ঘ্য শাস্ত্রবিধি সর্ব্বস্থানেই মানুষের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! যাহাকে সে শয়নে স্বপ্নে এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া ধ্যান করিয়া আসিল, মরণ মুহূর্ত্তে কে তাহাকে কাহার হাতে সঁপিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই সে আর তাহার কেহ নয়? নিষ্ঠুর বিধান!

৩২

গৌরী যেদিন চাকদা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল, সেদিন দ্বিপ্রহরে সে যখন কমলার কাছে বিদায় লইতে গিয়া নির্ব্বাক্ বিষাদে দাঁড়াইয়া রহিল, কমলা তখন সত্য সত্যই তাহার বিচ্ছেদের চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই একান্ত সরলা মেয়েটি ভিন্ন তাহারও এখানে সঙ্গিনী বলিতে আর কেহ ছিল না। সে যখন হাসিবার চেষ্টা করিয়া সজলনেত্রে কহিল,—"তোমার কিন্তু আহ্লাদ হচ্চে—না, গৌরী?" তখন বারুদ-স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিলে অকস্মাৎ তাহা যেমন জ্বলিয়া উঠে, তেমনই করিয়া তাহারও চিত্তে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অজস্র-ধারে অশ্রুবর্ষণ

করিয়া সে কহিল,—"মোটে না, একটুও না। সত্যদার সঙ্গে একবার দেখাও হল না, আর বোধ হয় হবেও না।"

গৌরী চলিয়া গেলে কমলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খিড়কি দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া আসিল। ভ্রাতৃশোকাতুরা করুণাময়ী পাশের ঘরে মাদুরের উপর শয়ন করিয়া শৈশবের স্মৃতি-স্মরণে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। কমলা তাঁহাকে নিদ্রিতা বোধে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল। মধ্যাহ্নে চারিদিক মধ্যরজনীর মতই নিস্তব্ধ। ভিজা চুলের রাশি এলাইয়া দিয়া সূচী লইয়া সে সেলাই করিতে বসিল। কিন্তু ভাল লাগিল না। বহুক্ষণ চেষ্টার পর একটি ছোট ফুল সমাপ্ত হইলে, সূঁচ সূতা ও কার্পেট যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এ বাড়ীর ছোট-খাট কাজগুলি আপনা হইতে তাহারই হস্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘরটা গুছাইয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া পুনশ্চ সে সেই আমবাগানের দিকের জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। অমনই তাহার মনে পড়িয়া গেল, গৌরী গা ধুইতে আসিয়া এই জানালাটার নীচে হইতে তাহার সহিত কথা কহিত।—সহসা তাহার বক্ষ উদ্বেল করিয়া একটি নিশ্বাস উত্থিত হইল। "গৌরী বাপ পেলে,—সব পেলে, আমার দাদা যদি এমনি কোন দেশে থাকতেন!"

সে রৌদ্রতপ্ত আকাশের দিকে চাহিল, "আমার আর কেউ নেই! এত বড় দুর্ভাগ্য নিয়েও মানুষ জন্মায়?"

একটা অতর্কিত বিষাদের ভারে কমলার বুকখানা ভারী হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অশ্রু-বাষ্পে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, পরাশ্রিত পর প্রত্যাশী জীবন,—সংসারে সে একটা ভারমাত্র!

কিন্তু জলে আর্দ্র জলছবির অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া যেমন তাহার মধ্য হইতে সমুজ্জ্বল বর্ণ সকল বাহির হইতে থাকে, তেমনই তাহার অশ্রুকম্পিত দুই নেত্রের দৃষ্টি রুদ্ধ করিবার পরক্ষণেই মনের মধ্যে মণীশের তরুণ মূর্ত্তি সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল। কে বলে, সে দুর্ভাগিনী? এই স্নেহ, এই সান্ত্বনা—এ কি তাহার পক্ষে বিধাতার অল্প দান? দূরগত মণীশের উদ্দেশ্যে সে তাহার কুমারী চিত্তের সমস্ত ভক্তিভার নিবেদন করিয়া দিয়া প্রীত-চিত্তে করুণাময়ীর নিকট উঠিয়া গেল।

পায়ের উপর কোমল হস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়া করুণাময়ী চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন,—"গৌরী চলে গেল! আহা, বাছা আমার সত্যদা সত্যদা করে খুন!"

"ওদের দুজনের বিয়ে হলে বেশ হত; না, মা?" 'তাই কেন দিন না' এই কথা টুকু বলিবার জন্য কমলার মনটা অনেক দিন হইতেই ছট্‌ফট করিতেছিল।

ক্ষীণ হাস্যের সহিত করুণাময়ী উত্তর করিলেন,—"তা কি হয়? পাগলি? ওরা যে বারেন্দ্র।"

কমলা রাঢ়ী বারেন্দ্রের প্রভেদটা বিশেষ কিছুই বুঝিল না। সে কহিল,—"ওঁরাও ত ব্রাহ্মণ।"

"ব্রাহ্মণ হলেই কি হয়? ব্রাহ্মণেও কত ভেদ আছে; রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক। তার মধ্যে আবার কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রীয়। তা ছাড়া মেল টেল, কার সন্তান, ক পুরুষে, ও সব ঢের দেখতে হয়। এখন লোকে তবু অনেকটা কমই দেখে। এই যে তোমার মামারাই দেখ না—বংশজ, তোমার মাকে ওঁরা দানে দিয়েছিলেন,

তাই তোমাকে কুলীন-ঘরে নিতে পারা গেল। যদি বেচা কেনার ঘরেই দিতেন"—কথাটা এইখানে উল্টাইয়া তিনি কহিলেন,—"আমাদের বিয়ের সময় দেখেছি, কুলটাই আগে দেখা হ'ত। কুলীনের ছেলের অনেকগুলো বিয়েওত এই করেই দাঁড়িয়ে গেছল। সবাই কুলীনে মেয়ে দিতে চাইত, তা মেয়ের তাতে যেমনই দশা হোক্।"

কমলা কিছু বলিল না, ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিল। যাহার যেখানে ব্যথা, সেইখানেই তাহার আঘাত লাগে। করুণাময়ীর অসতর্ক কথাটায় তাহার বক্ষো-বেদনায় একটু চাড় পড়িল। ইহাঁরা তাহাকে কোথা হইতে তুলিয়া লইতেছেন! সে প্রতিবেশী পাঁচজনের মুখে শুনিয়াছিল, কুলীন-সন্তান মণীশ সুন্দরী পাত্রীর সহিত অযুত মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম।

কমলাকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া করুণাময়ী মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। তাহার স্থির বিষণ্ণতা সহসা তাঁহাকে ব্যথিত করিল। উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন,—"কদিন ভাল করে দেখতে শুনতে পারিনি,—চিরুণি-খানা নিয়ে আয়, বাছা, মাথাটা বেঁধে দিই। ভাগ্যে তোকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম কমল, ছেলেরা ত ঘরে থাকে না, এই দুঃখ কষ্ট তোকে দেখে আমার অনেকখানি নিবারণ হয়।"

পুলকিত-চিত্তে কমলা আদেশ পালনের জন্য উঠিয়া গেল। সে যে ইঁহাদের কোন কাজে লাগিতেছে, ইহা শুনিলেও তাহার কুণ্ঠা কমিয়া আসে।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া কমলা অভ্যাসানুযায়ী স্নান সমাপনান্তে

ভিজা চুলের প্রান্তে গ্রন্থি বাঁধিয়া হলুদ রঙ্গের চেলির শাড়ীখানি পরিয়া গৃহ দেবতার পূজার আয়োজনে নিযুক্ত হইল। সে যখন সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, শিবনারায়ণ বহির্বাটীর দিক হইতে আসিয়া ডাকিলেন,—"শুনে যাও।"

শিবনারায়ণ ঈষৎ উত্তেজিতভাবে কহিলেন,—"কি করা যায়, বল দেখি? করালীচরণ ত বড়ই ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। সে এই ভোরে এসে উপস্থিত—বলে, কমলাকে এখনই নিয়ে যাব। না দাও ত পুলিশ এনে মেয়ে আদায় করবো।"

করুণাময়ী বিস্ময়-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "বল কি?"

অন্তরালে আর একজন যেন তড়িতাহত হইল। শিবনারায়ণ চিন্তিত মুখে কেশ-বিরল মস্তকে অঙ্গুলি চালনা করিয়া কহিলেন,—"আর বল কি? অতি ভয়ানক লোক! ত্রিবেণীতে সে দিন প্রথম যখন তাকে আমি কমলার কথা বলেছিলাম, তখন সে কি রকম তাচ্ছল্য দেখালে! কিন্তু তার পর যখন আমি তাকে কন্যা সম্প্রদানের ভার নিতে অনুরোধ করি, আর তার কোন রকম খরচ পত্র হবে না, শুধু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ী থেকে সম্প্রদানটা করে যাবে, এই কথা বুঝিয়ে দিই, তখনই ও কি মতলব এঁটেছিল। এ কথায় সে বলে উঠল,—'কিন্তু জানেন ত, আমাদের ঘরে মেয়ের বিয়েয় আমরা কিছু প্রণামী পাই। তা সেটা অবশ্য বিবেচনা করেচেন?' তার মানে, উনি মেয়েটির অভিভাবকত্ব নিয়ে তাকে আমার কাছে বেচতে চান! স্পর্দ্ধা দেখ! আমার ভারী রাগ হয়ে গেল। বলে ফেল্‌লাম,—'প্রণামী মনীশ তার মামাশ্বশুরকে যেমন

পারবে, ত্রিশ টাকা দেবে বই কি। কিন্তু মশায়, আপনি যে প্রকার প্রণামীর প্রস্তাব করলেন, কুলীন-সন্তান এতে অপমান জ্ঞান করে।' তোমার সেই বিপদ আপদের মধ্যে আর এ সব কথা তোমাকে বলিনি। কথায় কথায় বেশ একটু বচসা হয়ে গেল। উনি বলেন,—'তবে আমি এ বিবাহে পায়ের ধূলাও দেব না।' আমিও এতে উত্তর করি, আমরা তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি বোধ করিব না। ভক্তিনাথ কন্যা সম্প্রদান কর্ব্বেন, আপনাকে এক বার জানান আমার কর্ত্তব্য ছিল, চুকে গেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আমাদের এ কর্ত্তব্যটা নিতান্ত অপাত্রেই পালন করতে যাওয়া হয়েছিল। আজ হঠাৎ মৎলব এঁটে সে এসে উপস্থিত ;— বলে, 'আইন-মতে আমার ভাগিনেয়ী আমার অধীন ; আমি তাকে এখনই নিয়ে যাব। সে পরের বাড়ী পড়ে থাকে, এতে আমার অপমান হয়।' এত যদি তোর সম্মান-জ্ঞান, তো—এত দিন ঘুমুচ্ছিলি, না মরেছিলি ?'

"এখন উপায় ?" করুণাময়ীর গলা বুজিয়া গিয়াছিল।

"উপায় ভগবানের দয়া, করালীচরণের সুমতি।"

শিবনারায়ণের হৃদয়ে সহানুভূতি করুণার কিছুই অভাব ছিল না ; কিন্তু ইহার সহিত তাঁহার মধ্যে আর একটা জিনিষ ছিল, তাহা বিচারের কঠোরতা। অত্যাচারীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠের স্বাভাবিক ঘৃণা সহজেই তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিত এবং এরূপ স্থলে সেই ঘৃণা ক্রোধের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না। এ তেজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ইহা প্রকৃত ব্রহ্মতেজ—ভীরু অপরাধী ইহা কোন মতেই সহ্য করিতে

পারে না। যাহার প্রকৃতিতে যাহা নাই, সে সেই বস্তু সহিতে অক্ষম। তাই জগতে এত ভেদ, সংসারে এত দলাদলি! সে দিন কল্যাণীচরণের নির্লজ্জ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ শিবনারায়ণ ঘৃণার সহিত যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন তাহার মধ্যে যে কতখানি বিষ লোভের আকারে সুপ্ত রহিয়াছে, তাহা তিনি ধারণা করিতেও পারেন নাই। নিজের মেয়েটিকে চল্লিশ বৎসর বয়সের একটি বাজার সরকারের হস্তে দিয়া সে চারি শত টাকামাত্র পাইয়াছে। শিবনারায়ণের মত লোকের কাছে সহস্রাধিক মুদ্রা আদায় না করিয়া কি কখনও ছাড়িতে পারে? গঞ্জিকা-সেবনের আড্ডায় উপদেষ্টার অভাব নাই। মতলব ঠিক করিয়া, আইন আদালত বুঝিয়া, তাই সে আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শিবনারায়ণের প্রথমকার পণ এখন অবস্থা বুঝিয়া আপনি শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি যখন করুণাময়ী প্রস্তাব করিলেন,—"না হয়, যা চায়, তাই ওকে দিয়ে চুকিয়ে ফেল, আর কি হবে?"

তখন তিনি সহসা এই বিগর্হিত উপায় অবলম্বনে স্বীকার পাইতে পারিতেছিলেন না।—"কিছুতে না, ছোট লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি মেয়ে বিক্রির সাহায্য করবো? বল কি?" প্রগল্‌ভটা উত্তেজিত কণ্ঠে এইরূপ বলিয়াই সহসা কমলার কথা স্মরণ করিয়া স্বর নামাইয়া লইলেন।—"দেখা যাক, ভক্তির সঙ্গে পরামর্শ করি, সকল অপমানই স্বীকার করতে হবে, দেখচি।" বলিতে বলিতে চিন্তাকুলভাবে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কমলা সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবী তাহার চক্ষের

সম্মুখে সেই মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া উঠিয়াছে, স্খলিত-পদে সে দ্বারের কবাটে মস্তক রক্ষা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। সেই একটা সম্ভাবনার কথায় তাহার সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল—এ কি তাহারই কাম্য ফল? কাল সে পরের সুখে ঈর্ষা করিয়া নিজেকে যে পরাশ্রিতা বোধ করিয়াছিল, আত্মীয় খুঁজিয়াছিল, তাই কি এখানকার আশ্রয় তাহার ফুরাইল? কিন্তু তুমি ত সবই জান অন্তর্য্যামি। তুমি ত সকলেরই প্রাণের লেখা গোপনে পাঠ করিতেছ,—সে লেখার অক্ষর পড়িতে তোমার ত ভ্রম হওয়া সম্ভব নয়! সামান্য মুহূর্ত্তের সেই পাপ—তাহারই এত বড় কঠোর দণ্ড বিধান তুমি কি করিতে পার? সেই জ্বলন্ত চিতালোকে মণীশের মোহন মূর্ত্তি কমলার মানস-পটে উজ্জ্বল আভায় ফুটিয়া উঠিল। নিজেকে সে সেই মূর্ত্তির পদপ্রান্তে সঁপিয়া দিয়া অবরুদ্ধ-বাক্ হইয়া মনে মনে বলিল,—"আমি তোমার পায়ে স্থান চাই; আর কিছুই চাই না।"

করুণাময়ী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই আর সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। করুণাময়ী নিজে কাঁদিতেছিলেন, তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

৩১

জীব জগতে মানুষের স্থান সকলের উর্দ্ধে; কেন না তাহারা আহার নিদ্রা প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া ব্যতীত বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যাদি সম্পাদনে সক্ষম। কিন্তু এই মানুষের বুদ্ধি যখন কেবলমাত্র আপনার স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তখন মনে হয়, সে পশু অপেক্ষাও হিংস্রাধম! কঙ্কালচরণ সে দিন যখন প্রথম তাহার স্ত্রীকে

গিয়া বলিয়াছিল,—"কেল্লা ফতে! আর দেখ্‌চিস্ কি? বড় লোকের স্ত্রী হল বলে!" তখন রোগ-শয্যা-পতিতা, দারিদ্র্য ও অত্যাচার পীড়িতা সত্যকালী তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু স্থির করিয়া ভাবিল,—"পাগল হ'ল না কি!" করালীচরণ সতেজে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে অনেকটা আত্মগতই কহিল,—"কেন আমি এমন সুযোগ ছাড়ব? আমার ভাগ্‌নি। শুন্‌চি, আর কেউ ওর নেই; তখন আমিই ওর অভিভাবক,—কেন দাঁও মারবো না? কেবলই নেই নেই, নেই। এখানে কচি খুকি বিছানায় পড়ে হাঁপাচ্চেন, ওষুধ গেলাও, পথ্যি জোগাও, কোথা থেকে সব আসে? আমায় কি কেউ ছেড়ে দেয়, আমিই লোককে ছেড়ে দোব? কখনও না,—হাজার টাকার কম ত নয়ই।" সত্যকালী মুখ ফিরাইয়া বিকৃত-মুখে কহিল,—"মদ গিলে মরেচ খুব,—এতে ত পয়সা লাগে না? এদিকে ঘরে একটু মিছ্‌রি নেই যে, কাশির সময় মুখে দিই। মরণ হলেই হাড়টা জুড়োয়।" কথাগুলা করালীর কানে গেল সে তীক্ষ্ণস্বরে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"মলে ত আমিও বাঁচি। তা মরিস্ কই?"

শিবনারায়ণ ভক্তিনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার দ্বারাই করালীচরণকে জানাইলেন,—"বাগ্‌দত্তা কন্যা লইয়া তিনি কি করিবেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা তাঁহাকে পনের শত টাকা দিতেছেন সব দাবী দাওয়া ছাড়িয়া যান।"—করালীচরণের চক্ষু ফুটিল! তাহার কল্পনা সঞ্চিত, সহস্র স্থলে আপনা হইতে পনের শত হইয়া দাঁড়াইল। ডাল নাড়া না দিতেই এই, দিলে না জানি, আরও কি হয়। সে মাথা চুল্‌কাইয়া কাসিয়া বলিল,—"তা, তা, উনি

বড় ভাইয়ের মত, যা আজ্ঞা করবেন, না'ত বলতে পারিনে, তবে সংসারে আমার বড়ই অভাব, যা দিচ্চেন, দয়া করে আর পাঁচটি শো।"

শিবনারায়ণ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,—"আর কিছুই নয়। যা বলেছি, সেই পর্য্যন্ত।"

করালীচরণ তাঁহার স্বরের দৃঢ়তায় একটু থতমত খাইয়া গেল; তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিতে ছাড়িল না; "নিদেন আর একশো।"

"শাক মাছের মত ঘরের মেয়েকে দর করতে লজ্জা করে না? আর এক পয়সাও নয়।"

অধিক নিঙড়াইলে লেবুর অম্লরস তিক্ত হইয়া উঠে, ইহা করালীর জানা ছিল; তাই সে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু যখন প্রকারান্তরে কথাটা কমলার কর্ণে প্রবেশ করিল, ধিক্কারে তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ছি: ছি, কি ঘৃণ্য জীবন! অর্থ মূল্যে এই দেহখানা বিকাইতে হইবে? ইহার চেয়ে কাশীর সেই অসহায় অনাশ্রিত ভয়ানক অবস্থাও যে তাহার ভাল ছিল! সে করুণাময়ীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল, "মা!"

"কি মা?" সস্নেহে করুণাময়ী তাহার প্রতি চাহিয়া স্নেহ দৃষ্টি দ্বারা তাহার সমস্ত তাপ দাহ প্রশমিত করিতে চাহিলেন।

"মা, তোমরা আমার মামার কাছে টাকা দিয়ে আমায় কিন্‌বে? তা হবে না।"

স্থির প্রতিজ্ঞার অবিচলিত দৃঢ়তায় তাহার নম্র দৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

কথাটা কানে ঢুকিতেই করুণাময়ী চমকিত হইলেন; কহিলেন,—"না, না, সে কি কথা! কেনা আবার কি? উনি যদি দুটো টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যান; বেশ ত। তুমি আমাদের থাক্‌বে; আমাদের সেই ঢের। তোমার কাছে কি ও ক'টা টাকা বেশী?"

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তথাপি মন কিছুতে মানিতে চাহে না। দাম দিয়া তাহাকে বিক্রয় করিবে? কমলা নিজের অস্তিত্বটা শুদ্ধ আজ হইতে নিজের বলিতে পারিবে না? দৃঢ় স্বরে সে কহিল; "লোকে কি বলবে? এ হতে পারে না। না মা।"

এ লোক লজ্জাটা করুণাময়ীর মনেও না ছিল, এমন নয়। তিনি ইহার যুক্তিও খুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন; তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কে জান্‌বে? কেন মা এটাকে বড় করচ? তুমি কি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও?"

এ কথায় কমলার দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে সলজ্জ অনুতাপে মনে করিল, এ স্নেহের নিকট আত্মবিক্রয় করা কি এতই কঠিন? কিন্তু না, সে ত তাঁহাদের নিকট এই স্নেহমূল্যে নিজের মন-প্রাণ সবই দিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ক্রীতদাসীর মত এ দেহ বিক্রয়! এত বড় হীনতা এ রক্ত মাংসের শরীর বহিয়া কে স্বীকার করিতে পারে? অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় বুঝিয়া মুখে আর কিছুই বলিল না; মনে মনে বলিল,—"অসম্ভব! মারিয়া ফেলিলেও এ কাজ করিতে পারিব না।"

বিদায় কালে করালীচরণ একবার ভাগিনেয়ীকে দেখিয়া যাইতে চাহিল। স্বাভাবিক মমতা না থাকিলেও দেড় হাজার

টাকায় অকস্মাৎ মমতা জন্মিয়া যায়। এ দেখা সাক্ষাৎ শিবনারায়ণের মনঃপূত ছিল না। কিন্তু করুণাময়ীর করুণা এ বাধা মানিতে চাহিল না, "আহা, হাজার হোক্ তবু মামা তো বটে। একবার দেখ্‌বে না?"

কমলা নিজেও বলিল—"দেখা করায় দোষ কি?" সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, হয়ত তাহাকে দেখিলে তাহার মাতুলের মন একটু কোমল হইলেও হইতে পারে। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সে একবার তাহার মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুনয় করিয়া দেখিবে। মানুষের ত প্রাণ,—গলিবে না কি?

কিন্তু মানুষ জগতে যত কিছু ভ্রম করে, অন্য লোকের প্রকৃতি বুঝিতে যাওয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। অপাত্রে করুণা, এবং অযোগ্যে বিশ্বাসস্থাপন, এ দুই-ই ধ্বংসের কারণ। কমলা সন্দেহ-মন্থর গতিতে গিয়া মাতুলকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই, তাহার দিকে নেত্রপাত করিয়া করালীচরণের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া রহিল,—এই কমলা! তাহার ভাগিনেয়ী?

কমলার মুখ ফিরিতে চাহিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া চোখ উঠাইল। এ সুযোগ একবার ব্যর্থ হইলে আর মিলিবে না। কিন্তু মাতুলের দিকে চাহিয়া সে আর কিছুই বলিবার চেষ্টা করিল না। মূর্ত্তিমান্ নিরাশাকেই যেন সে সেই কুজাকৃতি, রক্তনেত্র, শীর্ণদেহে প্রত্যক্ষ করিল। জগতে এত বড় আহম্মক কেহ নাই, যে এই মূর্ত্তিমান্ লোভ ও নির্লজ্জতার নিকট কৃপা-কণিকারও আশা মনে ধরিতে পারে। মাতুল বহুক্ষণ পরে সম্ভাষণ করিলেন,—"তুমি কমলা! নারাণীর মেয়ে তুমি?"

তাহার বিস্মিত নেত্র হইতে প্রশংসার রুদ্র ক্ষুধা ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। শিকারী শিকারের দিকে চাহিয়া যে দৃষ্টিতে বলে, "তোমার গায়ে এতখানি রক্ত আছে, তা জান্‌তাম না।"—এ দৃষ্টিও সেইরূপ।

কমলা মৃদু স্বরে উত্তর করিল, "হ্যাঁ।"

"তা'হলে দু'হাজার টাকার এক পয়সা কমেও আমি রাজি হচ্চিনে।" ঘৃণায় লজ্জায় মরিয়া গিয়া কমলা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। হায়, পৃথিবী যদি তাহাকে গ্রাস করিত!

কিন্তু এই সুস্পষ্ট ঘৃণা ঘৃণার্হের মনকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। বসন্তের নবপুষ্পসম্পদ-বিভূষিত কাননশ্রী উদ্যান-পালকের চিত্তে লাভের চিন্তামাত্রই উদ্রেক করে, হস্ত কণ্টকে বিক্ষত হইলেও ফুটন্ত গোলাপটিকে লাভের খতিয়ানে সে চয়ন করিতে ছাড়ে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বার্থপর মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হিংস্র,—পিশাচ হইতেও ভয়ানক। বিশেষতঃ দারিদ্র্যগ্রস্ত চরিত্রহীন লোকের মত 'মরিয়া' সংসারে অল্পই আছে। ইহারা ইহাদের নেশার কড়ির জন্য এমন পাপ,—এমন কোন অপরাধই নাই, যাহা সম্পন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করে। সাধু চরিত্র নিঃস্বার্থ লোকের সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, তাঁহারা ইহাদের সহিত একই সৌরজগতের জীব নহেন। করালী-চরণ অনায়াসে দম্ভ করিয়া শিবনারায়ণকে জানাইল,—"এমন মেয়ের দর দু' হাজারের এক পয়সা কম হইতেই পারে না।" দেড় হাজার টাকার উল্লেখ করিয়া তিনি তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টাই করিতে ছিলেন। একথাও বলিল।

শুনিয়া শিবনারায়ণের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল ; তথাপি তিনি আত্মসংযম চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—"ভদ্রলোকের কথা বদল হয় না। যে চুক্তি হয়ে গেছে, তা বদলাব না ; টাকা আমি আনিয়ে রেখেছি। গুণে নিন" ঘৃণার সহিত তিনি নোটে ও টাকায় পূর্ণ থলিটা সম্মুখে টানিয়া আনিলেন।

লোভই লোভ বাড়ায় ; করালীর ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইল। এক কথায় এতটা হইল। নিশ্চয় এ মাছকে খেলাইতে হইবে। মুখ গম্ভীর করিয়া সে কহিল,—"দু হাজার টাকা না পেলে আমি আমার ভাগ্নীকে এখনই নিয়ে যাব। এ মেয়ের রূপ যা, তাতে দশ হাজার টাকা চাইলেও অন্যায় হয় না।"

"তবে উৎসন্ন যাও! আমি আর এক পয়সাও দেব না। কোথাকার একটা ছোট লোক এসে জুটেচে!"

করালী তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া কহিল,—"দাও আমার ভাগ্নীকে এনে দাও। জোচ্চোর! মেয়ে আটক রাখ্‌বে ভেবেচ? বড় লোক আছ, তুমিই আছ,—আমায় কিসের চোখ রাঙাও? আমি তোমায় কেয়ারও করিনে। এখনই পুলিশ কেস করবো, তা জান? মিনি পয়সায় বংশজের ঘরের মেয়ে আনবেন? মজা পেয়েছেন আর কি।"

সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিবনারায়ণ কহিলেন,—"আর না, ঢের হয়েছে। যার ভাগ্যে যা আছে কেউ তা খণ্ডন কর্‌তে পারে না। নিয়ে যাও তোমার ভাগ্নীকে। এক পয়সাও আমি দেবনা ; পাপের সাহায্য কর্‌লেই তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়।

কমলা শুনিল, তাহাকে যাইতে হইবে। হয়ত জন্মের মতই

এ যাত্রা—ইহাও সে বুঝিল। একবার সে তাহার চারিদিকে হতাশ নেত্রে চাহিয়া দেখিল। এই ঘরদ্বার সবই যথাযথ বর্ত্তমান থাকিবে, শুধু ইহার আশ্রয়তলে আশাপূর্ণ চিত্ত লইয়া এতদিন সে যে সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই দিনটিই বুঝি আর আসিবে না! এ গৃহের অধিষ্ঠাতা আবার ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু যে অভাগিনী সূর্য্যমুখী গোপন ধ্যানে রজনী যাপন করিতে চলিল, সে আর তাঁহার দেখা পাইবে কি? অথবা এই তাহার চিরবিদায়?

শিবনারায়ণ রাগ করিয়া টাকার তোড়াটা উঠাইয়া চলিয়া আসিলে, স্বয়ং করুণাময়ী করালীচরণের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "আর পাঁচশো টাকা আমি তোমায় দেবো, তুমি কমলাকে রেখে যাও। সই থাকলে কি এমন করতে?" উত্তর পাইলেন, "টাকা এখনই চাই।" করুণাময়ী এত টাকা এই মুহূর্ত্তে কোথায় পাইবেন? সময় দিতে করালীচরণ সম্মত নহে। সে গরজ বুঝিয়াছিল, দর কমাইলে পাছে সব ব্যর্থ হয়, তাই এতটুকু ত্যাগ স্বীকারে সে সম্মত নহে। করুণাময়ী আর কি করিবেন? একবার স্বামীকে গিয়া বলিলেন,—"ওগো দু'হাজার টাকাই দিয়ে দাও না। ও যে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।"

শিবনারায়ণ করালীচরণের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। সক্রোধে কহিলেন,—"লক্ষ্মীছাড়ার পাল্লায় পড়েছ, লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভিন্ন উপায় কি? তুমি কি মনে কর, দু'হাজার টাকা পেলেই ও ছাড়বে? ও অতি পাপিষ্ঠ! মিথ্যা অপমানিত হওয়া।"

অগত্যা তখন করুণাময়ী অশ্রু মুছিতে মুছিতে কমলার চুল

বাঁধিয়া কাপড়চোপড় গুছাইয়া দিলেন। কমলা কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিল না, আসন্নবর্ষণোন্মুখ মেঘের মতই স্তব্ধ রহিল।

শিবনারায়ণ যখন দেখিলেন, করালীচরণ সত্যই কমলাকে লইয়া চলিয়া যায়, তখন অগত্যা, মান খোয়াইয়া ভক্তিনাথকে দিয়া বলাইলেন,--"অাচ্ছা, পাঁচশত টাকা আরোও পাইবে, কিন্তু লেখা-পড়া করিয়া দিক্ যে, আর কিছুর দাবী করিবে না।" শুনিয়া মাতুল উত্তর করিলেন, "দুশো খানি টাকা 'ফাও' পেলেই এক্ষণি লিখে দি।"

কমলা শিবনারায়ণের সজল গম্ভীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জীবনে এই প্রথম দিন কথা কহিল; বলিল,—"কেন আপনারা আমার জন্য বারে বারে অপমানিত হচ্চেন? টাকা দিয়ে আপনারা আমায় পাবেন না।"

শিবনারায়ণও আর কিছু উত্তর করিলেন না।

৩৪

শচীকান্ত কল্পনা-কুশল কবি না হইলে 'ক্ষণিকের দেখা' কাব্যে পরিণত হইত না, আর তাহার জীবন-কাব্যেও এ বিষাদের সুর একঘেয়ে তানে বাজিয়া উঠিত না। কমলাকে সে কতটুকুই বা জানে? দ্বিতীয় বারই বা কত সামান্য ক্ষণের জন্য সে তাহাকে দেখিয়াছে? কিন্তু এ কল্পনা সে কোন মতেই ছাড়িতে পারিল না যে, তাহার বাগ্দত্তা কমলাকে তাহারই পাওয়া উচিত। এ যুক্তি তাহার মনে যেমন প্রবল, তাহার প্রতি আকর্ষণও তাহার তেমনই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। পিতা যে তাহার প্রতি অবিচার করিয়া মণীশের পক্ষ লইয়াছেন, ইহাও সে ভুলিতে পারিল না।

বাসন্তীকে দ্বিতীয় বার প্রত্যাখ্যানের সময় মাসিমার সহিত একটু মনোমালিন্য ঘটিয়া গিয়াছে, কোনরূপ খেয়ালের পশ্চাতে ছোটা গিরিজাসুন্দরীর পক্ষে অসহ্য! বাগ্‌দত্তা মেয়েটি নিরুদ্দিষ্টা; গিরিজাসুন্দরী তাহার পরের সংবাদটুকু অবগত নহেন। কল্যাণী বলে:সে আছে। কিন্তু কোথায় আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সেও অক্ষম। কারণ সে ইহার চেয়ে অধিক জানে না। এ অবস্থায় তাহার প্রতীক্ষা করা কেন? কিন্তু খেয়ালী যুবকের খেয়ালের ঝোঁক এইটুকু তিরস্কার লাঞ্ছনা বা ক্ষতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। সে অটল রহিল। মনে মনে ভাবিল, 'তাকে না পাই, তার স্মৃতি ত কেউ কেড়ে নিতে পার্ব্বে না।' স্বপ্নমুগ্ধ হৃদয় প্রেমপাত্রের উদ্দেশ্যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এই সময় সহসা একদিন কলিকাতায় পুরাতন বন্ধু-মহলে তাহার জোর তলব পড়িল। পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রায় ঘটিত। তাই এবারও বড়দিনের উপলক্ষ করিয়া এই সাগ্রহ আহ্বান। বন্ধু-মহলে তাহার পশারপ্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা এখনও কিছু কমে নাই। সকলেই তাহার ভক্ত। একবার সে মনে করিল, সেখানে যাওয়া সঙ্গত নয়, মণীশের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু পুনঃপুনঃ উপরোধ কাটাইতে না পারিয়া শেষে বাহির হইয়া পড়িল। ইতোমধ্যেই অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইয়া গিয়া প্রথম পৌষে বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছে। পথে শিশিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে নৈহাটী ষ্টেশনে গঙ্গা পার হইয়া ট্রেণ ধরিবে। তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"এই যে ছোটবাবু! খুব রোমান্টিক রকম বিয়ে কর্‌চো না কি?

"কে বল্লে তোমায়?" শচীকান্ত বিস্মিত হইল।

"সব খপর পাইগো, পাই। চাদরে যে এসেন্স মেখেছ, তাতে কমলা সুলভ হবে।"

সে সকৌতুকে হাসিতে লাগিল। শচীকান্ত তাহাকে অঙ্গুলি-পীড়িত করিয়া সলজ্জ আস্ফালনে কহিল,—"জ্বালিয়ো না আর! এসেন্স যদি দুর্লভ বস্তুকে সুলভ কর্‌তে পার্‌ত, তাহ'লে দেশে বিদেশে ও জিনিষ থাকতেই পেত না।"

"ভদ্রা 'সিঁথায় সিন্দুর আর নয়নে কজ্জ্বল' দিয়ে ব্রহ্মচারী অর্জ্জুনের ব্রত ভঙ্গ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে, ভদ্র! তুমি এইটুকু আর পারবে না?" আবার সে তাড়না লাভ করিল।

শচী শুনিল, মণীশ কলিকাতায় নাই; ছুটীতে দুই ভাই বাড়ী গিয়াছে। শুনিয়া সে যেন বাঁচিল। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, সে না থাকাতে কলিকাতাটাকে তাহার যেন জনহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হায়, আবাল্য কৈশোরের প্রেমপূর্ণ সখ্যতা! কে জানিত, তাহারাই আবার একদিন দুইজনে পরস্পরে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে! কয়দিন পরে ফিরিবার সময় আবার যখন নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে, সে গাড়ী বদলের জন্য প্লাটফরমে নামিয়া বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। পৌষের সন্ধ্যা। বেশ একটু ঘোরঘোর হইয়া উঠিয়াছিল,—শীতকাতর গাছপালা হিমবায়ুর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় সরিয়া সরিয়া একপ্রকার মিনতিপূর্ণ মৃদু বিলাপ গাহিতেছিল। ষ্টেশনের নিকটেই একটা বিস্তৃতশাখ প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আকাশের কোল ছাড়িয়া সদ্যঃ সমাগত পক্ষী

কলরবে মুখরিত হইয়াছে, আর এইখানে এই মানব-কুলায়ে বিবিধ পথের যাত্রিগণ নানারূপ শব্দে সান্ধ্য-প্রকৃতির শান্তি নাশ করিতেছিল। সার্ব্বজনীন শান্তির শান্ত মুহূর্ত্তেও মানব-চিত্তেই বুঝি কেবল শান্তি নাই! শচীকান্ত সহসা একটা কর্কশ কণ্ঠের মন্তব্যে চিন্তাস্রোতের মধ্য হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল।

"ধেত্‌তোর, হরিদুর্গা, হরিদুর্গা! হরিদুর্গা কি আছে? তারা কোন্‌কালে অক্কা পেয়েচে।"

শব্দানুসরণে সে ফিরিল। প্লাটফরমের একধারে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামস্থানে কতকগুলা পোট্‌লাপুঁটুলির মধ্যে একটি রুগ্না স্ত্রীলোক হাঁফানির টানের সহিত "হে হরি, হে মা দুর্গা, ভাল ক'রে দাও,—নয় নাও মা,"—ইত্যাদি অর্দ্ধস্ফুট কাতরোক্তি করিতেছে। আর অর্দ্ধবয়স্ক শীর্ণাকৃতি একটি লোক তাহাকে ধমক দিয়া উক্তরূপ বলিতেছিল।

এ দৃশ্য সংসারে বিরল নয়। শচীকান্ত দৃষ্টি ফিরাইতে গেল, কিন্তু নিকটে কতকগুলা পোটলাপুঁটুলি ও রুগ্ন শিশুর সঙ্গে পাথা-হাতে বসিয়া আর এক জন, কে'ও? এই হীনাবস্থ হীনচিত্ত সহচরবেষ্টিত হইয়া আজ কে আবার তাহাকে দেখা দিল? বক্ষের উন্মত্ত আলোড়নে যদিও তাহার দৃষ্টি রোধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল, বিস্ময় হর্ষ ভয় যুগপৎ একসঙ্গে তাহাকে বীতসংজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছিল, তথাপি সে মুখ চিনিবার পক্ষে বাধা ছিল না,—নিশ্চয়ই এ সে! কিন্তু কেন সে এখানে? কেন এই অবস্থায়? শচীকান্ত নিস্পন্দ-লোচনে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রের দিকে চাহিয়া সমুদ্র-বক্ষের মত তাহারও বুকখানা কখন অনির্ব্বচ-

নীয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, কখন আবেগের অশ্রু হুহু করিয়া দুই চোখ ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, কিছুই যেন সে জানিতে পারিল না। শুধু এইটুকু মাত্র মনে রহিল, ধ্যানের দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। যাহাকে সে একদিন বসন্ত প্রভাতে দেখিয়াছিল, শীত-সায়াহ্নে সে আজ আবার তাহার সম্মুখে!

এদিকে রুগ্না নারী যন্ত্রণা দিগ্ধ কলহের স্বরে কহিয়া উঠিল,—"আমার ভাগ্যে সবাই মরে, শুধু আমারই অখণ্ড প্রমাই! ঘরে যে হায়' করে পড়ে থাকব, তাও কপালে নেই, টেনে হিঁচুড়ে পথে বার কর্‌লে। কোথায় হোঁচুটে পড়ে অপঘাতে মরাই অদৃষ্টে আছে।" বলিতে বলিতে রমণী কাসির ধমকে আড়ষ্ট হইয়া গেল। অভিভাবকটি দন্তে দন্ত চাপিয়া "মরেও না"—বলিয়া পুঁটুলি খুলিয়া থেলো হুঁকা বাহির করিয়া টিনের কৌটা হইতে তামাক টিকা লইল ও কলিকা সাজিতে মন দিল। শচীকান্ত এই সমস্ত দেখিতে ছিল, তথাপি সে যেন কিছুই দেখে নাই, কিছুই শুনে নাই। সে নির্ণিমেষে সেই মলিনবসনা তরুণীমূর্ত্তির পানে চাহিয়াছিল। আকাশ হইতে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটা যদি নামিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখীন হইত, তাহাতেও হয়ত সে এতখানি বিহ্বল হইত না। —এই সময় তরুণী ভূমে পাখা রাখিয়া রুগ্নার কঙ্কালবৎ শরীরটিকে তাহার চারু বাহুলতার মধ্যে বেষ্টন করিয়া যন্ত্রণা বিদূরিত করিবার চেষ্টায় তাহার বক্ষে কোমল হাতটি বুলাইতে লাগিল। সান্ত্বনার মৃদু মৃদু স্নিগ্ধবাণী তাহার মুখ হইতে দেবাশীর্ব্বাদের মতই উৎসারিত হইতেছিল; রুদ্ধশ্বাস শচীকান্তর কর্ণেও যেন তাহার দুই একটা গুঞ্জন প্রবেশ করিয়া তাহার শিরা সমূহে পুলকতড়িৎ সঞ্চালিত

করিয়া দিল। এত কাছে এতক্ষণ ধরিয়া সে আর কখন তাহাকে পায় নাই।

হুঁকাটি লইয়া ইহাদের সমভিব্যাহারী পুরুষটি তাহার দিক অগ্রসর হইতেছিল। ভাবে বোধ হইল, তাহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা। তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন স্থির হইয়া আসিল। যাহার সহিত সে অপর স্থলে দৃষ্টি বিনিময় করিতেও অপমান বোধ করিত, এখন তাহার আগমন দেবদূতের আগমনের ন্যায়ই মঙ্গলপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছিল। বরং এ ভয়ও হইতেছিল, পাছে সে তাহাকে এড়াইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যায়। সেই মুহূর্তে একটা রুক্ষ কণ্ঠ তাহাকে সম্বোধন করিয়া ভগ্নকাংস্য পাত্রের মত অকস্মাৎ বাজিয়া উঠিল,—"মশায় বলতে পারেন, ট্রেনটা কখন আসবে?" কৃতার্থ বোধ করিয়া শচীকান্ত ক্ষীণালোকে টাইম-টেব্‌লখানা খুলিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন দিকের গাড়ী?

"মূলোজোড়ের। মশায় কোথায় যাচ্ছেন?"

"রত্নপুকুর, জেলা যশোর। বসুন না, এইখানে। ট্রেন-আস্‌তে এখনও দেরী আছে। মূলোজোড়ে আপনার বাড়ী?"

"কর্ম্মস্থান। বাড়ী ত্রিবেণী।" তাম্রকূটসেবনকারী মুখসঞ্চিত ধূমরাশি বাহিরের দিকে ছাড়িয়া দিতে দিতে শচীকান্তর পার্শ্বে খুব নিকটেই আসন গ্রহণ করিল। অমনি সেই সঙ্গে একটা উৎকট গন্ধ আপনার অস্তিত্ব প্রচার করিয়া তুলিল। গন্ধটা কড়া তামাকের কিংবা গঞ্জিকারও হওয়া বিচিত্র নয়। একবারের জন্য সে গায়ের শালখানা টানিয়া তাহারই প্রান্তে নাসিকা আবৃত করিতে গিয়াছিল; কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইল।—"উনি আপনার কে?"

"আমার মেয়ে" বলিয়া আগন্তক হুঁকাটি তুলিয়া মুখে দিল।

"মেয়ে! আপনার মেয়ে?" শচী চমকিয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিল।

"হ্যাঁ মশায়।" এই বলিয়া হুক্কাধারী গম্ভীর মুখে যথাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শচীকান্ত বহুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। সে চাহিয়া দেখিল, তরুণী রুগ্নার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া তাহার মাথায় মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছেন, মুখখানি ঈষৎ আনত—করুণাদেবী সশরীরে যেন আর্ত্ত-ত্রাণের উদ্দেশ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ব্যথিতের জন্য ব্যথাবোধ যে এমন মধুর, শচীকান্ত জীবনে আজ তাহা এই প্রথম অনুভব করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যদি এমন সুস্থ সবল দেহশালী না হইয়া অমনি রোগ-ক্লিষ্ট শরীরে ঐ খানে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারিত!

প্লাটফরমের আলোগুলা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ঘণ্টা বাজাইয়া পয়েণ্টস্‌ম্যান "গাড়ী হালিসহর ছোড়া হ্যায়" এই সংবাদ প্রচার করিয়া গেল। লাইনের আলো অস্পষ্ট দৃশ্যপটকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। অসম্ভব! এ নিশ্চয়ই সে? সংশয়াকুল কণ্ঠে সে প্রবীণ সহযাত্রীকে প্রশ্ন করিল,—"মেয়েটির নাম কি, জান্‌তে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে! ওর নাম মালতী।"

প্রশ্নকারীর মুখে ঘোর নিরাশার ছায়া পতিত হইল। মানুষের সহিত মানুষের মিল থাকে, কিন্তু দেবীর সহিত মানবীর এত সাদৃশ্য!

"এটা কি রকম ভদ্রতা মশায়, ভদ্রলোকের মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা? হলেনই বা আপনি বড়লোক!"

শচী অপ্রতিভের একশেষ হইল; লজ্জিত মৃদু স্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে কহিল,—"মাপ কর্‌বেন। আমার অভিপ্রায় মন্দ নয়। এই মেয়েটির সঙ্গে আমার একটি পরিচিতার অভেদ মূর্ত্তি, তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি। মানুষে মানুষে এত মিল কি সম্ভব! মেয়েটির বিবাহ হয়েছে বোধ হয়?"

"হ্যাঁ। ও বিধবা।"

"বিধবা!"

"আপনার সে পরিচিতা তাহলে আপনার ঘরেই আছেন?"

"বিধবা!" এই শব্দটা একটা তীক্ষ্ণ তীরের মতই শচীকান্তকে বিঁধিল। এমন রূপ ও হৃদয়ৈশ্বর্য্য লইয়া এই বয়সে সে বিধবা! আঃহা! সে কহিল,—"না। তিনি আমার নিকট আত্মীয় নন।"

"কোথায় তিনি থাকেন?"

"চাকদায়।"

"বটে, তাঁর নামটি?" শচীকান্ত এই গঞ্জিকাসেবী অপরিচ্ছন্ন সঙ্গীর প্রতি অনেকটাই বীতশ্রদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল; তথাপি এ প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। হাজার হৌক, মালতী ত তাহারই জ্বলন্ত প্রতিবিম্ব! সে স্নেহ-স্বরে উচ্চারণ করিল, "কমলা।"

অদূরে তরুণী চমকিয়া দুই আনত-নেত্র উঠাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার গম্ভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি, তথাপি তাহা সেই বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ! চোখে বিস্ময়ের ছায়া,—নীরবে যেন সে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

আগন্তুক ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে দিতে পার্শ্বস্থ যুবকের

পরিপাটী কেশকলাপ হইতে মূল্যবান জুতা জোড়া অবধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিল, তাহার অপ্রসন্নতায় ভরা মুখের ভাবে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল,—"সে মেয়েটিকে আপনার কি কিছু দরকার আছে? চাকদায় শিবনারাণের বাড়ী থাকত, কমলা বলে একটি মেয়ে,—আমি তাকেও জানি।"

"থাকত! নেই না কি?"

"না মশায়।"

"সত্যি? কেন, কেন? কোথা গেল?"

আগন্তুক ধূর্ত্ততার সহিত মিটি মিটি চাহিয়া উত্তর করিল,—"তার মামা তাকে নিয়ে গেছে।"—পরে মৃদুস্বরে কহিল,—"সেখানে বিয়ে হবে না যখন, তখন শুধু শুধু সেখানে রাখবে কেন? কোথাকার কে একটা পরের বাড়ী বইতো নয়।"

শচীকান্তর শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়া তাহাকে যেন সেখানে জমাইয়া জড়ে পরিণত করিয়া দিল। করালীচরণ অনুমানে ব্যাপারটা কতক বুঝিয়া লইয়াছিল, তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তেমনই মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "বংশজের মেয়ে, কেন টাকা নেবে না, বলুন ত মশায়? তোরা কুলীনরা যদি বেটার বিয়েতে টাকার ছালা ঘরে পুরতে পারিস্, তবে আমরাই বা ছাড়ি কেন? কথায় বলে, 'বেটা আর বৌ' তা এ দুয়েতে তফাৎটা কি? অমন মেয়ের জন্য আড়াই হাজার টাকা, এমন কিছুই বেশী নয়, কিন্তু এমনি কিপ্‌টে মশাই, কিছুতে দিলে না।—উল্টে আবার গাল মন্দ। তা যাক্, করালী চক্রবর্ত্তী আড়াই হাজার টাকা ঘরে আন্‌তে পারে কি না।"

"তাহলে তার মামার কাছে কমলা আছে? কোথায় করালী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী?" শচীকান্ত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল, কিন্তু জিহ্বার জড়তা, কণ্ঠের সঘন কম্পন রোধ করিতে পারে নাই।

"মশায় কি এখনও বুঝতে পারচেন না, আমিই করালী চক্রবর্ত্তী।"

শচীকান্তর সর্ব্বশরীরে বিপুল বেগে পুলক-তড়িৎ ছুটিয়া গেল। সে কহিল, "আর উনিই কমলা?"

করালীচরণ নির্লজ্জভাবে হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিক বলেচেন,—ও মালতী নয়, কমলা।"

৩৫

জঙ্গলে পূর্ণ পরিত্যক্ত পল্লীগ্রামগুলিকে বাহির হইতে স্থানে স্থানে শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে, কিন্তু ইহারই মধ্যে ভগ্ন গৃহে গৃহস্থ তাহার সুখ দুঃখ লইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বাহিরে লোনাধরা দেওয়ালে বঙ্গভূমির সম্পদ চিহ্ন শ্যামলতা প্রকটিত, ভিতরে তাহারই সঞ্চিত ম্যালেরিয়া পূর্ণ প্রকোপে প্রতিষ্ঠিত। কলমী দল ও কমলাচ্ছন্ন ডোবার উপর মহাকলরবে মশকগণ সান্ধ্য-স্তোত্র গাহিয়া বিষ বর্ষণ করিতেছে, জ্বরের ধমকে বৃদ্ধ বিছানায় পড়িয়া কাঁপিতেছে, কচি ছেলে চেঁচাইয়া রুগ্না প্রসূতির যন্ত্রণা দ্বিগুণিত করিতেছে, গৃহের অভিভাবক কলিকাতার মেসের বাবু সপ্তাহান্তে গৃহে আসিয়া দুই হপ্তা অফিস কামাইয়ের জন্য জরিমানা দিতেছেন, ঘরে যত কুইনিন মিক্‌চারের শিশি জমিয়া উঠিতেছে, সাগুর বাটিতে দুধ ও মিছরির

অংশ ততই কম পড়িতেছে। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির অবস্থা এইরূপ। গ্রামের বড় লোকেরা প্রায় সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়াছেন। পাড়া নিবন্ত, দোল-দুর্গোৎসব ক্রিয়াকাণ্ড সকলই প্রায় বিলুপ্ত। কোথাও কোন নিস্তব্ধ গৃহে দূর সম্পর্কীয়া প্রবীণা আত্মীয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া পুরোহিত দ্বারা গৃহ-দেবতাকে এক মুঠা আতপ চাউল ও দুইটা ফুল ফেলিয়া দিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন। কোথাও চিলের ছাদে, প্রাচীরে অশ্বত্থ বট সদর্পে মাথা উঁচু করিয়া আশ্রয় স্থলকে মাথা নীচু করিতে বাধ্য করিয়াছে। প্রবেশ দ্বারে তালা বন্ধ।

এইরূপ একটি জঙ্গলময় স্থানে একখানি অপরিচ্ছন্ন গৃহে করালীচরণ আসিয়া সংসার পাতিল। মূলাজোড়ের বিখ্যাত কালীবাড়ীর দপ্তরখানায় পূর্ব্বে সে কিছুদিন কাজ করিয়াছিল, পুরাতন দাবী তুলিয়া একটা কর্ম্মের জোগাড় করিয়া সে যে ত্রিবেণী ত্যাগ করিল, তাহার প্রধান কারণ কমলার দর বাড়ানো। ত্রিবেণীতে থাকিলে শিবনারায়ণ সর্ব্বদা সংবাদ পাইবেন, একটু সরিয়া থাকিলে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র তাহার নিকট হইতে বন্দকী গহনার মতই কমলাকে খালাস করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইবেন। শিবনারায়ণকে সে পত্র লিখিল, "কমলার জন্য অপর পাত্র স্থির হইয়াছে। সে ব্যক্তি আড়াই হাজার টাকা দিতে চায়, আপনার ইচ্ছা থাকিলে উক্ত টাকা লইয়া আগামী সোমবার নৈহাটী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন, কমলাকে দিয়া টাকা লইয়া আসিব।" সোমবার সপরিবারে সে ত্রিবেণী [illegible] করিল। সেখানে প্রচার করিয়া আসিল, কলিকাতায় ভাগিনেয়ীর বিবাহ দিতে যাইতেছে। সেদিন

ষ্টেশনে সন্ধ্যা অবধি চাকদহ হইতে কেহ আসিল না। করালী একটু ফাঁপরে পড়িল, এত টাকা দিয়া অপর কাহারও কমলাকে বিবাহ করা সম্ভব নয়, তাহা সে বুঝিত। দরিদ্র বংশজ সন্তানগণ পাঁচ সাত শতের অধিক উঠিতে অক্ষম, ধনীগণ কন্যা পণ দিয়া বিবাহে অসম্মত। শিক্ষিত সমাজে পুত্রপণ প্রথা সসম্মানে চলিত থাকিলেও কন্যাপণ ঘৃণ্য বলিয়াই বিবেচিত। সে ভাবিল, বেশী টানিতে গিয়া জাল শেষে ছিঁড়িল না কি?

কিন্তু সে পত্র যে শিবনারায়ণের নিকট আদৌ পৌছায় নাই, এ সংবাদ সে জানিত না। ডাকঘরে প্রেরণের জন্য শিশু হস্তে দত্ত পত্রখানা কমলা হাতে পাইয়া পাঠান্তে রন্ধন-চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

সে মনে মনে ভাবিল, "আমার জন্য তাঁদের এ অপমান আমি ঘটতে দেব না।" কিন্তু তথাপি নৈহাটি ষ্টেশনে বারম্বার সে সম্মুখে পার্শ্বে চমকিয়া চাহিতেছিল। হায়, যদি সহসা, অতর্কিতে তাঁহাদের কেহ একজন আসিয়া পড়িতেন! যদি কেহ তাহাকে ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন! গর্ব্বের সহিত অনুতাপের বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। সে বলিল, "তুমিই ত অহঙ্কার করিয়া চিঠি ছিঁড়িলে, নহিলে হয়ত মুক্তি পাইতে।" ভিতর হইতে আত্মমর্য্যাদা মাথা তুলিয়া উত্তর দিল, "যাহা হয় হউক, তাই বলিয়া আমি তাঁহাদের কাছে অর্থ মূল্যে কেমন করি আত্ম বিক্রয় করিব? এমন করিয়াই দিন কাটাইব, তথাপি তাহা পারিব না।"

আজন্ম বুভুক্ষার আদর্শ লইয়া মাতুল গৃহের নূতন গৃহস্বামী

কমলাকে গৃহিণী পদে বরণ করিল। অভাব শীর্ণ বাহু তুলিয়া কঠোর কর্কশ কণ্ঠে আবাহনের আগমনী গাহিল। দাসী, পাচিকা, গৃহিণী এতগুলি সম্মানিত অধিকার একসঙ্গেই লাভ—এমন তরুণ বয়সে প্রায় সকলের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না।

কিন্তু আর যাহার পক্ষে যাহাই হউক, সত্যকালী তাহাকে পাইয়া যেন বাঁচিলেন। বিবাহের পর হইতেই তাঁহার জীবনে অন্ধকার দারিদ্র্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। শ্বশুরের অবস্থা বড় মন্দ ছিল না; কিন্তু শ্বশুর-পুত্র অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিজেকে নিঃস্ব করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিবাহের পরবৎসরেই সে দরিদ্র সংসারে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। শ্বশুড়ী অপয়া বউ বলিয়া এই কারণে তাহাকে যথেষ্টই লাঞ্ছনা করিতেন। তাহা ছাড়া তাহার জীবনে সহানুভূতিহীন স্বার্থচিন্তা মগ্ন স্বামীর নিকটে এতটুকু শান্তি সে কোন দিন পায় নাই। শারীরিক মানসিক উভয় শ্রমে দেহ পিষিয়া গিয়াছে, হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে, তবুও বিশ্রাম মিলে নাই। এতদিনে তাঁহার মনে হইল, "তবে বোধ হয় দেবতা আছেন!" কমলার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, "আর জন্মে তুই আমার মা ছিলি, মা! নৈলে এতদিন পরে এ সময় কোথা থেকে এলি, বল্ দেখি ?"

অনেকগুলি মরিয়া হাজিয়া এখন বিবাহিতা মেয়েটি ছাড়া আরও তিনটি পুত্র কন্যা জীবিত আছে। সবগুলিই কচি কাচা, বুভুক্ষিত এবং রুগ্ন। ইহার মধ্যে মেয়েটির উপরই একটু যত্ন লওয়া হইত। কারণ তাহার পিতা বলিতেন, "ভুলে যেয়ো না,—হাবি আমার পাঁচশো টাকার মাল।" ছেলেগুলা কুলীন সন্তান

নহে, কাজেই আদর নাই। কমলা আসিয়া এই পরিত্যক্ত মানবগুলিকে সদয় চিত্তে কাছে টানিয়া লইল। অবসর যদিও একান্ত অল্প, তথাপি সে নিজে বিশ্রাম না লইয়া, ধোয়াইয়া ঘা পাঁচড়ায় ঔষধ পত্র দিয়া তাহাদের মানুষের চেহারা বাহির করিল। প্লীহার দাপটে সাত বছরের বড় ছেলেটির উদরখানি বাদ্য যন্ত্র বিশেষের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছিল, বসিলে তাহা বুকের উপরও ঠেলিয়া উঠিত। সেকালের গৃহিণীরা অনেক টোট্‌কা ঔষধ জানিতেন। করুণাময়ী ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর নিকট এই সকল বিদ্যার কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। কমলা তাঁহার দেখা দেখি ছেলেটির পেটে গোমূত্রের সেক দিয়া ও গাছ গাছড়ার ঔষধ খাওয়াইয়া মাসখানেকের মধ্যেই তাহাকে অনেকখানি সুস্থ করিয়া তুলিল। একখানা বর্ণপরিচয় সংগ্রহ করিয়া শিশু দুইটিকে সুযোগমত একটু আধটু পড়াইতে গিয়া সে দেখিল, মেধাশক্তি এই জন্ম-অনাদৃত শিশুদিগের এখনও কিছুমাত্র অল্প নয়। করুণায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া সে ভাবিল, এ ভালই হইয়াছে। অত টাকা অন্য কেহই দিবে না,—সেদিকে আমি নিশ্চিন্ত। চাই কি, সারা জীবন ধরিয়াই আমি এই দুর্ভাগ্যদের লইয়া কাটাইয়া দিব। নাই বা আমার সুখ হইল, নাই বা আমি তাঁহাদের পাইলাম, সেই দুদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করিব, দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দুঃখীদের সুখী করিব। মামার পণ্য হওয়ার চেয়ে সে আমার শতগুণে ভাল।

সংসারে সকলেই গুণের বশ। সত্যকালীর রোগ শোক ও অভাবগ্রস্ত অসহিষ্ণু চিত্ত এই মোহিনী মায়ায় সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া

উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ ছেলে দুইটির উপর কমলার যত্ন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া যাইতেন। তাহাদের মধ্যে গালিগালাজ নাই, মারামারি কমিয়া গিয়াছে, চেহারাও ফিরিয়াছে। আহা, যদি এতদিন কমলা থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার অন্য সন্তান দুইটি অনাদরে ভুগিয়া ভুগিয়া অসময়ে চলিয়া যাইত না। করালীচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সব চাহিয়া চাহিয়া দেখে, তাহার মুখের পাষাণ-রেখার মত কঠোর কাঠিন্যে সামান্য দাগটুকুও পড়ে না। মনে মনে হাসিয়া বলে, "মেয়েটা খুব সেয়ানা! ভেবেছে, ভোল দেখিয়ে ভুলিয়ে দেবে! তা, তেলই দাও, ফুলই দাও, এ ভবি ভোলবার নয়।"

কিন্তু যত বড়ই সুগৃহিনী হউন, যতই তিনি আত্মোৎসর্গ করুন, সংসার চালাইতে হইলে আর একটা জিনিষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন আছে, তাহা রৌপ্যচক্র! এ সংসারে সেই বস্তুটীরই সবচেয়ে টানাটানি। কাজেই গৃহিণীপনার যত কিছু কৌশল আছে, সব খাটাইয়াও শ্রীবৎস উপাখ্যানের অচল তরণীর ন্যায় ইহাকে চালানো কমলার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। মাতুলের সহিত কথা কহা তাহার পক্ষে একান্ত ক্লেশকর, বিশেষ টাকা কড়ির কথা। কিন্তু না বলিলেও চলে না, কাজেই সত্যকালীকে দিয়া সে তাঁহাকে বলাইল। করালীচরণ মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "টাকা আমি কি বাটপাড়ি করে আনব না কি? যেমন করে চলচে, চালিয়ে নাও না।"

সত্যকালী কহিলেন, "ওই কি বাটপাড়ি করতে যাবে না কি? কথা শোন! যেন [illegible] চোর দায়ে ধরা পড়েছে। যে ক'টাকা

হাতে ছিল, এতদিন সে কটি খুইয়ে ও তোমার সংসার চালালে, বার মাস কোথা পাবে? বলতে একটু মুখে আটকাল না! একেবারে হায়া-লজ্জা নেই!"

"যেখান থেকে পায় ও দিক্। ওর জন্যেই আমার ডবল খরচ পড়চে। হতভাগা ছোঁড়া ছুটোর অত আদর কেন শুনি? তোমাঁর কাপড় ত দেখি দিব্যি সাফ। আদা, মরিচ, মিছরি নিত্যি আস্‌ছে। কেবল বাজে খরচ! আমি কি নবাব যে অত সব জোগাব?"

"নিজের গাঁজা, ভাঙ্‌, তামাকের পয়সাগুলো যত কাজের খরচ, না? সাফ্‌ কাপড় পরি না পরি তোমার কত খরচ তাতে হয়েছি, শুনি! ও ত কমলার নিজের কাপড়। ছেলেদুটো যেন তোমার আপদ হয়েছে, সব কটাই ত গেছে, ওদেরও তুমি বাঁচতে দেবে না, দেখ চ।" বলিতে বলিতে সত্যকালী ক্রোধে দুঃখে, অভিমানে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া পিছন ফিরিয়া শয়ন করিলেন। করালীচরণ বিড় বিড় করিয়া তাহার ও কমলার উদ্দেশ্যে গালি দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরে কমলা বড় ছেলে নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া একখানা চাদর মুড়ি দিয়া একটি প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করিল। সেই বাড়ীর একটি মেয়ের সহিত স্নানের সময় পুকুর-ঘাটে তাহার আলাপ হইয়াছিল। ফিরিবার সময় করুণাময়ী দত্ত বালা দুই গাছি তাহার হাতে আর দেখা গেল না। একগাছি করিয়া রাঙা কড় তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু বেশীক্ষণ এ সম্মান লাভ তাহাদের অদৃষ্টে সহিল না, কাজকর্ম্মের ভিড়ে পল্‌কা জিনিষ [illegible] খণ্ড হইয়া খসিয়া

পড়িল। কমলা একবার মাত্র শিহরিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া হাতখানা ঢাকিয়া ফেলিল, তারপর পুনরায় আবদ্ধ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। তাহার ভারাক্রান্ত চিত্তের মধ্যে আজ আবার নূতন করিয়া একটা গভীর ভার বোধ হইতেছিল। এমন কেহ নাই যে তাহাকে এই অকল্যাণকর অবস্থা হইতে মুক্ত করে! সত্যকালী ভৎর্সনার সহিত স্বামীকে সংবাদটা জানাইলে, মাতুল ভাগিনেয়ীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বটে! তা মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি তো বেশ ভাল দেখতে পাচ্চি! বেশ করেচে! কখন্ চোর এসে ছিনিয়ে নে' যেত, তবু কাজে লাগল।" কমলার সহিত সাক্ষাত হইলে কহিল, "বড় খুসী হয়েচি। আহা হাজার হোক্ নারাণীর মেয়ে ত! নারাণী বড় মানুষের ঘরে গিছলো, দাদা বল্‌তে খুন হত। ভাই-ফোঁটার সময় মিহি মিহি শান্তিপুরে ধূতি পাঠাত। আমার বরাতে অমন বোন চলে গেল, না হলে আজ আমার ভাবনা কি?"

৩৬

পৌষের পর মাঘ মাসেরও অর্দ্ধেক কাটিয়া গিয়াছে। শীতের প্রকোপ ক্রমেই মন্দীভূত হইতেছিল। রাত্রে হিমপাত অল্প হইয়া গ্রহ-তারকার উজ্জ্বলতা ও শুক্লা জ্যোৎস্নায় হৈম প্রভা উভয়েই বর্দ্ধিত হইতেছে। নূতন ভূষণ গ্রহণের জন্য উন্মুখ বৃক্ষলতাগুলি পুরাতন জীর্ণ পত্ররাশি পরিত্যাগ করিতেছিল। আকাশে বাতাসে সূর্য্যের কিরণে, নবোদ্গত কিশলয়ের চিক্কন অরুণিমায় সর্ব্বত্রই একটা পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল। আবার শুধুই জড় জগতে নহে, জীব জগতেও এই নব বসন্তের সূচনা দেখা দিয়াছে।

পশুপক্ষীগুলাও প্রকৃতির এ দান উপেক্ষা করে নাই। গহ্বর-শায়ী কীটগুলা বাহিরে আসা আরম্ভ করিয়াছে, নবীন চ্যুত-মুকুলের আঘ্রাণে আমোদিত মধুমক্ষিকার দল ঝাঁক বাঁধিয়া সেই খানেই বাসা বাঁধিয়াছে, এমন কি ঝোঁপ ঝাঁপের মাঝখান হইতে ইতঃমধ্যেই বসন্তের সহচর তাহার চির-পরিচিত রাগিণীর আলাপ সুরু করিতে ভুলিয়া যায় নাই।

মানুষের মধ্যেও ঋতুর প্রভাব অল্প কার্য্যকারী নহে। শীত কমিয়া যাওয়ায় আজ কাল সত্যকালী অনেকখানি সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। বিছানা ছাড়িয়া প্রথম যে দিন তিনি বাহিরে আসিয়া বসিতে পারিলেন সেদিন তাঁহার চিরবিষণ্ণ মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সেটুকুর অর্থ, "এবারের মত তবে আমি বাঁচিয়া গেলাম!" যে যতই দুঃখ ভোগ করুক, সকলেই প্রায় মরণকে সে সকল দুঃখের সেরা বলিয়াই মনে করে।

আজকাল বোধ করি নব বসন্তের উতলা হাওয়া কমলার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রুদ্ধদ্বার নিকুঞ্জের মাধবী শাখার পত্র-মর্ম্মরে সুপ্ত কোকিলকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কাজকর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার পর নির্ব্বাপিতালোক কক্ষের কঠিন শয্যায় আর সে বিনিদ্র যামিনী যাপন করে না। তৈল খরচের ভয়ে সন্ধ্যায় একবার জ্বলিয়াই দীপ এখনও নিবে বটে, কিন্তু সেও সেই সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে জ্যোৎস্নালোকে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রতিবাসী দুই একজন মাত্র। সকলেরই গৃহের মধ্যে পচা পুষ্করিণী বা কালকাসন্দ ও গাবভেরেণ্ডার বেড়া ঘেরা সবজির বাগান ব্যবধান। সে স্তব্ধ বক্ষে অদূরে বংশবনের পানে চাহিয়া

থাকে। বাতাস খেলা করে, জ্যোৎস্না হিল্লোল তুলে, সে শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখে। সারা চিত্ত ভরিয়া তেমনি একটা আশা-লোক বিকম্পিত পুলক-হিল্লোল মধ্যে মধ্যে তাহারও বুকের ভিতর তরঙ্গিত হইয়া উঠে। বাতাস বন্ধ হইয়া চারিদিক নিঃসাড়া হইয়া যায়, তাহারও বক্ষ কাতর তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিতে থাকে। উপরে ফোটা ফুলের মত আকাশ-ভরা নক্ষত্রের দীপ্তি, আশে পাশে গাছের গায়ে গায়ে জোনাকির ঝিক্‌ মিকানি, কমলার দৃষ্টি উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, অধঃ হইতে উর্দ্ধে ব্যাকুল হইয়া ফিরে। যদি সে ঐ সকল ছোট ছোট আলোগুলির কোনটার মধ্যে একদিন নৈশ অন্ধকারে চিতাগ্নি পার্শ্বে করুণাপূর্ণ বেদনাব্যথিত যে মুখ দেখিয়াছিল, তাহা-রই ছায়াটি দেখিতে পায়! কিন্তু হায়, বৃথা এ প্রতীক্ষা,—এ আশা আকাশ কুসুম মাত্র! কোথায় তিনি, আর সে কোথায়? মন তবু বুঝে না। প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া মনে হয় আজ সেখান হইতে কেহ আসিবে। রাত্রে বিছানায় পড়িয়া কেবলই সেই দুদিনের স্বপ্ন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। প্রত্যূষে সেই স্মৃতিটুকু অবলম্বন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজ করিয়া যায়,—কিন্তু দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া গেলেও কেহ আসে না, কেবল তাহারই দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে।

সেদিন কর্ম্মক্লান্ত শরীরে সে যখন প্রাত্যাহিক বিশ্রাম স্থান গ্রহণ করিল, তখন আকাশে চাঁদ অনুজ্জ্বল হইয়া আসিয়াছে, একখানা হাল্কা মেঘ লঘুপক্ষ শ্বেত পক্ষীর মত বায়ুভরে উড়িয়া যাইতেছিল। সেদিন সে অল্পক্ষণ পরে নিরানন্দ চিত্তকে গত... সুখস্বপ্ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি

বাড়িয়া যাইতেছে, অল্প দূরে এক দল শৃগালের ঐক্যতানে প্রথম প্রহর অতীত-প্রায়, এই সংবাদ ঘোষিত হইতেছিল। পশ্চাতে ফিরিতে গিয়া সহসা সে চমকিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিল। তাহার পশ্চাতে জ্যোৎস্নালোকে মৃত্তিকার উপর লিখিত তাহার নিজের ছায়াপার্শ্বে অপর আর এক ব্যক্তির ছায়া!—পুরুষের দীর্ঘ মূর্ত্তি! সে সুস্পষ্ট দেখিল, মুহূর্ত্তে ছায়া মূর্ত্তি অন্ধকারের দিকে সরিয়া গিয়াছে। আতঙ্কে তাহার পা হইতে মাথা অবধি কাঁপিয়া উঠিল। কণ্ঠের অত্যন্ত নিকটে একটা সাতঙ্ক আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্তে ঠেলিয়া আসিয়াছিল,—কিন্তু যাহার জীবন শীত দেশের কাচের ঘরের মধ্যে বন্ধ করা গ্রীষ্মের লতার মত আবরণের চাপ মাথায় করিয়া বাড়িয়া উঠে নাই, মুক্ত আকাশের তলায় নিজের শক্তিতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পদে পদে যুদ্ধ করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইয়াছে,—শৈশব অতিক্রান্ত হইতে না হইতে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় লইয়া ঝড় ঠেলিয়া উর্দ্ধদিকে যাহার গতি,—বাজ পড়িলেও সে নিঃশঙ্ক চিত্তে দাঁড়াইয়া দগ্ধ হয়, ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সে চীৎকার করিল না, যেদিকে ছায়া অপসৃত হইয়াছিল, সেইদিকে বরং একটু অগ্রসর হইল। কৈ, কেহ কোথাও নাই! গাছে ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে, চাঁদ নীচের দিকে নামিয়া পড়িতেছিল। বাতাস শাখা নাড়াইয়া শুষ্ক পত্রগুলিকে ঝরাইয়া ফেলিল। মনে হইল, কে যেন সাবধানে [illegible]লিয়া যাইতেছে! নিজের চমকে নিজে লজ্জিত হইয়া সে ফিরিতে [illegible]ল,—কিন্তু এ কি? তাহার পদস্পৃষ্ট হইয়া কি একটা গোলাকার [illegible] গড়াইয়া গেল,—ইটকাঠের মত জিনিষটা নহে,—কোন ধাতু

চ।
গো
বস্তু

দ্রব্য হইবে। শব্দানুসরণে সে নিকটে গিয়া উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-লোকে একটা চক্‌চকে টিনের কৌটা ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইল। ছেলেরা ফেলিয়া গিয়াছে, এই কথাটা প্রথম মনে হইয়াছিল, কিন্তু সহসা মনে হইল ; কই এ কৌটা ত তাহাদের নিকট দেখে নাই ? কে রাখিল ? কৌটাটা অন্যমনস্কভাবে সে খুলিয়া ফেলিল। তখন মেঘখানা সরিয়া গিয়াছে, দিবালোকের মত উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে ধরণীবক্ষে তৃণপুষ্পটি পর্য্যন্ত সুগোচর হইতেছিল,—তাহার হস্ত যেন সেই মুহূর্ত্তে একটা ভয়াল সর্প স্পর্শ করিয়াছে, এমনই ভাবে সে শিহরিয়া উঠিল। কারণ সে দেখিল, সেই কৌটার মধ্যে দুইগাছি স্বর্ণ কঙ্কন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সেই সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা একখানি পত্র। উপরে বৃহদাকার অক্ষরে লেখা সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়িল, "কমলার জন্য''। তাহার কম্পিত হস্ত ভার বহনে অক্ষম হইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরও অবশ হইয়া আসিয়াছিল। অবলম্বনের জন্য নিকটবর্ত্তী গৃহ প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। এত বড় অপমানও তাহার ললাটে লিখিত ছিল! অতি ঘৃণার্হ বস্তু যেমন করিয়া লোকে ঠেলিয়া ফেলে, তেমনি করিয়া সেই কৌটাটা মাটিতে সে নিক্ষেপ করিতে গেল, কিন্তু আবার মনে হইল, পত্রখানা সব পড়িয়া দেখা উচিত। অক্ষর বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট আলো ছিল। সাবধানে সে পত্রখানা বাহির করিয়া পাঠ করিল। তাহা এইরূপ ;—"কমলার জন্য।"

"তোমার অযোগ্য হইলেও গ্রহণে কুন্ঠিত হইও না ; তোমাকে দিবার অধিকার না থাকিলে দিতে সাহসী হইতাম না, জানিও।

এরূপভাবে রাখিয়া যাইবার কারণ, প্রকাশ্যে দিবার অধিকার এখনও আমি পাই নাই!"

"এখনও আমি পাই নাই!"—তবে একদিন যিনি এ অধিকার পাইবেন, এ তাঁহারই দান? হায় মূঢ় কমলা তুই না জানিয়া কাহার অপমান করিতেছিলি? গভীর আবেগের অশ্রুজলে তাহার কৌমুদী-বিভাষিত গণ্ডযুগল প্লাবিত হইয়া উঠিল। সকল দুঃখ যেন আজ তাহার সার্থক মনে হইল। নির্নিমেষ জাগ্রত দেবতার মত তিনি তাহার চারিপাশে নিজের রক্ষা হস্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সে যে ভূষণহীন হস্তে রহিয়াছে, ইহা তাঁহার প্রাণে সহে নাই, তাই এ অকাল-উপহার! গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এক প্রচণ্ড ক্ষুধা যেন সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্বগ্রাসী শক্তি লইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহিল। তাহাতে জোয়ারের জলের মত মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত হৃদয়ের ঢেউ উথলাইয়া কূল ছাপাইয়া বাঁধ ভাসাইয়া দিল। তখন সে সমুদয় দ্বিধা লজ্জা সরাইয়া ফেলিয়া সেই প্রথম প্রাপ্ত উপহারটিকে সসম্ভ্রমে তুলিয়া লইয়া নিজের ললাটে ঠেকাইল। সে শ্রদ্ধা এ জড়ের প্রতি নয়। যে চেতন পুরুষ এই জড়ের মধ্যে তাঁহার স্নেহপ্রীতির ধারা ঢালিয়া ইহার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রণাম তাঁহার সেই অভয় পাদোদ্দেশ্যে। বলয় দুইগাছি বহু মূল্য নহে—কিন্তু কমলার চোখে তাহা সাত রাজার ধন মাণিকের মতই অমূল্য ঠেকিল। যে অলক্ষ্য দৃষ্টি তাহার এই নিরলঙ্কার হাতখানি সহিতে পারে নাই, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই যেন সে সেইখানে দাঁড়াইয়া তাঁহারই দত্ত অলঙ্কার ধারণ করিল। মনে করিল, তিনি

হয় ত এখনও কোন অদৃশ্য স্থান হইতে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, এইমাত্র সে যে ছায়া তাহার পশ্চাতে অপসৃত হইতে দেখিয়াছে, যে পদশব্দ শুনিয়াছে, সে তবে তাহার ভ্রম নহে? সে ছায়া মণীশের! সে পদশব্দ তাঁহারই?

তাহার আত্মাভিমান আজ বিজিত বন্দীর মত মাথা নত করিয়া বলিল, "আর না, পণ ছাড়!" আজ গর্ব্বের পরাজয়ে হৃদয়-রাজ্যের চারিদিকেই মহোৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। আর কি মান অপমান ধরিয়া নিজের সহিত যুদ্ধ করা চলে? দ্বারে যখন দেবতা নিজেই অতিথি, তখন আবার কিসের লজ্জা দ্বিধা? যুক্তি তখন অনুকূল হইয়া কহিল,—"যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে পার, এ জীবন জন্মান্তর উৎসর্গ করিতে পার, এই তুচ্ছ দেহখানা কি যে তাহা লইয়া এত মান অপমান? এই ক্ষুদ্রতার অভিমানে ভরা মন লইয়া কি পূজার অধিকার পাওয়া যায়?" মানুষের অজ্ঞাতে পলে পলে তাহারই মর্ম্মের মধ্যে যখন নূতন সৃষ্টি চলিতে থাকে, তখন তাহা মাতৃ কুক্ষিস্থিত শিশুর মতই নিজের নিকট সম্পূর্ণ গোপন থাকে, কিন্তু যখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠে, তখনই সে মাটির উপরে সর্ব্ব-লোচনে আত্ম-প্রকাশ করে। কমলা যে আজই এই মতটা স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিল, তাহা নয়। এত দিন ধরিয়া যে নব যুগ তাহার মধ্যে বীজে বৃক্ষের মত, মহাপ্রকৃতির মধ্যে ভবিষ্য সৃষ্টির ন্যায় লীনাবস্থায় ছিল, তাহাই আজ সহসা অঙ্কুরিত হইল মাত্র। আপনাকে সে দানের সুখে ধূপের মত নিঃশেষ করিয়া দিল, কিছু বাকি রাখিল না।

মনের মধ্যে এই কথা বলিয়া সে সান্ত্বনা লাভ করিল যে, 'এই ভাল, তাই হোক। আমার স্বাতন্ত্র্যে আর কাজ নাই।'

হায়, সে যদি আগে জানিত!

রাত্রির অন্ধকারকে সহস্র রশ্মিচ্ছটায় বিদ্ধ করিয়া অম্লান প্রভাত আত্মপ্রকাশ করিল। কমলার পক্ষে আজ অতি সুপ্রভাত! প্রত্যূষে উঠিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা কমলা তাড়াতাড়ি গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে কাগজ কলম জোগাড় করিয়া করুণাময়ীকে পত্র লিখিতে বসিল। এক রাত্রির ভিতরে ইটালী জয় হইয়াছিল, এক রাত্রির ভিতর তাহার অন্তরের মধ্যে একটা যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। মানসিক প্রফুল্লতা কর্ম্ম ব্যস্ত কমলার চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। আজ যদি তাহাকে কেহ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া পথে পথে ঘুরিতে বলে, এখান হইতে মুক্তি ক্রয় করিবার জন্য বোধ করি তাহাতেও সে অসম্মত হয় না। সে এখন কোন মতে চাকদায় ফিরিতে পারিলে বাঁচে,—আর যেন বিলম্ব সহিতেছিল না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া করালীচরণ তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া অস্বাভাবিক প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন,—"ওগো বিছানা ছেড়ে উঠে পড়, কম্‌লির কাল গায়ে হলুদ, পরশু বে।"

"অ্যাঁ, বল কি! এত শীগ্‌গির?"

"হাঁ, তাদের এই রকম মরজি। তারা আর দেরি করতে চায় না। ডাকের চিঠিতে টাকা পাঠিয়ে দেছে। আমারও তাতে অমত নেই। ও পাপ চুকোতেই ত হবে। তখন যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। আজই আমি টাকাগুলো কলকাতায় জমা দিতে

যাচ্চি। জানিস্ এই থলিতে কত টাকা আছে? পঁচিশ শো! বিয়ের দিন আরও পাঁচশো দেবে বলেচে। দুটো-চারটে আরও যদি এমনি ভাগ্যি থাকৃত! তোর পোড়া গর্ভের যে ছাই ছাই-পারা সব মেয়ে।”

৩৭

কলিকাতার এক বড় রাস্তার ধারে এক ত্রিতল অট্টালিকার দ্বিতীয় তলস্থ সুসজ্জিত কক্ষে গৃহস্বামীর কন্যা শিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেছিল। সুকেশী সুবেশী বালিকাটি গঠন সৌকুমার্য্যে, বর্ণের উজ্জ্বলতায়, সর্ব্বোপরি একটি কমনীয় সরল শ্রীতে সকলেরই নয়ন মন আকর্ষণ করে। মাষ্টার বই খুলিয়া আজিকার পাঠ্য পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্রী পড়িল, “কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেনদেশে কর্ক নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। তাহার বল্কল এরূপ স্থূল,—হ্যাঁ মাষ্টারমশায়, বল্কল কি রকম?

“গাছের ছাল।”

“গাছের ছাল যে বল্লেন, তাহলে রাম, লক্ষ্মণ কেমন করে বাকল পরেছিলেন? মানুষে কখনও গাছের ছাল পরতে পারে?”

“কোন কোন গাছের ছাল নরমও হয় কি না। আচ্ছা, বল দেখি, স্পেন দেশ কোথায়?”

“কেন, আফ্রিকায়। সেইখানেই ত খুব বীর একটা জাত—স্পার্টান্ বুঝি -জন্মেছিল, —”

“নাঃ, স্পার্টান্‌রা তো স্পেন দেশে জন্মায়নি, তারা গ্রীসদেশের

অধিবাসী ছিল। কাল যে ম্যাপে ভাল করেই দেখিয়ে দিলুম, স্পেনদেশ ইউরোপে। বৃক্ষ কাকে বলে?"

"তা বলে এটা আর ভুল হবে না,—বৃক্ষ মানে গাছ।"

"ঠিক! আচ্ছা স্থূল মানে কি?"

"গোলমাল!"

"গোলমাল?"

"হ্যাঁ, লোকে যে বলে হুলস্থূল! হল না?"

মাষ্টার ইন্দুভূষণ হাসিল, "এতটা কল্পনা শক্তি না যোগ করে শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই আমি বাঁচি। আচ্ছা, তৈমুরলঙ্গ কোন্ দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, বল দেখি?

"তুরস্ক।"

"না, ভেবে বল।"

"আফগানিস্থান? তবে আমি জানিনে। মাগো মা! অত কি মনে করে রাখা যায়?"

"কেন যাবে না, সবাই রাখে। মন দিলে তুমিও পার, বই দেখে নাও ভাল করে।" ছাত্রী পুস্তকে বারেক দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই তাহা মুড়িয়া বলিল, "বাবাকে বলব, আমি আর পড়তে পারব না, কত আর শিখব? কখ্খনো পড়ব না।"

"কেন গৌরি, পড়বে না?"

"আমার ভাল পড়া হয় না, মনে থাকে না।"

"নাই থাক, এম্‌নি করেই পড়।"

"তাতে আপনি রাগ করেন যে।"

"আমি কি কখনও তোমায় এর জন্যে বকেছি?"

ছাত্রী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "না, কিন্তু আপনার মনে মনে রাগ হয় সে আমি বুঝতে পারি। সেদিন যে "ফল", না, না, "ফুল্" কি বল্‌ছিলেন – সেকথার মানে কি মাষ্টার মশায় ?"

অনুশোচনার লজ্জায় মাষ্টার মুখ নত করিলেন, ঈষৎ মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন, "তার মানে নির্ব্বোধ।—তোমার সকল সময় ত বেশ বুদ্ধি। পড়ার সময় মনে থাকে না কেন ?"

"আচ্ছা নির্ব্বোধকে 'ফুল্' বলে কেন ? ফুলের মত নড়তে চড়তে পারে না—না ? আহা, আমার চন্দ্রমল্লিকাগুলি সব মরে-গেছে, ঝুমকালতাটাও মরমর।"

"ইন্দুভূষণ ! তোমার কাজ শেষ হলে আমার সঙ্গে একবার লাইব্রেরি ঘরে দেখা করে যেয়ো।"

এই বলিয়া গৃহস্বামী কন্যার পাঠাগারের দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য, এই বালিকা ছাত্রী গৌরী এবং এ গৃহের অধিস্বামী তাহার পিতা নন্দকিশোর। পিতার সাড়া পাইয়া গৌরী বই ফেলিয়া উঠিয়া ডাকিল, "বাবা !" নন্দকিশোর গৃহে প্রবেশ করিলেন। "আজ বাগানে বেড়াতে যাবে ? আমি আর পড়তে পারিনে, বাবা, আজ ছুটী দিতে বলে দাও না।"

গৌরী তাহার পৃষ্ঠলম্বিত বেণী দুলাইয়া গোলাপী অধর ঈষৎ ফুলাইয়া পিতার মুখের দিকে আব্দারের সহিত চাহিল। পিতা কহিলেন, "ইন্দুভূষণ, আজ ওর ছুটী হোক্।"

শিক্ষক বিষণ্ণ মুখে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ ঘটনা আকস্মিক নহে, নি[illegible] তবু মনে কেমন ব্যথা বাজে। ছাইভস্ম যাহাই কেন ছাত্রী পড়িয়া যাক, দুই ঘণ্টা তিন চার ঘণ্টায়

পরিণত হইলেও সম্মুখস্থ ঘড়ির উপর শিক্ষকের নজর পড়ে না। জগতে মানুষ যত, তাহাদের খেয়ালও তেমনই বিভিন্ন। এই এম-এ ক্লাশের দরিদ্র ছাত্রটি প্রথম যখন গৃহ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে, তখন সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, প্রথম দিন যাহার সঙ্গে তাহাকে সঙ্কোচে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, দুইদিন না যাইতে তাহারই শিশুর মত সরল, ফুলের মত কোমল-মধুর ভাবটুকু মায়া যষ্ঠির মত তাহার চিত্তকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিবে। এখন ছুটীর দিনটা ইন্দুভূষণের পক্ষে শাস্তি বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই যে সে নিজের হৃদয়ে এই ধনী-দুহিতার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণের বেগ অনুভব করিতেছিল, মাধ্যাকর্ষণের মত নিজের কক্ষেই তাহা স্থির থাকে, সীমা অতিক্রম করে না। সে মাঝে মাঝে ছাত্রীর নব রবিকিরণ মণ্ডিত, ঝলমলে শিশির বিন্দুটির মত কৈশোর মাধুর্য্যে বিমণ্ডিত মুখখানের উপর শঙ্কিত চোখের দৃষ্টি রাখিয়া একটি মধুর বুলি শেখা তোতা পাখীকে ভালবাসিয়া বালকের যে সুখ, সেইরূপ একটা আনন্দ লাভ করিত মাত্র।

ছুটী শুনিয়া গৌরী প্রায় লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।— "আঃ বাঁচা গেল! বাবা, এসো,—তোমায় আমার সাদা খরগোসের বাচ্ছাগুলি দেখাই গে এই সেদিন কিনে দিয়েছ,—এরই মধ্যে কত বড় হয়ে গেল, দেখবে এস না। মাগো, মাষ্টার মহাশয়কে নাম ধরে বলা হয়নি, অমনি চলে যাচ্ছেন! আপনিও আসুন না—"

পিতার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে প্রায় টানিয়া লইয়া চলিল। অগত্যা ইন্দুভূষণও তাহাদের অনুসরণ করিল।

যে বাড়ী এক সময় পরিত্যক্ত পুরীর মত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া-

ছিল, আজ এই একটি বালিকার আগমনে বসন্তাগমনে পক্ষীকলকূজনের ন্যায় ইহার প্রতি গৃহ থাকিয়া থাকিয়া কলহাস্যে, নূপুরনিক্কণে উচ্চ কণ্ঠস্বরে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। আবার চারুবনস্থলী ঋতুরাজ-পাদস্পর্শে অভিনব শ্রী ধারণ করিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত ছিল না, পুষ্পে মধু-সঞ্চয়ের ন্যায় অলক্ষ্যে ইহার মধ্যে বসন্তবৈভবও প্রদান করিতেছিল। নন্দকিশোরের শুষ্ক চিত্ত বর্ষার বন্যার ন্যায় কূলবিপ্লবী সলিলস্রোতপ্রাপ্তে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যৌবনের আশাহত নিরানন্দ চিত্ত অপরাহ্নের দিকে জগদানন্দ আলোকের সন্ধান পাইয়াছিল। তাঁহার সুখের সীমা নাই।

সময়ের চেয়ে পরিবর্ত্তনকারী জগতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। গৌরীর ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যেও ইহার কার্য্য স্থগিত ছিল না। আকর্ষণ প্রত্যাকর্ষণ না করিয়া থাকিতে অক্ষম, তাই—আর বোধ হয়, সম্বন্ধ গুণেও—সে পূর্ব্ব বিদ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া পিতাকে অনেকখানি ভালবাসা প্রদান করিয়াছিল। তাহার চিত্ত সমুদ্রের অতল তলে এখনও পূর্ব্বস্মৃতির রত্নসম্ভার আদরে সঞ্চিত থাকিলেও উপরে নীলাম্বুরাশি সলিল-বর্ষণকারী মেঘেরই ছায়া ধারণ করিয়াছে। সে যতই বালিকা হোক, পিতৃহৃদয়ের বেগ ব্যাকুল স্নেহধারার গভীরতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাই ইহার একটা সূক্ষ্ম যোগ তাহারও চিত্তকে নির্ঝরের সবেগ ধারার মতই এইখানে বহিয়া আনিয়াছিল। সে তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার সকল শরীরে সুখানুভূতির তাড়িৎ প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়া কহিল,—"বাবা, আমি তোমায় খুব ভালবেসেছি।"

দিন সুখেই কাটিতেছিল। গৌরীর মনের উপর হইতে আজ-কাল বলিতে গেলে দুঃখের ছায়াখানা একেবারেই সরিয়া গিয়া তাহার পূর্ব্ব স্বভাব ফিরাইয়া আনিয়াছে। গল্পে, ভ্রমণে, দুইজনকে অবলম্বন করিয়া দুইজনের জীবন আশ্রয় তরু ও আশ্রিতা লতার মত একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। নন্দকিশোর ইদানীং তাহাকে সত্যদার উপর অনেকখানি উদাসীন দেখিয়া মনের মধ্যে এক প্রকার স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কন্যার মুখের চিন্তারেখাহীন সরল হাস্য তাঁহার চিত্তে আশ্বাস আনন্দ ছড়াইয়া দিয়াছিল। সে তাঁহারই;—একমাত্র তাঁহারই বক্ষ-নীড়ে বাসা বাঁধিয়াছে।—কেন বাঁধিবে না? অন্য কাহারও তাহার উপর কিসের অধিকার?

কিন্তু বেশী দিন ঐ স্বার্থ-সজ্ঘাতে নিজের দিকটাকে বঁচাইয়া রাখা চলিল না। দেশাচার, লোকাচার শতমুখে তিরস্কার করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, দ্বাদশ উত্তীর্ণা কন্যাকে শীঘ্র পাত্রস্থ না করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের উর্দ্ধ হইতে নিম্নাবতণ অনিবার্য্য! অনেক ভাবিয়া, খুঁজিয়া, একটি মনের মত পাত্র পাওয়া গেল। ছেলেটির দারিদ্র-খ্যাতি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি যশঃসৌরভেরও উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই নির্ব্বাচিত পাত্রটিই আমাদের পরিচিত গৃহশিক্ষক ইন্দুভূষণ।

গৃহস্বামীর আদেশমত ইন্দু সেদিন বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ছাত্রীর টবের গাছের মাটি নিড়াইয়া দিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় নন্দকিশোরের সহিত ইতঃপূর্ব্বে সে সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই।

গ্রীষ্ম অপরাহ্ণের রৌদ্র তখনও বেশ উজ্জ্বল রহিয়াছে, জানালার

সার্শির উপর দিয়া ছায়া ক্রমে ঘরের মধ্যে অবতরণ করিতেছিল, কিন্তু ছাদের কার্ণিসের উপর অংশে কাচের প্রতিবিম্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণ সমাবেশ করিয়াছে। ইন্দুভূষণ গিয়া দেখিল, একখানা আরাম কেদারার উপর হেলিয়া নন্দকিশোর চিকিৎসা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন, তাহাকে দেখিয়া পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া বসিলেন, চোখ হইতে চশমা খুলিতে খুলিতে হস্ত দ্বারা নিকটস্থ চৌকিখানা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "বস।"

ইন্দুভূষণ নীরবে আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। সে আজ তাঁহার ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক অপেক্ষাও কোমল, সমধিক স্নেহপূর্ণ। ইহা কি কোন দুঃসংবাদের সূচনা।

নন্দকিশোর কহিলেন,—"তোমার অবস্থাও ভাল নয়, এবং অভিভাবক সেরূপ কেউ নাই, এ অবস্থায় বি-এল পাশ না করে তুমি ডাক্তারি পড়লে না কেন? কিছু সুবিধা হতে পারত ত?"

ইন্দু বুঝিল, এটা কথা পাড়িবার একটা অবান্তর সূত্র, মূলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। সবিনয়ে সে কহিল, "ডাক্তারি পড়ায় খরচ বেশী তাই সাহস করিনি, স্কলারশিপের টাকা ক'টিরই ভরসা ছিল।"

"পাশ করে কি করবে স্থির করেছ? ওকালতি?"

"আমাদের মত অবস্থার লোকের পক্ষে ওকালতি—"

"যদি তোমার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তা হলে?"

ইন্দুভূষণ কিছু না বুঝিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিল। বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া নন্দকিশোর কথাটা একটু ফিরাইয়া লইলেন,

"গৌরীকে তোমার কেমন মনে হয়? লোকে তাকে পাগল বলে, সেটা—"

ইন্দুভূষণের সকল দ্বিধা ঘুচিয়া গেল। সে সবেগে কহিয়া উঠিল, "না, না, পাগল কেন, অত্যন্ত সরল। অতি চমৎকার মেয়ে!"

নন্দকিশোর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে সৌৎসুক্যে তাহার ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিয়া উঠিলেন, 'তুমি তাকে নিয়ে আমার পুত্রস্থানীয় হও, আমার কাছে থাক, এই আমার ইচ্ছা। এই জন্যই আমি তোমায় তাকে চেনবার ভার দিয়েছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখে তাকে না বুঝে পাছে তার প্রতি অবিচার কর, এই ভয়। তোমার আপত্তি আছে?"

চাঁদ নিজে যদি পৃথিবীর বক্ষে নামিয়া আসেন, পৃথিবী কি তাঁহাকে আতিথ্য দিতে কুণ্ঠিত হইবেন?

৩৮

পরদিন নিয়মিত সময়ে পড়াইতে আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন, ছাত্রী তখনও পাঠ-গৃহে অনুপস্থিত, পড়িবার টেবিলের উপর মোটা খাতায় বড় বড় আঁকা বাঁকা বিবিধ ছাঁদের অক্ষরে তাহার দৈনিক হস্তলিপিগুলা শুধু পড়িয়া আছে। পুস্তকগুলা মসীলিপ্ত, ছিন্নার্দ্ধ মূর্ত্তি লইয়া শুভ্র আস্তরণের উপর বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়া অধিকারিণীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ইন্দুভূষণ একবার জানালার নিকটে গিয়া কর্ম্ম কোলাহল ক্লান্ত রাজপথের পানে চাহিয়া দেখিল, তার পর ফিরিয়া টেবিলের নিকট স্বস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল। এমন সময় সহসা গৌরী আগমনপূর্ব্বক সহাস্যে কহিল, "আপনি এসেচেন? আমি জানতে পারিনি ত! আজ একটা চমনা

কিনেছি কিনা, সেইটেকে খাওয়াচ্ছিলুম; অনেকক্ষণ এসেছেন? তা ডাকেননি কেন ?"

ইন্দুভূষণের মনে হইল, এ কণ্ঠ অন্য দিনের চেয়ে যেন অনেক কোমল, মধুর রস-সিক্ত! সে কহিল, "হ্যাঁ,—না,। অনেকক্ষণ তেমন নয়।"

ছাত্রী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "হ্যাঁ,—না, কি মাষ্টার মশায়? আপনার ছাতাটা বুঝি চুরি গেছে। তাই এই নতুন ছাতাটা কিনেচেন,—বেশ হাতলটি ত! মাষ্টারমশায় আপনার জুতোটাও ত নতুন। ওমা, সবই যে নতুন জিনিষ! কেন মাষ্টার মশায়? ও বুঝেছি! নেমন্তন্ন খেতে যাবেন?"

ছাত্রীর এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে মাষ্টার অকস্মাৎ আরক্ত হইয়া উঠিলেন,—তবে কি তাঁহার সাজ-সজ্জাটা এমনই লক্ষ্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে! সহসা এই চারি মাস পরে অজহ যে প্রথম নিজের ছিন্ন মলিন বেশ তাহাকে একান্ত ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল,—সে কি করিবে? ইন্দুভূষণ বিব্রতভাবে কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল,—"আজ তবে তুমি পড়বে না?"

"বাঃ, আমি যেন তাই বলেচি। ঘরে পাখা চল্‌চে, তবু আপনি কত ঘামচেন, মুখটা রাঙ্গা হয়ে গেছে। বুঝেছি, আপনাদের আজ ম্যাচ আছে। এখনি যেতে হবে না?"

"না। তোমার ইতিহাস মুখস্থ বল।"

"১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে—বঙ্গদেশে ইংরাজেরা—যাঃ, ভুলে গেছি! কতদিন আর পড়তে হবে, মাষ্টার মশায়?"

"গৌরি !"

"কি মাষ্টার মশায় ?"

"আমি যদি বলি, আর তোমাকে পড়তে হবে না ?"

"তা কি বাবা শুনবেন ? বাবা বলেন, লেখাপড়া শেখা বড় ভাল।"

"যদি শোনেন ?"

"তাহলে আমার বড় আহ্লাদ হবে।"

"শুধুই আহ্লাদ হলে ত হবে না, কি দেবে বল ?"

"আপনাকে—?" গৌরী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অবশেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"পুষুমণিকে দোব, আর এক খাঁচা মুনিয়া পাখী দোব।"

ইন্দুভূষণ মৃদু হাসিল, "তাতে হবে না।"

"আচ্ছা, টমি কুকুরটা ত নেবেন ? ওটা কেমন সুন্দর, চোর-চোরও তাড়াতে পারে, কত ভাল !"

মাষ্টার এই উত্তম পুরস্কারটির লোভও সংবরণে সমর্থ হইলেন, পরে ডাকিলেন, "গৌরি !"

গৌরী হাসিয়া ফেলিল,—"আজ কেবল কেবলই আমায় ডাকছেন কেন ? কি চাই বলুন না। না, বলুন, তা হবে না।"

ইন্দু অপ্রতিভভাবে মুখ নত করিল, তার পর সহসা মাথা তুলিয়া দ্রুত কণ্ঠে কহিয়া গেল,—"আমি এইটুকু শুনতে চাই, গরীব ব'লে আমায় তুমি ভবিষ্যতে ঘৃণা অবহেলা করবে না ?"

গৌরী এই কথা শুনিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল "ও মাগো,

এ কি কথা! ঘৃণা কি ক'রব? গরীবকে বুঝি ঘৃণা করে! দাদু বলেন, তিনি গরীব,—তা তাঁকে কেউ ঘৃণা করে কি?"

"গৌরি, তোমার মত শিশুকে যে এ সব ক্ষুদ্র আলোচনার মধ্যে জড়াতে চায়, সে নিতান্ত পাষণ্ড! না, তোমার কাছে এ সব ছোট জিনিষ ঘেঁসতে পারে না। আমায় ক্ষমা কর।"

কথাগুলা যেন হেঁয়ালির মত শুনাইল, ঠিক অর্থবোধ হইল না। সে বিস্ময়ের সহিত দুই সরল নেত্র বিস্তৃত করিয়া কহিল,—"কি বলচেন, কেতাবের কথা কি?"

"কেতাব ত মানুষেই তৈরি করে। তোমার বাবা তোমায় কিছু বলেন নি?" হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুতের মত বিস্মরণের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল। "ধেৎ" বলিয়া সবেগে বেণী দুলাইয়া সে মুখ লুকাইল। পিতা পূর্ব্ব রজনীতে একটিবার বলিয়া ছিলেন বটে,—"আচ্ছা, ইন্দুর সঙ্গে যদি তোর বিয়ে দি?" সে সেখানেও যে উত্তর দিয়াছিল, এখানেও তাহা অপেক্ষা কোন প্রভেদ দেখাইল না। টেবিলের সহিত মাথাটাকে এক করিয়া ফেলিয়া মুখখানা তাহারই অন্তরালে সে লুকাইয়া ফেলিল। ইন্দুভূষণ স্মিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

"কিরে গৌরি তোর পড়া হল?"—বলিতে বলিতে তাহার অভিভাবিকা বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সাড়া পাইয়াই শিক্ষক ছাত্রী উভয়ে তটস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার সম্মুখের পুস্তকখানার পাতা উল্‌টাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"'প্রভঞ্জন' কথাটার মানে কি?" বলিতে বলিতে চকিতের মধ্যে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া লইলেন,—কিন্তু কি ম্লান, সে মুখ! এ কি

সেই হাস্যময়ী গৌরী? তাঁহার বক্ষে একটা অজ্ঞাত বেদনা বাজিল। কেন, সে সহসা এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল?

অভিভাবিকা দূর সম্পর্কে গৌরীর পিতার পিতৃষসা, সম্পর্কে ঠান্‌দিদি। তিনি কহিলেন,—"ইন্দু, তুমি ত ওকে এত ক'রেও পড়াশোনায় তেমন উন্নতি করাতে পা'রলে না; কা'ল থেকে একজন শিক্ষয়িত্রী স্থির করা হয়েচে; তোমার ভাই চাকরিটি এবার গেল। তা যে নতুন কাজ পাচ্চো, 'ডবল প্রমোসন' পেয়ে গেলে;—তোমার ক্ষতি কিছু হবে না। ও কি, উঠে দাঁড়ালে কেন? বসো, বসো।"

ইন্দুভূষণ মনের প্রফুল্লতা গোপন করিতে অক্ষম হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল,—"না,আর বসবো না,একটু কাজ আছে—" বলিতে বলিতে ছাতাটার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই পলাইয়া গেল। গৌরী নতনেত্রে নিজের চরণাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। ইন্দুভূষণ চলিয়া গেলে, সহসা মুখ তুলিয়া ঠান্‌দিদির পানে চাহিল। তিনি তাহাকে একটা ব্যঙ্গরসসিক্ত মধুর সম্ভাষণে ভাষিত করিতে যাইতেছিলেন। সে বাধা দিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"বাবাকে বলুন না, আমি বিয়ে করবো না!"

ঠান্‌দিদি হাসিলেন,—"ক্ষ্যাপা মেয়ে! আমি বল্লেই বা এমন অদ্ভূত কথা সে রাখবে কেন? কেন বিয়ে করবিনি?"

"আমি জানি না।"

"ইস্, বিয়ে কর্ব্বেন না, ন্যাকা মেয়ে! বিয়ে সবাই করে। মেয়েমানুষ কি আইবড় থাকে।"

"তা হোক না—উনি মাষ্টারমশাই যে, ও কি রকম?"

"তাতে কি! স্বামীও ত গুরু,—ভালই হবে।" মুহূর্ত্তে হাসির কলতানে কক্ষ মুখর করিয়া বিষণ্ণা গৌরী ঠান্‌দির কোলে লুটাইয়া পড়িল,—"গুরু, স্বামী গুরু! তাহলে আমাকে পা ধুইয়ে দিতে হবে? প্রণামী দিতে হবে? মাগো মা, এমন কথাও শুনিনি!"

নন্দকিশোরের কন্যার বিবাহ-সংবাদ দুই দিনেই সুপ্রচারিত হইয়া পড়িল। সেকরা ও দোকানী পসারীর আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুভূষণ বেচারার এ গৃহে আগমন বন্ধ হইল। আর ভাল দেখায় না। পাড়ার মেয়েরা জানালার পাখী তুলিয়া কাণাকাণি করে।

গৌরী যখন দেখিল, বিবাহের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তখন সে একদিন স্থির করিয়া ব'সল, নিজেই পিতাকে বলিবে যে, সে বিবাহ করিবে না। সে সেদিন স্কুলে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে কত বড় বড় মেয়েরা আইবড় রহিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে সে দেখিল, বাড়ীর সরকার একখানা বোঝাই গাড়ি হইতে নামাইয়া বড় বড় দুইটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক, কতকগুলি রেশমী ও সূতি শাড়ী বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিতেছে। এদিকে ঠান্‌দিদি দশরথ চাকরকে ডাকিয়া মালীকে টোপর আর সিঁথি-ময়ুরের জন্য ফরমাস করিতেছেন।

কন্যা গিয়া ডাকিল,—"বাবা!'

"মা!" নন্দকিশোর টেবিলের উপর হইতে একটা ভেলভেট-মণ্ডিত বাক্স তুলিয়া লইয়া তাহার আবরণ মোচনপূর্ব্বক কন্যার সম্মুখে ধরিলেন; কহিলেন,—"তোমার এ হার পছন্দ হয়?

"বেশ ত! কত বড় বড় মুক্তো! ওগুলো কি? হীরে! কি রকম চক্‌চকে! একে কি বলে?—চুনী!—বাবা—"

"কি, মা! পর, আমি একবার দেখি, মাকে আমার কেমন দেখায়।"

গৌরী অগত্যা হার পরিল; কিন্তু কিসের জন্য এ অলঙ্কার, তাহা মনে করিয়া তাহার উৎসাহ জন্মিতেছিল না। তৎক্ষণাৎ ছলছল নেত্রে সে বলিয়া ফেলিল,—"বাবা, আমি বিয়ে ক'রব না।"

"সে কি? কেন মা!" নন্দকিশোর চমকিয়া উঠিলেন।

"তা জানি না, এখন করবো না।" গৌরী নিজের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিল। কথা জড়াইয়া কান্না আসিল, কিন্তু জোর জুলুম আসিল না। পিতা সন্দিগ্ধ চক্ষে দেখিতে দেখিতে স্নেহ-স্বরে কহিলেন,—"তা কি হয়? কেন, তোমায় ত কোথাও যেতে হবে না। তুমি সর্ব্বদা আমার কাছেইতো থাকবে।"

গৌরী নিরুত্তর হইয়া রহিল, এ কথার উপর কাহার সাধ্য আছে যে, কিছু বলিতে পারে।

৩৯

বিবাহ-বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন যতই অধিক আনন্দ সমারোহ জাগাইতেছিল, পিতা পুত্রীর উভয়ের মনের মধ্যে বেদনা ও উদ্বেগও ততই বর্দ্ধিত হইতেছিল। নন্দকিশোর এই বিবাহ উপলক্ষে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন, সামাজিক বিতরণ, দরিদ্র ভোজন, সৎকার্য্যের সহায়তায় দান হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসীর মধ্যে বস্ত্রালঙ্কার-বিতরণ, ভোজ্য ও ভোজ্যের অপর্য্যাপ্ত আয়োজনে পাড়া প্রতিবেশীর সন্তোষ, কিছুরই তিনি ত্রুটি

করেন নাই, তথাপি মনে একটা দুঃখের ভার চাপিয়া তাঁহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার চিত্তে পিতৃ-হৃদয়ের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বেদনা, পরহস্তে সমর্পণের সুখ-জড়িত ব্যথা ত ছিলই, ইহার উপর গৌরীর পরিবর্ত্তন তাঁহার চিত্তে একটা প্রধান ভার হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে সহসা এমন বদলাইয়া গেল কেন, এই কথাটাই তাঁহার প্রাণটাকে যেন পাক দিয়া দিয়া মুচড়াইতে ছিল। মুখে তাহার হাসি নাই, স্ফুর্ত্তি নাই, বীতস্পৃহা বর্ষীয়সীর মত সে স্তব্ধ হইয়া থাকে! এ কি এ? একদিন মুখ ফুটিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হয়েচে গৌরি?"

"কিছুই ত হয়নি—" বলিয়াই সে মুখ নত করিল। "আমার হবে কি, বাবা?" বলিয়া ত তেমন কল-ঝঙ্কারে হাসিয়া উঠিল না! কেন এমন হইল?

একদিন সন্ধ্যাকালে মধুর সুরে সানাই বাজিয়া পাড়াশুদ্ধ লোককে জানাইয়া দিল, বিবাহ নিকটবর্ত্তী। রঙ্গীন কাপড় পরা দাসদাসীগণ কর্ম্মবাড়ীটাকে কোলাহলে সরগরম করিয়া তুলিল।

দক্ষিণের বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহের কন্যা নীচের উঠানে লোকজনের যাতায়াত দেখিতেছিল। অদূরে শকটচক্রমথিত, জনসঙ্ঘর্ষিত রাজপথ, তাহাতে বহুবিধ লোকজন গাড়ি ঘোড়া, এবং টুং টাং শব্দে ঘণ্টা বাজাইয়া বিসর্পিত-গতি ট্রামগুলা ঘড় ঘড় শব্দে কর্ণ বধির করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

গৌরী হস্তস্থিত বিলাতী ফুলটির রক্ত পাপড়িগুলি নখরছিন্ন করিতে করিতে গ্যাসালোকে উদ্ভাসিত সাগরোর্ম্মিতুল্য প্রাসাদময়ী নগরীর পানে অনিমেষে চাহিয়া ছিল। যে দিন এই দৃশ্য তাহার

সরল নেত্র বিস্ময়ের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, আজ আর সেদিন নাই। আজ তাহারা তাহার এই স্বচ্ছ নেত্র-দর্পণে ভাসিতেছে, ভিতরে প্রতিফলিত হয় নাই। সে বস্তুত কিছুই দেখিতেছিল না,—চাহিয়াছিল মাত্র। এমন সময় নন্দকিশোর চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ডাকিলেন,—"গৌরি।" গৌরী একটু চমকিয়া উঠিল, তারপর কবরী-বদ্ধ চুলের মধ্য হইতে যে গুচ্ছটা শিথিল হইয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সেটাকে বামহস্তে সরাইয়া মুখ ফিরাইল। নন্দকিশোর নিকটে আসিয়া তাহার মস্তকে একখানি হাত রাখিয়া সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করচ মা? একলা কেন? এ কি, কাঁদচ!" তিনি তাহার গণ্ডে অশ্রুবিন্দুটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ব্যথিত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন মা?"

গৌরী কথা কহিল না, একবার শুধু ছলছল নেত্র তুলিয়া পিতার পানে চাহিল। ক্ষুদ্র বুকখানা হইতে একটা আকুল নিশ্বাস বাহিরের ধূমভারাতুর বায়ুর সহিত মিশিয়া গেল। পুনশ্চ নত মুখে সে একটু দ্রুত হস্তে পুষ্পপেলব দীর্ণ করিতে লাগিল। নন্দকিশোর কিছুক্ষণ তাহার বিষাদপূর্ণ মুখের উপর স্থিরচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া পরে জোর করিয়া যেন দুর্ভবনাটাকে পরিত্যাগের চেষ্টায় কহিলেন,—"দুজন কে' কে' এসেছেন, বল দেখি!"

গৌরী জিজ্ঞাসার ভাবে চাহিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিল না, কে? তখন নন্দকিশোর আপনা হইতেই কহিলেন,—"তোমার মাসিমা আর সত্যেন্দ্র।"

"সত্যদা এসেছে! এতদিন পরে এসেছে—" গভীর হর্ষোচ্ছ্বাসের মাঝখানেই অকস্মাৎ বালিকা থামিয়া গেল। "কোথা যাচ্চো, গৌরি? এসো। সে নীচে আছে, দেখা ক'রবে এসো, এখনই সে ফিরে যাবে।"

দেড় বৎসর পরে দুইজন বাল্যসঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। দুজনেই দুজনকে দেখিয়া মনে মনে যথেষ্ট বিস্ময় অনুভব করিল। দুজনেই ভাবিল, 'চেনা যায় না। কি বদলে গেছে!' বহুক্ষণ নীরব পর্য্যবেক্ষণের পর সত্যই প্রথমে বাল্যসখীকে সম্বোধন করিল,—"ভাল আছ, গৌরি?"

"গৌরী, ভাল আছ!" এ যেন কেতাবে লেখা বানানো কথা! তথাপি গৌরী হাসিবার এত বড় সুযোগটা প্রত্যাখ্যান করিয়া নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িল, কথা কহিতে পারিল না! চোখে কেবলই একটা জলের ঝাপ্‌সা রেখা আপনাকে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিল।

সত্য দেখিল, তাহার সখী শুধু মাথাতেই বাড়িয়া উঠে নাই, স্বভাবেও সে অনেকখানি বড় হইয়া গিয়াছে। সে যে গাড়ীতে বসিয়া এতক্ষণ ধরিয়া স্থির করিয়াছিল, ছিপ, বঁড়সি, আম চুরি লইয়া তাহার সহিত কি কি আলোচনা করিবে—সে সব কথা এই সুসজ্জিতা, সুন্দরী কিশোরীর সম্মুখে উত্থাপন করা এখন আর সম্ভবপর বলিয়া মনে হইল না। গৌরী আর সে গৌরী নাই। এত সুন্দরই বা সে কি করিয়া হইল? কৈ, সে ত সত্যদা বলিয়া ছুটিয়া কাছে আসিল না? গচ্ছিত দ্রব্যগুলার দাবী করিল না,—সেগুলা যে তাহারই অনবধানতায় খোয়া গিয়াছে, ইহা জানাইয়া তাহাকে এতটুকু তিরস্কারও করিল না? গৌরী এখন এত পর

হইয়া গিয়াছে! তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহের তাতে তাতিয়া উঠিল। চৌকীর নিকট দাঁড়াইয়া সেও পূর্ণ অবহেলার ভাবে গৃহসজ্জা পরিদর্শনে মন দিল।—ইস্‌, মেয়ের বিয়ে হইতেছে ত, যেন লাট সাহেব হইতেছেন! কিছু গ্রাহ্যই নাই!

গৌরী তাহার অভিমান বুঝিল না। সে যে তাহার প্রতি এত বড় অবিচার করিতেছে, এ সম্বন্ধে সে পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়া স্বেদ জলে অহেতুকই ভিজিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সেই ঘরেরই অপর প্রান্তে আলোকাধারের সম্মুখে বই খুলিয়া একজোড়া চশমার পরকলার মধ্য হইতে তাহাদের দিকে যিনি স্থিরনেত্রে চাহিয়া ছিলেন, তিনি বোধ করি তাহাদের দুইজনকেই বুঝিতেছিলেন,—কারণ তিনি তাহাদের মত অনভিজ্ঞ বা বালক নহেন।

নন্দকিশোর কহিলেন,—"সত্যেন্দ্রবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রবে না, গৌরি!"

গৌরী উত্তর না দিয়া সত্যেন্দ্রের মুখের দিকে কোন মতে চাহিল; সত্যও সেই সময় তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল; চোখে চোখ মিলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল। এমন করিয়া পূর্ব্বে তাহাদের সহস্র বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বুঝি, সেই কথাই তাহার মনে পড়িয়া থাকিবে! কিন্তু তাহা আজ আর হইল না। সে হাসির বিদ্যুৎ গৌরীর মেঘাচ্ছন্ন নেত্র হইতে ঝর ঝর করিয়া জলের ঝরণা ঝরাইয়া দিল। গৌরী অকস্মাৎ ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নন্দকিশোর ডাকিলেন,—"গৌরি, গৌরি!" সে ফিরিল না।

বিন্ধ্যবাসিনী সন্ধান করিয়া সংবাদ পাইয়া যখন তাহার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন কে জানে কেমন করিয়া সে ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছিল। নীরব কক্ষে থাকিয়া থাকিয়া একটা রুদ্ধ বেদনার অর্দ্ধব্যক্ত ফোঁপানি শব্দ আপনাকে যেন আর কোন মতে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

পরদিন নহবতের শানাই প্রভাতী সুরে প্রতিবাসিগৃহের শিশুদের জাগাইয়া তুলিয়া উৎসব-গৃহের দ্বারে জড় করিল। নন্দকিশোর নিয়মিত কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ চিকিৎসাগারে প্রবেশ করিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই বিমূঢ়ভাবে বাহির হইয়া আসিলেন; উপরে উঠিয়া ডাকিলেন,—"বিন্ধ্য!" বিন্ধ্যবাসিনী শশব্যস্তে আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন—হইয়াছে কি?

নন্দকিশোর বলিলেন,—"গৌরী নাম ওর কে রেখেছিল? তোমরা কি?"

সংশয় কম্পিত সভয় কণ্ঠ এমন করিয়া বাধিয়া যাইতেছিল যে, মনে হইতেছিল, তিনি যেন জজের কাছে তাঁহার সর্ব্বস্ব পণের মকর্দ্দমার রায় শুনিতে চাহিতেছেন।

কিছু না বুঝিয়া বিন্ধ্যবাসিনী উত্তর করিলেন,—"তা ত জানিনে। বোধ করি, দিদিই রেখে থাকবে। যখন ওকে আনা হয়, ওর জামায়, বিছানায় ঐ নাম লেখা ছিল। আমরাও সেই থেকে ওকে গৌরী বলে ডাকি।"

জজের রায়ে হতাশার সংবাদ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল। নন্দকিশোরের মুখ নীল হইয়া পড়িয়া গেল। জীবনী শক্তি যেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমনই বোধ হইল।

আশাহীনের অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল,—"বেশ মনে পড়ে? ভাল করে ভেবে দেখ দেখি!"

"পড়ে বই কি।"

"তবেই আমার সব ফুরাল!"

অজানিত ভয়ে সম্মুখবর্ত্তিনী নারী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"লাহিড়ী মশাই!"

"জানো না বিন্ধ্য, ধারণা করিতেও পারিনি, আমার কি সর্ব্বনাশ আজ হলো! আমার কেউ নেই—"

"লাহিড়ী মশাই! এ কি, পাগল হয়ে গেলেন—"

"পাগল যদি হয়ে থাকি, বেশী কিছু হইনি। আগে তবে শোন, যাকে আমার ব'লে মনে করেছিলাম, আমার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন ভেবেছিলাম, সে আমার কেউ নয়, সে তোমার দিদির কাছে গচ্ছিত ভবানীপ্রসাদের মেয়ে! এত দিনে সে,—ভবানীপ্রসাদ, এখানে এসেছে—বলেচে, এ তার মেয়ে, আমার কেউ নয়! সে বারেন্দ্র নয়, রাঢ়ী। এ বিয়েও হতে পারে না।"

"সে ভুল করেচে, গৌরী দিদির মেয়ে। দাদা গিয়ে নিয়ে আসেন, তিনি তাহলে শুনতে পেতেন না? বলেন কি? না, না।"

নন্দকিশোরের চারিদিকে পৃথিবী তখন ভীষণ বেগে দুলিয়া উঠিয়াছিল; অচলা পৃথ্বীর সচলতা অকস্মাৎ ভূমিকম্পের রুদ্র তালে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গৌরী তাঁহার নয়? না মনে, না বাহিরে।

তবে এ দুইদিনের জন্য অন্ধের দৃষ্টিদান কেন করিলে, ভগবন্! চিরঅন্ধকারই ত ভাল ছিল!

স্খলিত-চরণে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠাসনে ভর দিয়া নন্দকিশোর আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ঘূর্ণিত মস্তক দেহভার বহন করিতে পারিতেছিল না; তাই আসন গ্রহণ করিতে হইল। গ্রহণলাগা সূর্য্যের ঝাপ্‌সা আলোর মত সেই প্রদীপ্ত সূর্য্য-কিরণ তাঁহার দৃষ্টি-পটে পুরাতন বাঙ্গলা কালীর হরিদ্র রেখা ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল,—সে লেখা অবোধ্য, অস্পষ্ট! স্নেহ-পাত্রীর কৃতঘ্নতা, ভাগ্যের বিশ্বাসঘাতকতা, এক সঙ্গে দুইটা আঘাত এ বয়সে সহে কি? গত সন্ধ্যার ঘটনা শেলের মত বক্ষঃপঞ্জরে বিঁধিয়া আছে, হতাশ হৃদয় সেই অবধি যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া বলিতেছিল,—এত করিয়াও কন্যার মন পাইলাম না? তাহাকে সুখী করিতে পারিলাম না? এ কি হইল!

কিন্তু এই নবীন আতঙ্ক সহসা সে কথা ভুলাইয়া দিল। এখন শুধু এই মাত্র মনে রহিল, তাঁহার গৌরী তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে; সে আর তাঁহার নয়, সে অন্যের। অন্য লোক তাহার পিতা,—তাঁহার কেহ নাই! যন্ত্রণার একটা তীব্র ক্রন্দন মর্ম্মের মধ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল। মানবের অহং ভিতরে জাগিয়া উঠিয়া পদতল হইতে মস্তকের কেশগুলাকে শুদ্ধ কাঁপাইয়া আকুল স্বরে কহিল,—আমার কি হইল?

দ্বারের বাহিরে শব্দ হইল,—"নন্দকিশোর বাবু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বসিয়ে রাখলেন, উত্তরটাও দিয়ে গেলেন না? আমি ভিতরে যেতে পারি?"

উত্তরের পূর্ব্বেই দ্বার ঠেলিয়া কাশকুসুমসদৃশ শুভ্র মস্তক ও প্রসন্ন মুখ লইয়া এক অপরিচিত মূর্ত্তি প্রবেশ করিল। নন্দকিশোর

তাহাকে দেখিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার হাত পাগুলা যেন কে সেইখানে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল,—উত্থান অসম্ভব হইল। অধর ঈষৎ কম্পিত হইল, কি একটা অস্পষ্ট অভিবাদনসূচক ধ্বনি তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল; কিন্তু ঠিক তাহার অর্থবোধ হইল না। বিন্ধ্য তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাবে সচেতন হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। আগন্তুক কহিল,—"আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার কাছে লজ্জা কি, মা? তাহলে ডাক্তারবাবু আমারই অনুমান ঠিক ত?"

আবার একটা মুমূর্ষু কণ্ঠের অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি নন্দকিশোরের রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, "হ্যাঁ।"

"আমার স্ত্রী সূতিকাগারেই তার নাম রাখেন, গৌরী। আপনি জানেন, সূতিকা-গৃহেই তাঁর মৃত্যু হয়; আমিও সেই অবধি দেশ-ত্যাগী। দু বৎসর পরে মিরাটে ফিরে আপনাদের অনেক অনুসন্ধান করি, কিন্তু কোন খবর পাইনি। এবার কলকাতায় এসে এই পাড়ায় এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথায় কথায়, আপনার কথা, আপনার কন্যার বিবাহের কথা উঠে। তিনিই কন্যার নাম উল্লেখ ক'রতে আমি চম্‌কে উঠি। গৌরী! সে ত আমারই মেয়ে—"

"বাবা!"

নন্দকিশোর চমকিয়া দেখিলেন, দুইখানা বল্লরী-কোমল বাহু তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, জুঁইফুলের মত একখানা ক্ষুদ্র সুন্দর মুখ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া "বাবা"—বলিয়া ডাকিতেছে। সহসা তিনি সঞ্জীবনী তাড়িৎ স্পর্শ অনুভব করিলেন। নন্দকিশোর পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় অকস্মাৎ যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রবলবেগে দুই হস্তে তাহাকে তিনি টানিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। আকুল হৃদয় হইতে স্নেহ-বিগলিত আর্ত্তনাদ বাহির হইল,—"মা, মা আমার!" পরক্ষণে দুই বাহু শিথিল হইয়া দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল; অবসাদ-গ্রস্তভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

"বাবা, আমায় না কি আবার কে একটা নিতে এসেছে?" গৌরীর মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছায়া,—তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছিল। অদূরবর্ত্তী বৃদ্ধকে সে লক্ষ্যও করে নাই। কিন্তু সংবাদটা কেমন করিয়া ইতোমধ্যেই বাড়ীময় রাষ্ট্র ও তাহার কর্ণ-গোচর হইয়াছিল।

বৃদ্ধ কহিল,—"হ্যাঁ বাছা, আমিই তোমায় দেখতে এসেচি—"

গৌরী বিদ্যুৎবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া সভয়ে নন্দকিশোরের কাছে ঘেঁসিয়া আসিল; কহিল,—"এই বুড়োর সঙ্গেই কি আবার আমায় যেতে হবে?"

কি সকরুণ মর্ম্মভেদী আবেদনের সে সুর! অথচ কি তীব্র ভর্ৎসনা! সে যেন বলিতেছিল, এমন করিয়াই কি তোমরা আমায় লইয়া পরিহাসের খেলা খেলিতেছ? নন্দকিশোর উচ্চ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"উনিই তোমার বাবা, গৌরি! উনি হয়ত তোমায় নিয়ে যাবেন। আমি ত তোমার কেউ নই, আমি কেমন ক'রে তোমায় ধরে রাখব, মা আমার?" হৃৎপিণ্ডটা বোধ করি এই কথা কয়টার সঙ্গে ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তিনি তাহার কেহ নন? তাঁহার সর্ব্বস্ব-ধন, যে তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখ, সে তাঁহার কেহ নয়?

গৌরী ব্যগ্রহস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া উগ্র স্বরে কহিল,—"আমি যাব না।"

"না মা, তোমায় কোথাও যেতে হবে না। তুমি যাঁর সন্তান হয়ে আছ, সেখানেই থাক। সুখে থাক, সকলকে সুখী কর। আমি ভবঘুরে, চালচুলোও রাখিনি। তোমায় আমি কোথায় নিয়ে যাব? বেশ আছ। কেন তোমার ভালবাসার লোকদের কাছ থেকে তোমায় বিচ্ছিন্ন ক'রব? না, শুধু দেখে গেলাম, আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলাম, আশীর্ব্বাদে ভালই হবে।...ডাক্তার বাবু, ভয় নেই! আপনার ধন আমি অপহরণ ক'রব না। শুধু এই বিয়েটা বন্ধ করা আমার দরকার ছিল, তা না হলে আমি শুধু দূর থেকেই একবার দেখে চলে যেতাম। তবে বিদায়। রাঢ়ী পাত্র দেখে বিবাহ দেবেন। সুখে থাকো মা, সুখী হও।"

এতক্ষণে ঘরের বাতাস যেন লঘু হইয়া আসিল, সূর্য্যের জ্যোতিঃ দীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিল। পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সহজ সবল অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়া নন্দকিশোর স্বাভাবিক ভাবে দুই পা অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন,—"তবে একে আবার আমায় দিলেন?"

"ও ত আপনারই—"

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে কোন সাড়া রহিল না, কেবল গৌরীর দ্রুত নিশ্বাসের একটা অস্ফুট শব্দ থাকিয়া থাকিয়া শুনা যাইতেছিল। সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল—তাই আশ্বাস-লাভেও সে যেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলনা। তাহার জীবনে এ কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে? তাহার এক মাসিমা ভিন্ন কেহ ছিল না।

হঠাৎ একদিন এক ব্যক্তি গিয়া পিতৃ পরিচয়ে তাহাকে সেই মাসিমার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিল। সে বিচ্ছেদ-ব্যথা এখনও সে ভুলিতে পারিতেছে না, আবার আর একজন হঠাৎ একদিন প্রভাতে আসিয়া বলিল,—"ও নয়, আমিই তোমার পিতা।" আবার পিতা নিজেও সেই কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন,—"হাঁ, উনিই তোমার পিতা, আমি কেহ নই।"

গৌরীর পিতা অবশেষে সেই ভাবোন্মাদনাপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন,—"তবে চল্লেম, লাহিড়ী মশাই। আর দেখা হয় কি না হয়। এবার বদরিনারাণ যাব ভেবেছি। মা, একবার ফিরে দাঁড়াও। তোমার মুখখানি একবার দেখে যাই—" গৌরী নন্দকিশোরের বক্ষে মুখ লুকাইল। তিনি সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—"যাও গৌরি, ওঁকে প্রণাম ক'রে এস,—কাছে যাও—"

সে এ আদেশ প্রতিপালন করিল না, বরং জোর করিয়া নিজের মুখখানা যথাস্থানে চাপিয়া রাখিল। নন্দকিশোর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে ঈষৎ অপ্রতিভ ও বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ইহা বুঝিয়া ভবানীপ্রসাদ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"থাক্, বেটী ভয় পাচ্ছে। পাছে ওর মুখখানা দেখ্‌লে এ পাষাণ বুকে প্রাণ সঞ্চার হয়ে যায়, পাছে মায়ার বাঁধনে প'ড়ে ছেড়ে যেতে না পারি। হয়ত ঠিকই বুঝেছে, কি বলেন, ডাক্তার বাবু! আর কাজ নেই—তা হ'লে নমস্কার, মশাই! আপনার মঙ্গল হোক, সুখে থাক মা।"

নন্দকিশোর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"সে কি এখনই কেন যাবেন? দু-এক দিন—না হয় আজকের দিনটা—"

"জানেন ত সবই ডাক্তার বাবু! কেন মিথ্যে আবার জড়াতে চাচ্ছেন? কি জানেন. মানুষের মন। এ দুনিয়াকে বিশ্বাস ক'রতে নেই! আসি তা হলে।"

অল্পক্ষণে পরেই দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দে গৌরী বুঝিল, সে ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছে। সে মুখ তুলিতেই দুইটি গভীর স্নেহ-ভরা উৎকণ্ঠিত উৎসুক নেত্রের সহিত তাহার নেত্র মিলিল। উভয়েই একটু হাসিল। গৌরী অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বুড়োটা চলে গিয়েছে?"

"হাঁা। কিন্তু ও রকম করে তাঁকে বলতে নেই গৌরী, তিনি তোমার বাবা, আর কত মহৎ তিনি।"

কৃতজ্ঞতার আনন্দে নন্দকিশোর রুদ্ধবাক্ হইয়া গললগ্না কন্যাকে আরও কাছে সরাইয়া লইলেন। তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে গৌরী কহিল,—"রাম বল! সে কেন আমার বাবা হবে? তুমিই আমার বাবা।"

বিন্ধ্যবাসিনী অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে ছিলেন; এইবার হাসিয়া ফেলিলেন।

৪১

মানব-অন্তঃকরণের নিভৃত কন্দরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার মানস-লিপি পাঠ চেষ্টার মত কঠিন চেষ্টা এ সংসারে বোধ করি আর কিছুই নাই! কি গভীর রহস্যে. কি জটিলতায় পূর্ণ করিয়া বিধাতা এই মানব-চিত্তকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, স্থির চিত্তে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে মানব চিত্ত আত্ম-চৈতন্যের অবস্থিতি-গৌরবে উজ্জ্বল, আনন্দময় ও মহৎ, তাহাই

নিজের কৃত জটিল পাপান্ধকারে ঘৃণ্য বীভৎস ও কুৎসিত। এ জগতে সমুদ্রের বিশালতায় আমরা বিস্মিত হই, অনন্ত আকাশের বিশালতর মূর্ত্তি আমাদের চিত্তকে স্তম্ভিত করে; কিন্তু এই অসীম মানব-চিত্তের বিশালতম পরিচয় আমাদের সমস্ত হৃদয়কে এককালে অভিভূত করিয়া দেয়। একটি ক্ষুদ্র হৃদয়েরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া যদি কেহ কাব্য লিখিতে বসেন, তবে নিঃসন্দেহ সে কাব্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যকেও পরাভব করিতে সমর্থ হইবে। কেন না, মানব-চিত্তে যাহা নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শচীকান্ত জীবিত দেহে প্রাণহীনবৎ বহুক্ষণ সেই বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিল। যে পবিত্র নাম সে সারাজীবনের অবলম্বন করিয়াছিল, করালীচরণের মুখে অকস্মাৎ তাহা উচ্চারিত হইবার পর হইতেই সে যেন মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়াছিল। মানুষের অবস্থা বিশেষে বিষ অমৃত ও অমৃত বিষে পরিণত হয়।

ট্রেন আসিল। মহাকায় দৈত্যের ন্যায় উদর-গহ্বরে কতকগুলা লোকজনকে ভরিয়া গর্জ্জন শব্দে বিদায় লইল। সন্ধ্যা শুক্রতারা তাহারই কুক্ষিতলে বিলীন হইয়া গেল, তথাপি শচীকান্তর সর্ব্বশরীরের কম্পন থামিল না। একটা যে প্রবল ঝটিকা ভিতর হইতে দুর্ব্বল দেবদারুর মত সঘনে তাহাকে কাঁপাইতেছিল, তাহা তাহার বিবেক ও স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ। প্রথম মুহূর্ত্তে সে মনে করিল,—"এখনই শিবনারায়ণকে গিয়া খবর দিই, তিনি ইহাদের হস্ত হইতে মণীশের বাগ্‌দত্তাকে মুক্ত করিয়া লউন। এ ব্যক্তি অতি নীচ, ইহার অভিপ্রায় ভাল নয়, অর্থের জন্য এ সব করিতে

পারে।" কিন্তু এ চিন্তা তাহার চিত্তে স্থায়ী হইল না। প্রথমকার এ মহত্ত্বকে চাপা দিয়া ভিতর হইতে স্বার্থ হাঁকিয়া উঠিল, "রহ, রহ, এত ব্যস্ত কেন? ভাবিয়া দেখা যাক্—সত্য সত্যই তাহার প্রয়োজন আছে কি না!" এইখানেই দেবে দানবে, যমদূতে বিষ্ণুদূতে, সমর বাধিল। বিবেক কহিল "ভাবিবে আবার কি? কর্ত্তব্য-পালনে বিলম্ব অবিধেয়।" স্বার্থ আবার ঘোর রবে আপত্তি তুলিল, —"কর্ত্তব্যই ত করিতে চাই, কমলা মণীশের বাগ্‌দত্তা কিসে? তাহার যথার্থ অভিভাবক বহুপূর্ব্বে তাহাকে আমায় দিয়াছেন, তাহার উপর মণীশের কিসের অধিকার?"

বিবেক এ যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টায় অনেক শরক্ষেপ করিল, কিন্তু এ দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে সে সক্ষম হইল না। সপ্তরথীতে সেখানে প্রবেশ পথ আগলাইয়া রাখিয়াছিল। বিবেকের শাসন মন মানিতে রাজি হয় না। সে প্রবল স্বরে হাঁকিয়া বলে, "কেন আমি এ সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিব? কেন, আমি নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিব না? আমি ত চেষ্টা করি নাই, যদি—"

এইখানেই একটা খট্‌কা বাধিয়া যায়!—কি বলিবে? যদি ঈশ্বর সুযোগ দিয়াছেন? ঈশ্বর কে? সে ত তাঁহাকে কখনও চিনে নাই,—ডাকে নাই,—আছেন কি না, তাহাতেও সংশয় করিয়া আসিয়াছে। তবে কি এ দৈব? অদৃষ্ট? কে তাহাকে আজ এ সুযোগ দান করিল? আচ্ছা, সে যেই হউক, তাহাতে কি? কেন সে তাহার দান গ্রহণ করিবে না?

সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল। রাত্রিও গভীরতর হইতে লাগিল

বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া ডেলি-পেসেঞ্জারগুলা অফিসের বাবুদের গৃহে ফিরাইয়া দিয়া গেল। ষ্টেশন ক্রমেই জনশূন্য হইতে হইতে শেষকালে এক সময় একেবারেই নিঃসাড়া হইয়া আসিল। বাহিরে গাছের ঝোপের মধ্যে তীব্রস্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতে লাগিল। কুয়াশার একখানা পাতলা ওড়না নৈশ প্রকৃতির অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল, তাহার মধ্যবর্ত্তী ক্ষীণ নক্ষত্রালোক সূক্ষ্ম বসনান্তরালে সুন্দরীর অঙ্গলাবণ্যবৎ অর্দ্ধ বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। কেবল গাছপালায় অসংখ্য জোনাকির ঝিকমিকানি যেন তাঁহারই নিশ্বাস-প্রশ্বাসভরে কম্পিত হীরক দুলের মত থাকিয়া থাকিয়া ঝকিয়া উঠিতে লাগিল। সেই প্রবল শীত হিম নিদ্রালস্য উপেক্ষা করিয়া শচীকান্ত তেমনই নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, এবং তাহার মনের মধ্যে তেমনই ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল।

ষ্টেশনের মধ্যে লোকজন অল্পই ছিল। কুলী দুইটা একটা চট মোড়া মাল ঠেলিয়া আনিয়া তাহার গায়ে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিল। আলোগুলা নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কেবল একটিমাত্র ল্যাম্প মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। ভোর পর্যন্ত আর কোন গাড়ি আসিবার কথা নাই। পাশের দোকানগুলা শুদ্ধ সেই অবসরটুকুর জন্য নিঃস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

শচীকান্ত ভাবিতে ভাবিতে একবার আলোটার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল, সেই আলোকে কে তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল অবধি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা উলটিয়া দেখিতেছে। সে আলোকের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

কিন্তু হায়, সেই অদৃশ্য দর্শকের অন্তর্বিদ্ধকারী দৃষ্টি হইতে নিজেকে সে লুকাইতে পারিল না। এ দিকের মৃদু অন্ধকারে তাহারই দুই নেত্র অনল উদ্গীরণ করিয়া যুক্ত-তারকার আকারে চোখের উপর দুই ভর্ৎসনা দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রাখিল। শচীকান্ত শিহরিয়া দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া বেঞ্চের পিঠে মাথা রাখিল। সে দৃষ্টি যেন তাহার পিতার অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নেত্র-যুগল স্মরণ করাইয়া দেয়! সে আবার মনে মনে বলিল,—যেন সেই দৃষ্টির সম্মুখে নিজের সাফাই দিতে গিয়া ভাবিল,—আমার দোষ কি? আমি ত পাপ করিতেছি না, কাহারও কোন ক্ষতি করিতে ইচ্ছুক নই, তবে এত সঙ্কোচই বা কিসের?

কিন্তু সঙ্কোচ নাই, বলিলেও সঙ্কোচ যে যায় না। দোষ নয় ভাবিতে চেষ্টা করিলেও সারা প্রাণ অপরাধের ভারে যে ভারী হইয়া উঠিতেছে। মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতে লাগিল। পাপ নয়, তবে কেন এ আগুন? তবে কেন এ হত্যাকারীর আতঙ্ক? চোরের মত এ যন্ত্রণাপূর্ণ সঙ্কোচ! ইহা কি,—কি তবে?

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিল, চারিদিকে চাহিয়া ললাটের কেশগুচ্ছ অপসৃত করিল কুয়াশার আক্রমণে নক্ষত্র দুইটি ঢাকা পড়িয়াছে, তথাপি সেই দিকে চোখ পড়িতেই আবার তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। সেই অদৃশ্য তারকাদ্বয় যেন সেইখানে অগ্নিময় অক্ষরে তাহার পিতার হস্তলিপির অনুকরণে লিখিয়া রাখিয়াছিল,—"বিশ্বাসঘাতকতা! বন্ধুদ্রোহ!"

জ্বলন্ত গোলা যেন তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে অকস্মাৎ বিদ্ধ করিয়া

তাহার মুখ হইতে আচমকা একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বাহির করিয়া লইল,—"ওঃ না, না, না!"

সে যেন মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে অতি নিকটে তাঁহার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিল। সেই প্রসন্ন মুখ, অথচ তেমনই হৃদয়ভেদী দৃষ্টি! তিনি যেন তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন! শুধু একটু হাসি, কিন্তু ইহাতেই তাহার সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল। যেন কানের কাছে স্পষ্ট তাঁহারই কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইল, -"ইহা বিশ্বাসঘাতকতা, মিত্রদ্রোহ ইহাই।" হায়, হায়, তবে তাহাকে কি এখনই চাকদায় যাইতে হইবে? মণীশের খুল্লতাতের নিকট করালীচরণের অসদুদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া বন্ধুর ঋণ শোধ করিতে হইবে? লোকে ইহাতে তাহাকে বন্ধুবৎসল বলিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের ইহাতে কি লাভ? দুই বৎসরাধিককাল যাহার অনুসন্ধানে সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, যাহার জন্য সংসারের কোন লাভের দিকেই সে চাহিয়া দেখে নাই, বরং করায়ত্ত লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দারিদ্র্যগ্রহণে দ্বিধা পর্য্যন্ত করে নাই, সেই চির ঈপ্সিতাকে কিসের মূল্যে সে ত্যাগ করে? বন্ধুত্ব? কর্ত্তব্য? সংসারে ইহাদের স্থানও অল্প নয়। নিজের হৃদয়ের মধ্যে যতই আর্ত্তনাদ উঠুক, তাহা চাপা দিয়া জগতের চক্ষে যশোলাভ করিয়াই তৃপ্ত হইতে হইবে? বেশ, তাহাই সে করিবে। প্রথম গাড়িতেই সে চাকদা যাইবে।

এতক্ষণে যেন মস্তিষ্কের পীড়ন বক্ষের অস্থিরতা কতকটা শান্ত হইয়া আসিল। ফুটন্ত শোণিততরঙ্গ উদ্দাম নৃত্য ভঙ্গ করিয়া শান্ত গতি ধরিয়া নিজ পথে বাইতে আরম্ভ করিল। এত শীতেও

আভ্যন্তরিক তাপে ললাট তলে দুই এক বিন্দু ঘর্ম্ম জমিয়া উঠিয়াছিল। তাহা মুছিয়া ফেলিয়া দুই হাতে সে মাথাটা টিপিয়া ধরিল। ললাটের স্ফীত শিরা অল্পে অল্পে স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ শচীকান্ত যেন একটা বিস্মৃত স্মৃতির উদ্রেকে আশান্বিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, আমি কি একাই তাহার বন্ধু! সে ত কই বন্ধু বলিয়া আমার কথা মনে করা আবশ্যক বোধ করে নাই? এত বড় সন্দেহজনক অবস্থায় না কি কেহ সত্য পরিচয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে? মণীশ নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, এ কমলা তাহারই সেই হারাণ কমলা। সে কি তাহার মুখ চাহিয়াছিল? তবে কেন, সেই বা নিজের এ সর্ব্বনাশ করিবে?—না। ইহা কর্ত্তব্য নয়। সে ভুল বুঝিয়াছিল। কিছুই সে প্রকাশ করিবে না। করালীচরণ যে ইঙ্গিত দিয়া গেল, সেই মতই কাজ করিয়া যাহার জন্য সে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, তাহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। কেন সে নিজের অন্ধকার চিত্তে একমাত্র সুখের আলোক জ্বালাইতে এত দ্বিধা করিতেছে? কোন সঙ্কোচের কারণইতো বর্ত্তমান নাই। সে ই বরং তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিল।

এতক্ষণে আসন ছাড়িয়া সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে তখন কুয়াশার সূক্ষ্ম আস্তরণ পুরু হইয়া সুপ্ত জগতের অঙ্গে শীতবস্ত্র বিছাইয়া ধরিয়াছে। আকাশে একটিও তারা দেখা যাইতেছে না। সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ নিজের মনকে বল দিবার জন্য, উৎসাহিত করিবার জন্য কহিল,—এই আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য।

নিজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করিয়া পূর্ব্বেই কেন অপরের কথা ভাবিতেছি ?

কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবকেও যেন সে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হইল না। সেই চন্দ্র তারাহীন নৈশ অন্ধকারে হিমবসনাবৃতা বিধবা নিশীথিনী যেন তাঁহার শীতল অঙ্গুলি তুলিয়া অলঙ্ঘ্য আদেশের শব্দহীন গম্ভীর ভাষায় উচ্চারণ করিল,—"ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপী মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে !" মহাশূন্যে সেই শাস্ত্র শাসন গম্ভীর ধ্বনিতে শব্দায়মান হইয়া উঠিল। দশ দিকে সেই নীতিবাক্য ধ্বনিত হইতে লাগিল। শব্দহীনা যামিনীর তৃতীয় প্রহরে, স্তব্ধতার প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে সেই ভীষণ বাণী যেন কোন অশরীরী মহাপ্রাণীর অখণ্ডনীয় অভিশম্পাতের ন্যায়ই জাগিয়া উঠিয়া একমাত্র শ্রোতার প্রতি শিরা-উপশিরার ভিতরে ভিতরে তুষার শীতলতা সঞ্চালিত করিয়া দিল। ক্লান্তিতে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কয় মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সর্ব্ব যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল।

যখন সে জাগিয়া উঠিল, শীতে তাহার সর্ব্ব শরীর জমিয়া আসিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সারা প্রাণ বেতসের মত যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ঈষৎ শিহরিয়া সে সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তারপর আর ভাবিতে না পারিয়া অবসন্নভাবে বেঞ্চের পিঠে মস্তক রক্ষা করিল। খোলা জায়গায় ভোরের হাওয়া ছুরির মত হাড়ের মধ্যে গিয়া বিঁধিতেছে। প্লাট-ফরমের একটি মাত্র দেওয়াল ল্যাম্প অতি ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল। চারিদিকে তখনও অস্পষ্ট অন্ধকারের রাজত্ব বিরাজমান। নিস্তব্ধতার মধ্যে গাছের পাতা হইতে বৃষ্টির মত

কুয়াশা-দীর্ণ শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়ার টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ যেন কোন শোকার্ত্তা নারীর অশ্রুপাতের ন্যায়ই নব জাগরিত বায়ু-শব্দের সহিত শ্রুত হইতেছিল। ষ্টেশনের মধ্যে অফিস-ঘরে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে আলো জ্বলিতেছে, বদ্ধ শার্সির মধ্য দিয়া সে আলো কাঁকর-ফেলা পথের উপর পড়িয়াছে। সেখানটাকে যেন দুঃখীর দীর্ণ পঞ্জরের মতই দেখাইতেছে। দুই একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। একটা কুলী জোরে জোরে ঘড়িতে ঘা দিয়া পাঁচটা বাজাইয়া দিল। কোথা হইতে একটা কলের আহ্বান বাঁশী ঊর্দ্ধ স্বরে বিশ্রাম শয়ান কর্ম্মীদলের জাগরণ-গীতি গাহিয়া উঠিল। শচীকান্ত চোখ রগড়াইয়া একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল—সে এখানে কেন?

একটা লোক অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। সে আর কৌতূহল দমন করিতে পারিল না; কাছে আসিয়া ডাকিল, "বাবু!"

শচীকান্ত অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল, এ পৃথিবীতে যে সে ভিন্ন অপর কোন মনুষ্যবাস করিতেছে, গতকল্য হইতে সে কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল। লোকটি বলিল,—"আপনি সন্ধ্যা থেকে বসে আছেন, কোথায় যাবেন?" উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ সে কহিল,—"এখনই একটা গাড়ি আসবে। যান ত তৈরি হয়ে নিন্।"

শচীকান্ত এতক্ষণে কথা কহিল। প্রথমটা নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই যেন সে বিস্ময় বোধ করিল,—এ যেন আর কাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বর!—"কোন দিকের গাড়ি?"

"রাণাঘাটের দিকের।"

পদতল হইতে মস্তক অবধি সঘনে কাঁপিয়া উঠিল,—"রাণাঘাটের দিকের গাড়ি, তা আমার কি ?"

"আপনি তাহলে কোন দিকে যাবেন ?"

"আমি,—কোনদিকে যাব ?"

কুলীটা অবাক্ হইয়া বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মনে মনে ভাবিল, "বাউরা !"

ঘণ্টা বাজিল। টিকিট ঘরের সম্মুখে কয়েকটা লোক টিকিট কিনিতেছে। শচীকান্ত কলের পুতুলের মত সেইখানে গিয়া হাত পাতিল, পরে মণিব্যাগ খুলিয়া কোন্ সময় যে টাকাটা বাহির করিয়া দিল, কিছুই তাহার খেয়াল রহিল না। অর্থ গ্রহণ করিয়া টিকিট-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথাকার টিকেট ?"

শচীকান্তর বক্ষে আবার শোণিত-তরঙ্গ ছুটিল। কিছুক্ষণ নিঃসাড় থাকিয়া অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করিল—"চাকদা।"

"কোথা বল্লেন ? চাঁদপাড়া ?"

"হাঁ, না।—চাঁদপাড়া নয়।"

"তবে ?"

"চাকদা"

"ওঃ, চাকদা ! এই নেন্।"

তেমনি কলের পুতুলের মতই পূর্ব্বস্থানে সে ফিরিয়া আসিল। একবার মনে করিল, টিকিটখানা হাত হইতে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পারিল না, সেখানে ... মন্ত্রবলে হাতের মুষ্টিকে আঁটিয়া ধরিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া উষালোক জগতে নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পথ ঘাট গাছের তলা সব ভিজাইয়া দিল। অকস্মাৎ শিহরিয়া শচীকান্ত দেখিল, দুইটা জ্বলন্ত রক্ত নেত্র বিস্তৃত করিয়া এক বিকটাকার দানব তাহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আতঙ্কে সে পিছু হটিয়া দেওয়ালে পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। দেখিতে দেখিতে দৈত্যটা সহসা একখানা ট্রেনের রূপ ধরিয়া নম্র মূর্ত্তিতে প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। অসুর মূর্ত্তির চেয়েও এ ভয়ানক!

৪২

সোণার রংয়ের পাকা ধানে ক্ষেতগুলি ঝলমল করিতেছে। তাহারই একধার দিয়া শীতের নদী বহিয়া চলিয়াছে। আকাশের অঙ্গে বিবিধ আকারের মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। প্রখর রৌদ্র কিছু পূর্ব্বে তাহাদের অঙ্গে শোণিত ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এখন সে রৌদ্রতাপ নাই, কিন্তু সূর্য্যদেব এখনও জল-তলে লোহিত রাগে ভক্ত-হৃদয় ধারা ঢালিয়া রাখিয়াছেন। 'জবাকুসুম সঙ্কাশ' যেন জবার মালা দিয়া জলশায়ী অনন্তের পূজা সমাধা করিয়াছেন। ইতঃমধ্যে কোথাও ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে, রাশি রাশি খড়ের আঁটি বাঁধিয়া স্তূপাকারে একপ্রান্তে রক্ষিত রহিয়াছে, গরুর গাড়ীতে কৃষক-পরিবার শস্য বোঝাই দিতে ব্যতিব্যস্ত। হিম-সঙ্কুচিত বন বিহঙ্গ পক্ষ বিস্তৃত করিয়া দূর পরপার হইতে নীড়-লক্ষ্যে ফিরিতেছিল। কচিৎ দুই একটা পক্ষী স্থির বাতাসে পক্ষ ঢালিয়া ইচ্ছা-সুখে কোন্ দিগন্তের শেষে ভাসিয়া চলিয়াছে।

মণীশ এই শান্ত সন্ধ্যায় মাঠের আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া গ্রাম

ছাড়াইয়া বট অশ্বত্থের ছায়া নিবিড় তরুতলে ঘাটের কাছ অবধি আঁসিয়া পড়িল। গ্রাম্য নারীগণ তখন যে যাহার কলস ভরিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। কৃষাণ তখন শ্রমশেষে কাস্তে হাতে রামপ্রসাদী একতালা "মন রে কৃষি কাজ জান না" গাহিয়া ঘরের পানে চলিয়াছে। আকাশের কোলছাড়া পাখীগুলি বহুবিস্তৃতশাখ প্রাসাদতুল্য মহা-বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে করিতে দিবসের শেষ আলাপ সাঙ্গ করিতেছিল। ভ্রমণ-ক্লান্ত মণীশ একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। এবার এখানে আসিয়া মণীশ আবার তাহার আরব্ধ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীপতি বাবু দরিদ্র সন্তানগণের অভি-ভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া এত দিন যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, সেখানে সে বৃথা ক্ষমতা ব্যয় করিতে যায় নাই। পায়রাডাঙ্গায় একটি দরিদ্র পাঠশালা স্থাপনার্থ প্রতিদিন সেইখানে সে যাতায়াত করিতেছিল। ইহা ব্যতীত অপরাহ্নে কর্ম্ম-পরায়ণ চাষাদের মাঝ-খানে তাহার উদয় যেন জ্যোতিষ্মান্ মঙ্গলগ্রহের অভ্যুদয়ের মতই পরিকল্পিত হইত। মূর্খ শ্রমজীবিগণ সাগ্রহে দাদাঠাকুরের মুখের অমৃত বাণী, বিদেশী শ্রমজীবিগণের বিস্ময়কর ত্যাগশীলতা, স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতিপ্রীতি ও ধর্ম্মপ্রাণতার কথা শ্রবণ করিত। গৌরবে তখন তাহাদের জ্যোতিঃহীন নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, বৃক্ষতলে সুষুপ্ত মানবাত্মা জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের বাহিক ব্যবধান দূর করিয়া দিত। কেহ দন্তে দন্ত চাপিয়া, কেহ বা সহাস্যে অকস্মাৎ কহিয়া উঠিত,—"আমরাও ত হলে ভদ্রলোকের মতন ভাল ভাল কাজ করতে পারি,—হ্যাঁ দাদাঠাকুর?"

দাদাঠাকুরও উৎফুল্ল নেত্র স্নেহে করুণায় ঈষৎ আর্দ্র করিয়া

ভারি গলায় উত্তর দিতেন,—"স্বভাবে যে ভদ্র, সেই প্রকৃত ভদ্র! কেন পারবে না তোমরা?"

অশিক্ষিত যুবা বৃদ্ধ বালকের দল মুগ্ধ হইয়া ভাবিত, "দাদাঠাকুর দেবতা!" কৃষ্ণনগরের মধ্যে যাহারা ন্যূনবয়স্ক তাহারা নিত্য দাদাঠাকুরের নিকট প্রথম পাঠ অভ্যাস করিত। মণীশের সহৃদয় অধ্যাপনায় পুরুষানুক্রমে-অশিক্ষিত কৃষক যুবার পক্ষেও বিদ্যাশিক্ষার কঠোরতা সামান্য মাত্রাতেও উপলব্ধি হইতে পারিত না। বরং তাহারা এই ছলে উপদেশ-বহুল পাঠে একটা নূতন আনন্দ-রস প্রাপ্ত হইত।

আজও মণীশ সেই প্রাত্যাহিক কার্য্য-ব্যপদেশে এখানে আসিয়াছিল; কর্ম্মশেষে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে বিশ্বজগতের দ্বার রাত্রির অন্ধকারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। সন্ধ্যাতেই বক্র রেখায় চাঁদ উঠিয়া অভয় হাস্যে বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিল। আবার ভীত জগৎ প্রসন্ন চিত্তে হাসিয়া উঠিল! মণীশ গৃহে প্রতিগমনার্থ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে একটুখানি কালির রেখা কেন? এই সুন্দর, সানন্দ ও বিশাল জগতের মধ্যে সে কেন আর তাহার সকল দীনতা সেই এক অবিচ্ছেদের মধ্যে সমর্পণ করিতে পারে না! কেন নিজের অক্ষুব্ধ প্রেমের সুধা ঢালিয়া তৃষিত সংসারের বুভুক্ষা বিদূরিত করিতে না চাহিয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুধা লইয়া অতৃপ্তি ভোগ করিতেছে? হায়, মানুষের সীমাবদ্ধ হৃদয়, উদার হও, সীমা হারাইয়া ফেল, অমৃত লাভ কর। তুমি যে অমৃতের পুত্র! কিন্তু হায়, সে যে মানুষ! সে কেমন করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব ভুলিয়া দেবতা হইবে? মন যে দেব-প্রসাদ ভোগ করিতে চাহে, দেবতা হইতে চাহে না!

মণীশ ধীরপদে গৃহে ফিরিল। ঘরে সন্ধ্যা দীপ জ্বলিতেছে। সত্য দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। মণীশকে দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিল। সত্য কহিল,—"কে এসেছেন বলতে পারো ?"

মণীশের বক্ষে সংশয় সজোরে আঘাত করিয়া উঠিল। নেত্রপল্লব নত করিয়া সলজ্জ সন্দেহে মৃদু স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল,— "কে, সতু ?" উত্তর শুনিবার জন্য নিজেরও অজ্ঞাতে সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

"শচী দাদা।"

"শচী !"

"হ্যাঁ, এই যে তিনি—"বলিতে বলিতে শচীকান্ত বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া মণীশ সাহ্লাদে তাহার হাত ধরিল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি যে হঠাৎ এ সময় ? ভাল আছ ত শচী ?"

"ভাল ! হ্যাঁ, আছি। তোমায় একবার দেখতে এলুম। তুমি ভাল আছ ?"

"হাঁা, আমায় দেখতে এসেছ তবে ?"

"হ্যাঁ ভাই, তোমাকে দেখতে এসেছি। তুমি বেশ ভাল আছ ত ?" মণীশ বন্ধুর এই পুনঃপুনঃ সাগ্রহ কুশল প্রশ্নে বিগলিত হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, তাহার সহিত শেষটা সে যে একটু বেথাপ ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল, এ প্রায়শ্চিত্ত তাহারই ! স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সে কহিল,—"আমি খুব ভাল আছি শচী। এসো, বসবে এসো। কতক্ষণ এসেছ ?"

"এই একটু বেলা হল, এসেছি। এখানে এসেছি সকালের

ট্রেণে। দুপুর বেলা শুনলুম, তুমি পায়রাডাঙ্গা গেছ। বিকালে শুনলুম, তুমি এসেই আবার কোথা বেরিয়েছ। কোথায় গেছলে? সত্য বল্লে, মাঠে। কেন? একা সন্ধ্যাবেলা মাঠে কি করছিলে? মন কি ভাল নেই?

ইতঃমধ্যে বন্ধুদ্বয় গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া পাশাপাশি আসন গ্রহণ করিল। সত্য তাহাদিগকে বিশ্রব্ধালাপের অবসর দিয়া সরিয়া গিয়াছে। মণীশ উদ্ভাসিত আলোকে বন্ধুর মুখের দিকে প্রীতি-কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া বিস্ময় বোধ করিল। বিবর্ণ মুখে দুই চোখ যেন বিদ্যুতের মত তীব্র আলো বিতরণ করিয়া জ্বলিতেছে। বেশভূষা বিশৃঙ্খল, মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা নিদারুণ কষাঘাতের মত গভীর রেখায় আপনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মুখ চোখের ভাবে খুনী আসামীর ভয়াবহ প্রতিকৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। মণীশ বিমূঢ়-ভাবে ডাকিল,—"শচী—"

শচীকান্ত মণীশের দিকে চাহিয়াই শিহরিয়া দৃষ্টি নত করিল। অসহ্য! কি গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! সে যদি জানিত, সে যদি বুঝিত, তাহার বিরুদ্ধে কি ভয়ানক ঈর্ষা, কি ঘৃণা, কি দারুণ বিদ্বেষ সে মনের মধ্যে পোষণ করিয়া বেড়াইতেছে! তাহার বাহিরটার মত ভিতরটাকে এমন স্পষ্ট দেখিতে পারিলে এতক্ষণ সে হয় ত তাহার নিকট হইতে শত হস্ত দূরে সরিয়া যাইত। এখনও তাহার সেই আভ্যন্তরিক ঝটিকা নিবৃত্ত হয় নাই। সেই অগ্ন্যুৎপাতের গৈরিক নিঃস্রাব এখনও তাহার সারা প্রাণ ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে।

স্বেচ্ছায় সে এখানে আসে নাই। কে যেন জোর করিয়া

তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে। দুইবার খবর লইয়া যখন সে মণীশের অনুপস্থিতি-সংবাদ পাইল, তখন মস্ত বড় একটা যুক্তি তাহার চিত্তে আশার বাণী বহন করিয়া আনিল। তবে সে আর কি করিবে? অগত্যা মণীশের সহিত বিনা সাক্ষাতেই ফিরিয়া যাইতে হয়। সে ত আর চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সেই দিনই ফিরিবার কথায় দাদা এমনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং নিজের মনে সে এমন একটা গুরু অপরাধের ভার অনুভব করিল যে যুক্তিটা সম্পূর্ণ অকাট্য হইলেও তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যায় আবার সে যখন মণীশের প্রতীক্ষায় তাহার বসিবার ঘরের টেবিলটার সম্মুখে সেই চিরপরিচিত স্থানটি গ্রহণ করিয়া বসিল, তখন একবার তাহার চিত্তের ভিতরকার রুদ্ধ উত্তাপ হিম হইয়া আসিতে লাগিল। নিজের গুরু অপরাধ উপলব্ধি করিয়া সে যেন কেমন একটা আকুল চঞ্চলতা অনুভব করিল। তাহাদের সেই আবাল্য প্রীতি প্রবাহিণীর মন্দীভূত বেগশীলতা সহসা যেন পূর্ব্বগতি ফিরিয়া পাইতেছে, এমনি সে অনুভব করিতে লাগিল। মনে হইল, সেই কলেজের ছাত্র শচীকান্ত, তাহার অকৃত্রিম বন্ধু মণীশের কাছে আজ সে আসিয়াছে, আর কোন কিছু না।

অনেকক্ষণ অবধি মণীশ বাড়ী ফিরিল না। জানালার মধ্য দিয়া শচী পুনঃপুনঃ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। গাঢ় মসীবর্ণ আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের জ্যোতি অতি মাত্রায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তাহারই একপার্শ্বে ক্ষয়প্রাপ্ত চক্রার্দ্ধবৎ চন্দ্র রত্ন-

ভূষণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। গাছের পাতায় পাতায় চন্দ্রকর-লেখা মাথামাখি হইয়া গিয়াছিল। কে একজন দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। শচীকান্ত উন্মুখ হইয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিল। মণীশ সম্মুখীন হইলেই সে তখনই উঠিয়া তাহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিবে, প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিবে, আজ আমি তোমার বন্ধু, তোমার প্রকৃত বন্ধু হইতে আসিয়াছি, খোলস ফেলিয়া আসিয়াছি, আমায় কাছে ডাকিয়া লও। কিন্তু তাহার প্রতীক্ষা ব্যর্থ করিয়া আসিল, সত্য! আবার সে শুভ মুহূর্ত্তকে বিফল হইতে দেখিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা দুর্ব্বলতা সে অনুভব করিল। সাময়িক উত্তেজনার মত্ততাও ক্রমে ফুরাইয়া আসিল।

শেষে মণীশ আসিল। তাহার পদধ্বনি, কণ্ঠস্বর, হাতের স্পর্শ, শচীকান্তর সর্ব্বশরীরে এককালে সহস্র তাড়িৎ ছুটাইয়া দিল। গূঢ় আনন্দের আভায় সারা মুখ উজ্জ্বল করিয়া সুখ-স্পন্দিত হৃদয়ের আবেগে কম্পিত স্বরে সে যখন তাহাকে সম্বোধন করিতে গেল, তখন তাহার সমস্ত শরীরের স্নায়ু একটা অধীর বেদনার বেগে পীড়িত হইয়া উঠিল, অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় বুকখানা ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। কি বন্ধুপ্রেমের সে কি প্রতিদান দিতে বসিয়াছে! মুখ ফুটিয়া সে কি বলিতে গেল, অনুতপ্ত চিত্তের বেদনা-শর উৎপাটিত করিতে চাহিল। কিন্তু আবার সেই 'কিন্তু' মানবের চির-শত্রু, সর্ব্ব মঙ্গল কর্ম্মের বিঘ্নসাধক সেই 'কিন্তু' বলিল,—'করিতেছ কি! এত সহজে তোমার আকিঞ্চনের ধনকে ভুলিয়া যাইবে?' ধীরে সে উত্তর করিল, "কি মণীশ?"

মণীশ বলিল, "তুমি আমার শরীরের কথা ভাবচো, নিজের

চেহারাটা যদি আয়না ধরে দেখ ! এমন হয়েচ কেন ? মনে হচ্চে, যেন কতদিন খাওনি, ঘুমোওনি।” বাস্তবিকই মানসিক সংগ্রামের অনিয়মে শচীকান্তকে চেনা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখ নত করিয়া বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, “একটু অনিয়ম গেছে কি না। কদিন কলকাতায় ওরা সার্কাসে থিয়াটারে ধরে নিয়ে গেছল।”

“তুমি কলকাতা গেছলে ?”

“হঁা। সেখানেই ত জানলুম, তুমি বাড়ী এসেছ। হঠাৎ বাড়ী চলে এলে যে ? কিছু কারণ আছে না কি ?”

মণীশ বন্ধুর আকস্মিক আগমনের গূঢ় কারণ এইবার স্পষ্ট বুঝিয়াছে—মনে করিল, কলিকাতায় মণীশের পুরাতন প্রীতির অযুত স্মৃতি তাহার হৃদয়ে অনুতাপ জাগাইয়া দিয়া আজ আবার তাহার বন্ধুকে তাহার বক্ষে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সে মহানগরীর উদ্দেশ্যে তাহার হৃদয়ের শত ধন্যবাদ প্রেরণ করিল। আনন্দে অকারণ হাসি হাসিয়া সে উত্তর দিল, “হঠাৎ কই ভাই! ছুটির সময় সত্য এলো, আমিও তাই এসেছি! সেখানে আমার নৈশ পাঠশালা চলচে,—কিছু শুন্‌লে ?”

শচীকান্ত আবার যেন একটা স্বস্তি বোধ করিল। “হঁ্যা শুন্‌লুম বই কি, বেশ চলচে। বড় দিনের সময় দুদিন শুধু বন্ধ ছিল। সে দুদিন ওরা ইন্দুভূষণকে শুদ্ধ থিয়েটার ধরে নিয়ে গিয়েছিল।”

মণীশ হাসিতে লাগিল, “ওদের সঙ্গে আমি ছাড়া আর কেউ পারে না। তুমি এখন দুদিন থাকবে ত ? বেশ বই লিখেচ !”

শচীকান্ত এই কথায় একটু যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাহিরের দিকে চা[illegible] পরাধীর ভাবে সে উত্তর করিল, “আমি

কাল সকালেই যাবো—পাঁচটার ট্রেণে, তোমার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না—”

মণীশ সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “ইস্, যেতে দিলুম বলে! এত তাড়া কেন, শুনি?”

শচীকান্তর ললাট হইতে চিবুক অবধি রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে মাথা নীচু করিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে কহিল, “সেখানে একটা বড় জরুরী কাজ ছিল, যদি মাসিমা মনে করেন, কাজের ভয়ে পালিয়ে রইল—”

মণীশ তাহার হস্ত শিথিল করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, “ওঃ, তাহলে ত আর কথাই চলে না।”

শচীকান্ত একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ছাড়া পাইবার মুহূর্ত্তে তাহার সহসা মনে হইল, মণীশ তাহাকে তাহার মায়াজালে জড়াইয়া নিজের কাছে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলে ভাল হইত! কেন, মুক্তি দিল!

কিন্তু তখন এ চিন্তার অবসর ছিল না। এখনও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে বাকী আছে। কিন্তু কিসের পরীক্ষা! মণীশের মুখে সেই হাসি, কণ্ঠে সেই অক্ষুণ্ণ প্রসন্নতা, দৃষ্টিতে সেই উদার মহত্ত্ব সুব্যক্ত! আহত হৃদয়ের ক্ষত চিহ্ন কোনখানেই শোণিত-পঙ্ক লিপ্ত করে নাই! বৃথা ভয়, মিথ্যা এ ভাবনা! সে এ জগতের অনেক উর্দ্ধে। মানব-চিত্তের ক্ষুদ্র সুখ, কল্পনা, আশা, দ্বন্দ্বযুদ্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সে প্রেমিক নহে নিজেই সে প্রেম!

নিস্পন্দ-লোচনে শ্রদ্ধাসংযত হৃদয়ে সে মণীশের হাস্যোজ্জ্বল

মুখের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাথা নত করিয়া মনে মনে তাহাকে সে প্রণাম করিল। পুলকিত অঙ্গে তাহার আলিঙ্গন কল্পনা করিতে দেহ কণ্টকিত হইল। এ মহাযোগী মহাদেব আজও ধ্যানাসীন! মণীশ উঠিয়া হাসিমুখে সেল্‌ফের উপর হইতে একখানা অতি পরিপাটী আবরণ-মণ্ডিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা লইয়া আসিল। সোণার জলের লতাযুক্ত সুন্দর ছাঁদের টানা অক্ষরে বড় বড় করিয়া ইহার উপরে খোদা "ক্ষণিকের দেখা" এবং মলাটের নীচের পাতার উপর কালীর অক্ষরে লেখা, "চিরস্নেহাস্পদ বন্ধু মণীশকে উপহার। অকৃত্রিম বন্ধু শচীকান্ত।" মণীশ পাতা উলটাইয়া শচীর চক্ষের সম্মুখে ধরিল, "এ লেখাটা চিন্‌তে পার?"

একবার চোখ বুলাইতেই শচীর বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমার ত মনে হচ্চে না, আমি তোমায় এ রকম বই পাঠিয়েছি! কিন্তু লেখা ত আমারই হাতের।"

"কেমন করে হল বল ত?" এই বলিয়া মণীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। "আমি নিজে লিখেচি। জাল করা বড় শক্ত। তোমার চিঠিগুলো দেখে এক একটি অক্ষর কত ধরে ধরে লিখেছি! কিন্তু যখন শেষ হলো, দেখলাম, ঠিক্‌ তোমার লেখার সঙ্গে মিলে গেছে শচী। তখন মনে বড় আনন্দ হল। বোধ হ'ল যেন এ লেখা তুমিই আমায় পাঠিয়েছ। আমি রোজ একবার করে লেখাটি দেখি, আর—"

"মণীশ!" আহত-তন্ত্রী বীণার আকস্মিক ক্রন্দন-মূর্চ্ছনার ন্যায় অকস্মাৎ শচীকান্ত ব্যথা-কাতর চিত্তে কহিল,—"মণীশ, তুমি

তোমার এই পাষণ্ড বন্ধুর কথা এত ভাবো, এতখানি তাকে ভালবাস? তাকে জানো না কিন্তু, কত হীন, কত নীচ সে—" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিলাপ-ধ্বনির মত আকুল স্বরে পুনরায় সে কহিল,—"শোন মণীশ, তোমার চির সুহৃদের অধঃপতন কাহিনী তবে তুমি শোন। আর আমি চাপতে পারি না। যা হয়, হোক। সব বলি, শোন। জেনে যদি ঘৃণা করতে হয়, তাও করো, তবু এ লুকোচুরি—" বিস্ময় মণীশ এ পর্য্যন্ত একটিও বাক্য উচ্চারণে সক্ষম হয় নাই। এতক্ষণে আকস্মিক বিস্ময়ের বেগ ঈষৎ প্রশমিত হইয়া আসিলে সে নিজের আসন তাহার আসনের কাছে আরও টানিয়া আনিয়া তাহার বাহুমূলে সান্ত্বনা-কর স্থাপন করিয়া কহিল,—"শান্ত হও ভাই। আমি কোন কথা শুনতে চাইনে।"

"না মণি! বাধা দিও না, আমায় বল্‌তে দাও। শোন, তুমি কার উপর এত বড় বিশ্বাস, এ অমর প্রেম স্থাপন করেছ? সে তোমার—"

মণীশ ব্যগ্র করে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, তড়িৎ বেগে উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত অথচ পূর্ণ বিশ্বস্ত স্বরে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"একটি কথাও না। আমি তোমার এ পাগলামীর প্রশ্রয় দিতে পারবো না, শচি। শোন ভাই, আমি বেশী বলতে পারিনে,—কখনও ভাই এমন করে বলিনি, আজ বলচি, আমি তোমায় যথার্থ ভালবাসি। প্রকৃত ভালবাসার চক্ষে প্রেমাস্পদের অপরাধ অতি নগণ্য, তাতে ব্যথা দিতে পারে, কিন্তু ঘৃণা আনতে পারে না। তুমি পাগল, তাই ও সব কথা বলচো। কা[illegible]মি ঘৃণা করবো? তোমায়? অসম্ভব! আমি ত তোমার মহত্ত্বকে ভালবাসিনি,

আশৈশব তোমাকে ভালবেসেছি। তোমার দেহ, মন, আত্মা, ভাল মন্দ সবটাকে জড়িয়ে যে তুমি, সেই তুমিই আমার বন্ধু! তোমার মধ্যে যদি কিছু মহিমা থাকে, সেও তোমার অংশ, আর যদি কিছু ক্ষুদ্রতা থাকে তাও তোমা ছাড়া নয়। ঈশ্বর আমাদের সব চেয়ে বড় বন্ধু, তিনি ত আমাদের শত ভ্রান্তির জন্য আমাদের ঘৃণা করে ছেড়ে যান না। না, কিছু বলো না,—আমার উপর কোন অবিচার ক'রে থাক—সে চুকে গেছে। তার আমি কোন কৈফিয়ৎ চাইনে।” মণীশ থামিল। তাহার অন্তরের গোপন সমাচর হৃদয়ভারের বিপুল বিভবে পরিপূর্ণ হইয়া মধুর মূর্চ্ছনার মত তাহার বন্ধুর বিহ্বল মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দুইজনের কেহই কয় মুহূর্ত্ত ধরিয়া একটি কথাও কহিতে পারিল না। মণীশ সুখতন্ময়ভাবে কেলব চাহিয়া রহিল, আর শচীকান্ত:মর্ম্মের ভিতর মরিয়া গেল।

ঠাণ্ডা বাতাসে জলসেক-আর্দ্র মাটির গন্ধের সহিত মণীশের স্বহস্ত-রোপিত 'হাস্‌নাহানার' সুবাস বহন করিয়া গৃহ অতিথিকে অর্ঘ্য-রূপে আনিয়া দিল। ক্ষণস্থায়ী চন্দ্রাংশটুকু মসীবর্ণ আকাশের বিশাল উদর-গহ্বরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। স্বপ্নোত্থিতবৎ সচকিত শচীকান্ত মাথা তুলিয়া মণীশের মুখের দিকে চাহিল। ত্বরিত ব্যগ্র কণ্ঠে সে কহিল,—“কিন্তু তুমি আমার পাপের কথা শুনলে ভাল করতে! এখনও উপায়—”

মণীশ কথাটা শেষ হইতে দিল না, বাধা দিয়া কহিল,—“তুমি বাড়াবাড়ি করলে! ঐ কথা ভিন্ন আর কোন কথাই কইবে না! দাঁড়াও। আমি খুড়িমাকে ডেকে আনচি। আজ তোমায়

এখানে খেয়ে যেতে হবে, পুকুরের মাছ ধরা হয়েছে!” মণীশ দ্রুতপদে পাশের একটা দরজা খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বন্ধুকে সে আবার নিজের কাছে ফিরিয়া পাইয়াছে আর ত তাহার একটুও ক্ষোভ নাই! মিথ্যা এই ক্লেশকর প্রসঙ্গ চলিতে দিয়া প্রেমাস্পদকে সে পীড়ানুভব করিতে দিবে কেন? ছাত্রাবাস-প্রত্যাগত আত্মীয়-মিলিত স্কুলের ছাত্রের মতই তাহার বাল-সরল চিত্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল।

ফিরিয়া সে বন্ধুকে দেখিতে পাইল না, ভাবিল, বাহিরে গিয়াছে! কিন্তু না, কই বাহিরেও ত কেহ নাই! অদূরে কামিনী গাছের শাখা-পত্র বায়ু-ভরে স্বনস্বনিয়া উঠিল। সে ভাবিল, হয়ত সে তাহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য উহারই মধ্যে লুকাইয়া আছে। নিকটে গিয়া ডাকিল,—“হয়েচে হে, হয়েছে। অন্ধকারে এখানে কেন?” কই, কাহার প্রতি এ আহ্বান! কেহ যে কোথাও নাই। বিস্ময় বেদনায় বিমূঢ় মণীশ তখনও সেই নৈশ অন্ধকারের তলে প্রতীক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতি ক্ষণে পত্র-মর্ম্মরে, বায়ুর শব্দে সে সচকিত উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। বুঝি কোন গোপন স্থল হইতে বন্ধু তাহার বাহির হইয়া আসিয়া এখনই কৌতুক হাস্যে তাহাকে চমকিত করিয়া তুলিবে!

আততায়ী যেমন অন্ধকারে নিজের শিকারের বুকে ছুরি মারিয়া আতঙ্ক-স্পন্দিত পদে ঘরে ফিরে, তেমনি করিয়া শচীকান্ত নির্জ্জন পথ অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পল্লীগ্রামে অনেক ঘরের দ্বার সন্ধ্যাতেই রুদ্ধ হইয়া যায়। সেই

সব রুদ্ধ-দ্বার অন্ধকার-গৃহের কোন একটার মধ্য হইতে কচি ছেলের কান্নার শব্দের সহিত "আয়রে যাদু আয়" ইত্যাদি ছেলে-ভুলানি ছড়া শুনা যাইতেছিল। কোথাও পাঠশালায় দুই এককে দুই; দুই দ্বিগুণে চার প্রভৃতি নামতা পাঠের বিপুল কলরব শ্রুত হইতেছে, কোন স্থান হইতে বা আবার মহা কোলাহলে কোন্দলের তীক্ষ্ণ শর বর্ষিত হইতেছে।

চলন্ত দুইখানা ট্রেণে যেমন সংঘর্ষ হইয়া পড়ে, তেমনই অনেক সময় রাস্তায় চলিতে চলিতে মানুষে মানুষেও সংঘর্ষ বাধে। উভয় স্থলেই উভয়ের পরিচালক এ দোষের জন্য দায়ী। মন যখন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়, মর্ত্ত্যলোকের কথা তখন মনেও থাকে না। বিশেষ দুইখানা আত্মবিস্মৃত পরস্পর বিপরীত মুখগামী গাড়ির চালক যদি একই পথে বাহির হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। প্রবল বেগে শচীকান্ত এইরূপ-অন্যমনা অপর একজন পথিকের উপর পতিত হইয়া ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় কহিয়া উঠিল,—"কে রে! কাণা না কি।"

দোষী দুইজনেই সমান। অপর ব্যক্তিও এই গালি ফিরাইয়া দিতে পারিত; কিন্তু সে তাহা করিল না; আপনাকে পতন-বেগ হইতে কোনমতে বাঁচাইয়া সস্মিতভাবে উত্তর করিল,—"কাণা হবার সময় হয়ে এলো বটে। কিন্তু বাপু, তুমি ত বৃদ্ধ নও ব'লেই মনে হচ্চে। যা হোক, তোমায় লাগেনি ত?"

"কে শিবুকাকা, না?"

"শচীকান্ত কি?"

"আজ্ঞে হাঁ। মাপ কর্ব্বেন কাকা, আমি আপনাকে চিন্‌তে

পারি নি। আপনি এত অন্ধকারে কেন বেড়ান? যদি বেশি ধাক্কাটা লাগত!"

শিবনারায়ণ কহিলেন—"না হে, মনটা বড়ই উৎকণ্ঠিত রয়েছে কি না! যা হোক, ভাল আছ ত?"

"হ্যাঁ ভালই, মন ভাল নেই, কেন ব'ল্‌লেন?"

"নানান্ ঝঞ্ঝাট সংসারে। বলো কেন? ইচ্ছা করে, ছেলেদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথের পাদপদ্মে তোমার বাবার চরণ-তলে আশ্রয় নি। তা আমাদের ওখানে গিয়েছিলে? মণীশের সঙ্গে দেখা হ'ল? কেমন দেখ্‌লে তাকে?" শচীকান্ত মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"ভালই ত দেখ্‌লুম। এ কথা ব'ল্‌চেন কেন?"

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন না। তিনি যেন কি ভাবিতে ছিলেন। শচী একটু প্রতীক্ষা করিয়া পরে ঈষৎ ব্যগ্র-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমায় কিছু ব'ল্‌বেন কি?"

"তোমায়! কই না। কেন বল দেখি?"

"কে জানে, মনে হল যেন কি ব'ল্‌বেন! কিছু ব'ল্‌বার দরকার নেই ত? আচ্ছা, তা হ'লে প্রণাম। বড় শীত। আসি তা হলে।"

শচীকান্ত সবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ বিস্মিত-দৃষ্টিতে তরল অন্ধকারে ত্বরিতে-অদৃশ্য সেই নিশাচরবৎ অকস্মাৎ-দৃষ্ট অদৃশ্য মূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বিষণ্ণ-চিত্তে মস্তক আন্দোলন করিয়া আত্মগতভাবে কহিলেন,—"মদ ধরেচে না কি? কি পরিতাপ! দেবতার সন্তান ভূত হ'ল!"

৪৩

লাটিমটা যতক্ষণ ঘুরিতে থাকে, ততক্ষণ তাহার উভয় দিকের লাল, কালো রং দুইটাও তাহার সেই ঘূর্ণন-বেগের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে একাকার হইয়া যায়। শচীকান্তর চপল চিত্ত-বৃত্তির মধ্যেও সেইরূপ লাল, কালো অংশ দুইটার সম-আবর্ত্তন চলিতেছিল। রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া সে কাগজ কলম লইয়া মণীশকে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিল। আর একখানা সংক্ষিপ্ত পত্রে একই ধরণের কথা লিখিয়া লেফাফার উপর শিরোনামা দিল,—"পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু।"

ইহার পর সে একটু স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। প্রত্যূষে ভক্তিনাথ প্রাতঃস্নানার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন; দেখিলেন, ভাই ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া যাইতেছে; ডাকিলেন,—"শচি, যাচ্চো কোথায়?"

"আপনি উঠেচেন! তাহ'লে দিদিকে ব'ল্‌বেন, চল্লুম।" ফিরিয়া আসিয়া ভাইকে সে প্রণাম করিল। ভক্তিনাথ কহিলেন,—"সে কি! এখন কোথা যাবে? দুদিন থাকো। বেলা হোক, খাওয়া-দাওয়া কর। যেতে হয়, না হয় তখন যেও। এমন ক'রে কি যায়!"

অপরাধের কালিমা শচীকান্তর ললাট অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। তাই সে ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"কুটুম ত নই, সকাল সকাল যাওয়াই ভাল!"

ভক্তিনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"কুটুমের যে বাড়া হয়েচ শচি! একখানা চিঠি লিখেও ত খোঁজ নাও না! আসার পাট ত উঠিয়েই দিয়েচ,—এলে যদি, তাও একটা দিন বই নয়।"

শচীকান্তর মন একেই অস্থির। সে ভ্রাতার আমন্ত্রণে ঈষৎ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল ; বিরক্তি দমন করিয়া উত্তর করিল,—"এসে কেবল মন খারাপ করা। নিজে আস্‌তে বলেন, কিন্তু বাড়ীর গিন্নি ত দেখি ঠুক ঠাক কথা শোনাতেই জানেন—"

"সে দোষ কি আমার ভাই? একজন পরের মেয়ে যদি আমাদের না মানে, তার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত তুমি আমায় দিয়ে করাবে? তুমি আমার সেই স্নেহের শচী,—আমি ত কোন অপরাধ করিনি!"

দাদার বেদনার স্বরে শচী নিজেও ব্যথিত হইল ; এবং নিজের উষ্ণতায় লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু দাদা তাহার অবস্থা না জানিয়া এ সময় অনর্থক সামান্য খুঁটি-নাটি লইয়া মান অভিমান করিতে বসিলেন। ইহা ভাবিয়া সে অধিক উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া বিরক্তির হাসি হাসিল ; বলিল,—"আমিই বা ক'রেচি কি? সুবিধা হ'লেই আস্‌চি, কখনও আপনাকে অমান্য করিনি, আর কি ক'র্‌বো, বলুন।"

ভক্তিনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। বলিবার মত সত্যই এমন কিছু ছিল না, কেবল মনের একটুখানি ক্ষোভ মাত্র। যাহাকে জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে জীবনের মধ্যে একটা স্নেহাধিকার দিয়া আসিয়াছেন, সে যদি সেটাকে তুচ্ছ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহাতে মনে স্বভাবতঃই ক্লেশ হয়! ইহা ত আইনের দাবী নয়, এ যে বুকের টান! কিন্তু মনে এ ভাবের প্রশ্রয় না দিয়া কহিলেন,—"তবে এখনই আস্‌চো? মাসিমাকে আমার প্রণাম দিও। কল্যাণী সেখানে আছে, বুঝি? আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি, তাকে ব'লো—"

দাদাকে সুর ফিরাইতে দেখিয়া সেও একটু লজ্জা অনুভব করিল। দাদা আজন্মই এইরূপে নিজেকে সংযত করিতে অভ্যস্ত, —ইহা তাহার মনে পড়িল।

মৃদু স্বরে সে কহিল,—"আসি তবে দাদা। আবার শীঘ্র একদিন আস্‌বো না হয়। বলেন ত কিছুদিন থাকা যাবে তখন,—এখন একটু কাজ আছে। বাবার চিঠি পেয়েছেন?"

চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এই প্রথম পিতার সংবাদ লইবার কথা মনে পড়িল! "পেয়েছি, ভাল আছেন। এসো তা হ'লে সুবিধা হ'লেই। দূরে থাক, মন তোমার কাছেই সর্ব্বদা প'ড়ে আছে। গিয়ে একখানা পত্র দিও।"

"দেবো" বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই শচীকান্ত ভ্রাতার দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল। সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া নেত্র ফিরাইয়া ভক্তিনাথ আবার একটা মৃদু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শিশু ভ্রাতার সৌম্য সুকুমার মূর্ত্তি, জ্যেষ্ঠের প্রতি অসহায় আত্ম-সমর্পণ মনে পড়িল। মানুষ কত বদলাইয়া যায়! তাঁহার মনের স্নেহ-নির্ঝর আজও তেমনি ঝরিতেছে; কিন্তু সে ক্ষীরধারা স্পর্শ করিতে শচীকান্ত আর ইচ্ছুক নহে। নাই হোক, সে ভাল থাকুক,—সুখে থাকুক—ভাইয়ের জন্য ভাই আর কি করিতে পারে?

৪৪

মধ্যাহ্নে দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া করালীচরণ তাহার সমান দরের একটি বন্ধু লইয়া ব'ড়ে টিপিতে ছিল, এমন সময় বেড়ার পাশ হইতে একখানি সুন্দর তরুণ মুখ সেখানে দৃষ্টি প্রেরণ করিল।

কলাঝাড়ে কদলীপুষ্প দোদুল্যমান, বেড়ার ধারে পালম শীষগুলা বাতাসে মাথা দুলাইতেছে, মাচা-ভরা লাউশাকের মধ্যে মধ্যে সাদা ফুলের বাহার খুলিয়া দিয়া ছোট ছোট লাউ ধরিয়াছিল। আর খানকয়েক উচ্ছিষ্ট বাসন-কোসন লইয়া কমলা সেই ফসল ক্ষেতের মধ্য দিয়া ঘাটের পানে চলিয়াছে। শচীকান্ত তাহা দেখিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

পল্লীগ্রামে গৃহস্থ-গৃহে লক্ষ্মীপূজা হয়, সে দেখিয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজায় তাহার মা "তিল-সোণার" কথা বলিতেন; ছোট বেলায় সে তাহা অনেকবার শুনিয়াছে। সে কাহিনীর মধ্যে তিলফুল তোলার প্রায়শ্চিত্ত-হেতু বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণীকে দরিদ্র-ব্রাহ্মণ গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। সেই গল্পটা আজ অকস্মাৎ সার্থকভাবে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। কি পাপে এই লক্ষ্মীস্বরূপা কমলাকে এ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে? তবুও মূর্খ লোকে বলে, ঈশ্বর আছে!

অদূরে পুষ্করিণীর ভগ্ন সোপান বহিয়া নীচে নামিয়া জলের মধ্যে কিশোরী বাসন নামাইল। হাত ধুইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তারপর,—কোথায় গেল সে? শচীকান্ত তাহার উৎসুক দৃষ্টি বিস্তারিত করিয়াও তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। জলে অবগাহন করিয়া থাকিবে ভাবিয়া সেখান হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইল। মধুর স্বপ্ন-উপভোগান্তে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনে যেমন একটা বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়; তেমনই একটা প্রসন্নতার আনন্দ লইয়া সে করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে অগ্রসর হইল। মধ্যকার মানসিক সংগ্রাম সেই মুহূর্তে যেন যায় যায়

তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। রাত্রে যে পত্র দুইখানা লিখিয়া সে পকেটে রাখিয়া দিয়াছে, সে দুইখানা আর কখনও যে ডাক-বাক্সের মুখোও হইবে, এমন ভরসা আর তাহাদের রহিল না। করালীচরণ বড়ের চাল ভুলিয়া সাহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—"আসুন, আসুন। ক'াল থেকে কেবল আপনার কথাই ভেবেচি। ওহে নৃসিংহ! এখন তা হ'লে তুমি এসো গিয়ে, খেলাটা এখন ত আর হ'লো না,—রাত্তিরে তখন তোমার ওখানে গিয়ে শোধ দেওয়া যাবে। তার পর শচীকান্ত বাবু, কি মনে করে?" আবার সেই মনের উপর আক্রমণ! শচীকান্তর আললাট-কণ্ঠ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল,—"বিশেষ কিছু নয়। দেখা হ'য়েছিল, তাই একবার—"

"বটে, বটে! আমার এমন সৌভাগ্য! বসুন, বসুন। কম্‌লি কোথা গেল? পান এনে দিক্ না,—"

অকস্মাৎ সঙ্কুচিত শ্রোতা এমন ভাবে চমকিয়া উঠিল, যেন সে গুপ্ত ঘাতকের ছুরির আঘাত পাইয়াছে! আকস্মিক ক্রোধের উচ্ছ্বাসে তাহার সমুদয় মুখখানা অরুণাচলের মত রক্তিম হইয়া উঠিল। সে দুই পা পিছাইয়া তীব্র স্বরে কহিয়া উঠিল,—"ছিঃ—"

করালীচরণ এ আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। বিস্ময়ে সে তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু টানিয়া ডাগর করিল; কহিল,—"রাগ ক'র্‌লেন কেন? কিছু অলেহ্য ব'লেচি? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমরা। ও সব ধর্ত্তব্য ক'রবেন না। আপনারা ইয়ংম্যান, ইংরিজি শেখা, আমরা হলুম সেকেলে,—বেফাঁস বলা রোগ আমাদের। তা যা হোক, শচীবাবু, যখন দয়া ক'রে পায় ধুলো

দেছেন, তখন এ গরীবের একটি উপকার করুন। আমি ছা-পোষা গরীব, কোথা থেকে এর উপর বাইরের লোক পুষি, বলুন দেখি? শিবনারাণ বাবু যখন কমলাকে নিতে চান না, তখন কাঁহাতক আমি আর তাঁদের পায়ে তেল দিতে থাকবো? একটি যোগ্য পাত্র খুঁজে দিন, মেয়েও ত বড়-সড় হয়েচে, আর কি আইবুড় রাখা ভাল দেখায়? দু-হাত এক ক'রে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

কোথায় বিরক্তি, কোথায় ক্রোধ! হৃৎপিণ্ড হইতে নির্গত শোণিত পুনরায় নিজ স্থলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আছাড়ি-পিছাড়ি করিতে লাগিল। বহুক্ষণ সে নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, —"সেটা কি উচিত!"

"কেন নয়, মশায়? ষোল-সতের বছরের মেয়ে! তাঁরা জানেন না মাথায় কি ভার! চিঠির উত্তরটাও দেওয়া দরকার বোধ ক'র্‌লেন না ত! সে দিন ত পষ্টই ব'লেচেন—"

অতি কষ্টে শচীকান্ত রুদ্ধপ্রায়-কণ্ঠে উচ্চারণ করিল,—"কি?"

"কেন, ব'লেছেন, তোমার ভাগ্নীকে তুমি নে যাও, আমরা চাই নে।"

শচী ললাটের ঘর্ম মুছিল; নিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, —রাগ ক'রেই ব'লেছেন ত, সেটা—?"

"রাগ! কিসের রাগ? টাকা খসাতে হ'লে অনেক মশায়েরই রাগ হয়.—সেটা জানা আছে। কেন নেব না? দুশো বার নেবো। তোমরা কুলীনরা চোখের চামড়া খসিয়ে বেটার বিয়ের রকঁড়ি টাকা নিতে পারো, গরীবের ঘর বাড়ী

বেচে নাও,—মুনিবের ক্যাস ভাঙ্গিয়ে কনের বাপকে জেল খাটাও, তাতে কিছু দোষ হয় না! দোষ হ'লো গরীব আমাদের বেলায়? উপদেশে ম'ছ মরে না. জলে নামতে হয়। নিজেরা আগে পথ দেখাতে, তবে বুঝ্‌তুম যে, হ্যাঁ। আমি যেখানে তিন হাজার টাকা পাবো, সেইখানেই মেয়ে দেবো। কেন দেবো না? তোমরা বড় মানুষেরা ছান্‌লাতলা থেকে টাকার জন্য বর ফিরোও না?"

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শচীকান্তর চঞ্চল হৃৎপিণ্ড পুনরায় নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। মনে একটা অহেতুক ক্রোধের সঞ্চার হইতেছিল। কিন্তু কাহার প্রতি সে ক্রোধ, তাহার ঠিকানা ছিল না। সে ঈষৎ ঝাঁঝিয়া কহিল,—"তবে তুমি কি ক'রতে চাও?"

করালী তাহার মুখ-চক্ষুর শোচনীয় ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে মনে মনে হাসিল, প্রকাশ্যে বিনীতস্বরে উত্তর দিল,—"যে ও মেয়ের দর বোঝে, তেমন লোকের হাতে তাকে দিতে চাই। বংশজের ঘরে কেউ পায়ে ধ'রে মেয়ে দেয় নি, আমিও দেবো না। তায় অমন পরীর মত মেয়ে।"

"তা হ'লে—তা হ'লে এই মতই স্থির?"

"অবিশ্যি।"

"কিন্তু - কিন্তু—এটা কি ভাল হবে?"

"কেন মশায়? মেয়ের অভিভাবক আমি, আমার যাকে খুসী মেয়ে দেবো! ভাল মন্দ এতে কি পেলেন, শুনি?"

আবার শচীকান্তর বুকের মধ্যে তুমুল তরঙ্গ উঠিল! মন-তরী টলমল করি[illegible] বুঝি এবার অতলে ভাসিয়া যায়! সে কি একটা

বলিতে গেল। বক্তব্যটা কণ্ঠের মধ্যেই অস্ফুট হইয়া রহিল। বিবেক এবার পরাজিত-প্রায়। স্বেচ্ছায় সে স্বার্থকে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। মন বলিতেছিল, তবে আর তুমি কি করিবে? তোমার ইহাতে হাত কি? তুমিশুদ্ধ কেন বঞ্চিত হও! বিবেক সায় দিয়া বলিল,—"না, পাপ কি! তোমার আর ইহাতে দোষ কি?"

করালীচরণ দাওয়ার এক পার্শ্বে চকমকির নিকট সজ্জিত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ পরে একটা ডিবা-ভরা পান লইয়া বাহিরে আসিল। স্তব্ধ শচীকান্তর কাছে আসিয়া উপহার বস্তু হস্তে স্থাপনান্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"দোক্তা টোক্তা চলে?" সে নীরবে ঘাড় নাড়িল। ডিবাটা তাহার হাতের মধ্যেই রহিয়া গেল। তাম্বুল মুখে উঠিল না। "তামাকটাও চলে না? বেশ, বেশ, কতদূর অবধি পড়া-শোনা হয়েচে? পাশ কটা?" করালী এবার তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে অপ্রকৃতিস্থমতি অতিথির পাশে বসিয়া বিজ্ঞ কন্যাকর্ত্তার সুরে তাহার পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

শচীকান্তর এসব ভাল লাগিতেছিল না। সে নিজের ভাবনাতেই অস্থির, তাপিত; বাহ্যিক ভদ্রতার খাতিরে কোনমতে জবাব দিয়া গেল,—"এম্ এ।"

"অ্যাঁ, চার চারটে পাশ! আমাদের কমলীর তপস্যা ভাল ছিল।"

শচীকান্তর নিশ্চল হৃৎপিণ্ড প্রতিঘাতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। চোখ মুখ লাল করিয়া একটা রক্তের উচ্ছ্বাস মাথার মধ্যে ছুটিয়া গেল। চমকিয়া সে কহিল,—"সে কি!"

করালী শান্তভাবে ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল,—"এই কথাটা কথার কথা বল্‌ছিলাম। বিবাহ হয়েছে ?"

"না" বলিয়া ডিবাটা নামাইয়া রাখিয়া শচী উঠিবার চেষ্টা করিল ; যেন এখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া এই মায়াবীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চায় ! কিন্তু সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই আবার – ও কি দৃশ্য !

সজল চরণচিহ্নগুলি ধূলায় অঙ্কিত করিয়া আর্দ্র বসনে ভারাবনত দেহে কে ঐ ঘাটের পথ হইতে ফিরিতেছে। সে প্রভাতের হাস্যময়ী প্রতিমা নহে, সংসারের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত সকরুণ-মূর্ত্তি নারী ! শচীকান্ত তাহার দৃষ্টি বাঁচাইবার চেষ্টায় একটু সরিয়া বসিল,— নিজেকে স্থির করিয়া লইবার জন্য একটু চুপ করিয়া রহিল। তারপর ললাটের স্বেদজড়িত কেশগুচ্ছ ধীরে ধীরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার সেই দিকে চাহিল। অতি নিকট দিয়া কোনদিকে না চাহিয়া কমলা ধীর পদে খিড়কির দিকে চলিয়া গেল। তাহার বিষণ্ণ নত নেত্রের আভাষ দ্রষ্টার সকল দ্বিধা ঘুচাইয়া দিয়া গেল। সে অভিভাবকের দিকে অসঙ্কোচে চাহিয়া কহিল,—"ওখানের সঙ্গে আপনি তাহ'লে মেটাতে চান না ?"

"না।"

"তাহ'লে যদি আর কেউ কমলার পাণি প্রার্থনা করে ত—"

"যদি কেউ তিন হাজার টাকা দেয়, তাহ'লে তারই সঙ্গে বিয়ে দি—"

একটা ঘৃণাপূর্ণ ক্রোধ-কটাক্ষ পাত করিয়া সে কহিল,—"হাঁ, হাঁ, [illegible] টাকা দিলেই—আপত্তি নেই কিছু ?"

"কিছু না। তবে টাকাটা আগাম চাই, বুঝ্‌লেন?"

"আচ্ছা, তাই হবে!"

বক্তার মন বুঝিয়া করালীচরণ আবার মনে মনে হাসিল। টাকা খসাইতে হইলেই বাবুরা বড় চটেন। প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া সজোরে সে হুঁকার নলে টান দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অতিথির পানে ফিরিয়া, না বুঝিবার ভাণে সে বলিল,—"বরটি কে?" লোকটার অল্পবুদ্ধির প্রতি চটিয়া শচীকান্ত নীরবে অধর দংশন করিল; তাহার মনের মধ্যে আবার দেবাসুরের যুদ্ধ সুরু হইয়াছিল।

৪৫

"বলি, আজ যে বড় খুসী খুসী! বেলা ত রেখে এসোনি যে দুটো কথা বার্ত্তা কইব। সত্যি কমল, তোকে শুধু ঐ হাসিটুকুতেই আজ এত সুন্দর দেখিয়েছে যে আমারই মনে হচ্ছে, নিজেকে ঐ হাসির মূলে বিকিয়ে দি।"

কমলার নূতন বন্ধু সরোজিনী প্রীতিপূর্ণ-নেত্রে তাহার সরমরঞ্জিত মুখের পানে চাহিয়া এই কথা বলিল। অপরাহ্নে তখন সায়াহ্নের ছায়াপাত হইয়াছিল। ম্লান আলোকে সলিলমধ্য-বর্ত্তিনী কমলাকে জলদেবীর মতই অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। তাহার স্থির দৃষ্টি আজ ক্ষণচঞ্চল। একটা সলজ্জ রক্তিম আভা তড়িদ্‌বেগে শুভ্র ললাটে, গোলাপি গণ্ডে মিলাইয়া যাইতেছে। সে মৃদু হাসিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টি নত করিল,—গামছা দিয়া রন্ধনের কালী রগড়াইয়া তুলিতে তুলিতে কহিল,—"কি যে বল!"

"না লো, সত্যি। আমি ঠাট্টা ক'র্‌চিনে।...কি যে নাম, তাও ত কিছু বল্লিনি? তবে তোর বরই বলি। তিনি যদি এখানে থাক্‌তেন, এখনই পাগল হয়ে রাঙ্গা পায়ে লুটিয়ে পড়্‌তেন। আচ্ছা ভাই, ফাগুন মাস ত যায়,—বিয়ের কি হ'লো? তাঁরা কিছু বলেন নি?"

কমলার রঞ্জিত মুখ সুখের স্মৃতিতে উজ্জ্বল দেখাইল। আনত মুখখানি অধিক নত করিয়া সে উত্তর দিল,—"হ্যাঁ ভাই, লিখেছেন।"

"কি? কবে বিয়ের ঠিক হয়েচে?"

"পরশু!"

"পরশু!"

"হ্যাঁ ভাই।" সরোজিনী বিস্ময়ে—আনন্দে চমকিত হইয়া কহিল,—"তাই এত আহ্লাদ,—বটে! বেশ হ'ল ভাই! যত শীঘ্র এ যমপুরী ত্যাগ ক'র্‌তে পারিস্‌, ততই মঙ্গল। আমার দুদিন ফাঁকা ঠেক্‌বে—ব'য়ে গেল, তুই ত বর্ত্তাবি। কাল তাহ'লে গায়ে হলুদ? কোন সাড়াটিও ত নেই! ঢের ঢের কিপ্‌টে দেখেচি বাবা, এমন হাড়-কেপ্পণ আমার চোদ্দ পুরুষও দেখেনি। তা যাই হোক, কমল, তোর বর দেখ্‌তে, ভাই, যাবই; গলাধাক্কা দিলেও সেদিন নড়্‌চিনে। ভয় নেই,—পাত পেতে ব'স্‌চিনে,—সেদিন একাদশী,—ও পাট সারাই আছে। তোর খুব আহ্লাদ হ'চ্চে, না? মরি, লজ্জায় যে একেবারে গেলেন! বুড় ধাড়ি কনের আবার অত কেন লা! আহা, আহ্লাদ আর হবে না, বোন! কি সুখেই এখানে আছ! ঠাকুর মুখ তুলে চান,—সুখে থাকো। ... কমল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ী যাওয়া

যাক্। শীতে হিমে অসুখ কর্‌লেই মুস্কিল। নিজের বিয়ে ত তোমায় নিজেকেই দিতে হবে। যেমন কালনেমী মামা জুটেচে!”

কলসী ভরিয়া দুই সখীতে জল ছাড়িয়া তীরে উঠিল। আর্দ্র বসন ত্যাগ করিয়া তাহা নিঙ্‌ড়াইয়া উভয়েই নীরবে গৃহাভিমুখী হইল। দুইজনেই নিজ নিজ চিন্তায় তন্ময় ছিল। সখীর বিবাহের কথায় সরোজিনীর নিজের বিবাহের সমস্ত কথা মনে পড়িতেছিল। গাত্র-হরিদ্রা, আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্ন-ভোজন, প্রতিবেশি-গৃহে সাদর নিমন্ত্রণ, সানাইয়ের বাদ্য, শঙ্খ-রাব ও হুলুধ্বনির কোলাহল, কতরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এক অপরিচিত কুণ্ঠিত দৃষ্টির সহিত তাহার তন্দ্রা-বিজড়িত চক্ষের ক্ষণিক মিলন,—এই সকল কথা মনে পড়িতেছিল। সবই যেন সেদিনের কথা! শ্বশুর-বাড়ী যাইবার সময় মায়ের গলা ধরিয়া সে কাঁদিয়া ভ'সাইতেছিল; পাঁচ জনে জোর করিয়া পাল্কীর ভিতর পূরিয়া দিল। কঠিন-চিত্ত বেহারাগুলা তাহার কান্নাকাটি অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ অচেনা পুরীর উদ্দেশ্যে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল। সেই অজানা গৃহে সেদিন তাহার কত আদর! শাশুড়ী কোলে লইয়া “লক্ষ্মী”-রূপে বরণ করিয়াছিলেন, চারিদিকেই স্নেহ মমতার ছড়াছড়ি!

তারপর অল্পে অল্পে নারী-জীবনের সার সুখ সে যখন চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সব চুকিয়া-বুকিয়া গেল। দুই চারি দিন পরে অলক্ষ্মী অপয়া বধূ পিত্রালয়ে পুনঃপ্রেরিত হইল। বৎসরাধিক পূর্ব্বে যে বেহারাগুলার স্কন্ধে সে চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া তাহারাই তাহাকে ফিরাইয়া আনিল! মাঝখান হইতে শুধু সমস্ত জীবন... শ্মশান-বহ্নির

বুকে আহুতি দিয়া আসিল। এখন আর কিছুই নাই। কেবল এই স্মৃতিটুকু বক্ষে লইয়া এক মহা-মিলনের প্রতীক্ষা!

কমলা গৃহকর্ম্মের অবসানে ভাল করিয়া শাড়ীখানা গুছাইয়া পরিল, সুগোল মণিবন্ধে করভূষণ দুইখানির প্রতি একটা প্রীতি-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নববধূর সরম-শঙ্কিত চরণে সে পূর্ব্বের মত বাহিরে গাছের তলায় গিয়া বসিল। নূতন একটা ভাবের আলো নবোন্মেষিত হৃদয়-মুকুলে পতিত হইয়া আজ সারাদিনে তাহাকে পূর্ণবিকশিত শতদলে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। আজ শুধু দয়া-কৃতজ্ঞতার আদান-প্রদান নয়, সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমের বন্যা আজ তাহাদিগকে এক অবিচ্ছিন্ন মিলনে মিলাইতেছে! কমলা আজ অনাথা নয়, হীনচিত্ত আত্মীয়ের সংস্পর্শে হেয় নয়। সে অকুণ্ঠ কৌমার প্রেমের বৈজয়ন্তী মাল্যধারিণী মহামহিমময়ী নারী; একনিষ্ঠ, সংযত-চরিত্র মণীশের হৃদয়-রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী সে।

যত বড় কৃপণই হোক, হাজার হোক মেয়ের বিয়ে,—করালীচরণ উত্যক্ত চিত্তে দুই-চারিটি প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। সত্যকালী বিছানা ছাড়িয়া রোয়াকে আসিয়া বসিয়াছেন। কমলা যে তাঁহার সংসার হইতে চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাঁহার মন মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু কি করিবেন? উপায় নাই। বিমর্ষ মুখে চারি দিকে চোখ ফিরাইয়া আয়োজনের স্বল্পতা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার মৃদুস্বরে বলিলেন,—"ঐটুকু ঘিয়ে অত ময়দা ত ভাজা যাবে না, আরও সের পাঁচেক লাগবে যে।"

"আরও পাঁচ[illegible]মুক দিয়ে ঘি খাওয়া হবে না কি? ঐ চের [illegible]

সত্যকালী কহিলেন,—"মিষ্টিতেও কুলোবে না। মোট ত এক রকম, ঐ গোল্লা সন্দেশ, তাও—"

করালীচরণ মুখ খিঁচাইয়া ধমক দিয়া উঠিল,—"থাম্, থাম্, আর সরফরাজি কর্‌তে হবে না। যার কুলুবে সে খাবে, না হয়, না খাবে। তুই কি আমায় ডুবোতে চাস্ না কি?"

সন্ধ্যার সময় সরোজিনী আসিয়া স্পন্দিত-বক্ষ কমলাকে নির্জ্জন কোণ হইতে বাহির করিল। সে লজ্জায় তাহার গলা ধরিয়া বুকে মুখ গুঁজিয়া বলিল,—"সরোজ, যেখানে থাকি, তোকে কখনও ভুল্‌ব না।"

আসন্ন বিরহ-শঙ্কা-ব্যথিত সরোজিনী তাহার রক্তিম গণ্ডে অঙ্গুলির মৃদু আঘাত করিয়া সজল নেত্রে হাসিয়া কহিল, "দেখা যাবে, ভাই। ওমা, চুলটা এখনও বাঁধা হয়নি যে! বোস্।"

সুচারু ছাঁদে কবরী রচনা করিয়া অনেক কষ্টে সরোজিনী চন্দন আল্‌তা সংগ্রহান্তে কনে সাজাইল। খাটো রাঙ্গা চেলিখানা সে অঙ্গের পরিপূর্ণ লাবণ্য একবিন্দুও হতশ্রী করিতে পারিল না। গহনা নাই শুনিয়া একবার সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিল; পরে চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে প্রভাত-গগনে উষার প্রথম রক্তিম ছটার মতই নব-জীবনের প্রথম মঙ্গল সূচনা স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র সিন্দূর-বিন্দু অঙ্কিত করিয়া দুই হাতে সেই মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধনেত্রে তাহা দেখিতে দেখিতে বলিল,—"তা কিছুই না থাকুক, এম্‌নিতেই এ রূপ ভুবন ভোলাতে পারে।"

সুস্নিগ্ধ কালো চোখ দুইটি এবার পূর্ণ-প্র[illegible] মুখে

স্থাপন করিয়া সে নিজের মুখখানা তাহার হস্তমধ্য হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সবেগে কহিল,—"যাও।"

কিন্তু স্তুতির বাণী কয়টা বোধ হয় বড়ই মনের মত হইয়াছিল। কস্তুরী মৃগ যেমন নিজের গন্ধে নিজেই মোহিত হয়, আজ তাহার মনটাও তেমনি এ খবরটুকুতে মাতিয়া উঠিল।

লগ্ন মাথায় করিয়া বর আসিল। বরযাত্রী জনকয়েক মাত্র। বরকর্ত্তা লম্বোদর-তুল্য দেহ গরদ-উত্তরীয়ে আচ্ছাদন করিয়া, অপ্রসন্ন দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। বরের পার্শ্বে মোটা চেনপরা মিৎবর মৃদু স্বরে রহস্য-বাণী বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু এ কি বর! নেপথ্যস্থিতা সরোজিনী নিস্পন্দ-নেত্রে বরের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর ভূমিকা লইয়া শিক্ষিত নট যেন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছে! এই কমলার বর! অতি সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি,—কিন্তু ভস্মের ন্যায় বিবর্ণ,—প্রাণহীনের মতই নিস্পন্দ! কে যেন শ্মশান-যাত্রার পরিবর্ত্তে তাহাকে বিবাহ বেশে সাজাইয়া আনিয়াছে!

৪৬

গিরিজাসুন্দরী অবাক্ হইয়াছেন। কালধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ টি:কে না, এই কথা ভাবিয়া তিনি এখনকার কালের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে অনেকখানি উদার নীতি অবলম্বন করিয়াই চলিয়া থাকেন। শচীকান্তর অনেক অসঙ্গত চাল-চলন যাহা তাহার পিতৃগৃহেও অনেকে সমালোচনার চক্ষে দেখিত, সে সকল তিনি তাচ্ছল্য করিয়া উড়াইয়া দি[illegible]; অপর কেহ কিছু বলিলে বরং সেটা চাপা দিবার

ইচ্ছায় হাসিয়া কহিতেন,—"চিরকাল কি সমান যায়রে বাপু! কালের ধর্ম্ম একটা নেই?"

কিন্তু সেই স্নেহময়ী মাসিমাও এবার তাঁহার উদার নীতিকে তেমন করিয়া যেন প্রশ্রয় দিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার জন্মের সাধে ছাই ঢালিয়া বাসন্তীকে ত শচী প্রত্যাখ্যান করিলই—করুক! ইহার সঙ্গত কারণও সে প্রথমটা দেখাইয়াছিল। কিন্তু মাঝখানে শুনা গেল, সে মেয়ের আজ তিন চারি বৎসর ধরিয়া কোন খোঁজ-খবর নাই। তারপর সে যখন আসিয়া সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যার পুনঃপ্রাপ্তির সংবাদ জানাইয়া বলিল, আগমী পরশ্ব বিবাহের দিন আছে; সেই শুভ লগ্নেই সে বিবাহ করিতে চাহে, তখন সত্যই তাঁহাকে সে বিস্মিত, এবং সেই সঙ্গে আহতও করিল। হউক কলিকাল, তাই বলিয়া এতখানি স্বাধীন ভাব শোভা পায় না। গিরিজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"পরশু কেমন ক'রে হবে? তোমার বাপ ভাইকেও কি একবার জানাতে হবে না?" এই কথায় বিয়েপাগলা ছেলের আপাদ মস্তক যেন কম্পিত হইল! মুখ এতটুকু ক'রয়া নত মস্তকে সে ক'হল,—"তাঁরা পূর্ব্বে জানতেন, এখন না-ই ব'ল্‌লে। বিয়ের পর তখন একেবারে লিখো। এ দিনটা ছাড়া হতেই পারে না, মাসিমা, এ মাসে আর একটা দিনও নেই।

"না হয় বোশেখ মাসেই হবে। এত শীগ্‌গির কখন বিয়ে হয় রে, বাপু! খেলাঘরের বিয়ে নাকি? পত্র আছে, গায় হলুদ আছে, সামাজিক ক'র্‌তে হবে, নেমন্তন্ন কুটুম-সজ্জন আনা—বলিস্ কি! এ কি হাড়ি ডোমের ঘর!"

শচীকান্তর মুখখানা একেবারে কালী হইয়া গেল! সে কাতর-স্বরে কহিল,—"পায়ে পড়ি মাসিমা, ও-সব কিছু করো না; কাউকে খবর দিওনা—শুধু—"

ঢের ঢের বেহায়া ছেলেপিলে দেখা যায়, কিন্তু এত-বড় নির্লজ্জ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কখনও দেখে নাই! মাসিমার মনের মধ্যে ক্ষোভ বিরক্তি ও ক্রোধ একসঙ্গে উথলিয়া উঠিল। মুখ রাঙ্গা করিয়া কম্পিত স্বরে তিনি কহিলেন,—"বেশ বাছা, যা বোঝ কর, আমরা বুড়োসুড়ো হয়েছি,—বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে,—ভালমন্দ চিনে উঠ্‌তে পারিনে!"

নিগূঢ় অভিমানে স্তব্ধ থাকিয়া যথাসম্ভব আয়োজনে তিনি মন দিলেন। কাশীতে এবং ভক্তিনাথকে সংবাদ পাঠাইতে শচী বারণ করিয়াছে, তাই রাগ করিয়া তাঁহাদিগকে একটা খবরও তিনি দিলেন না; আপনার মনকে কহিলেন,—ওর যদি না দরকার থাকে, আমারই বা কি! তবে তিনি বাহিরের লোকের কাছে মান হারাইবার ভয়ে হরচন্দ্রকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন,—"পরশুর মধ্যে যাতে সামাজিক বিলি হয়, তার বন্দোবস্ত কর।" বাজনার ফরমায়েস, নিমন্ত্রণের ফর্দ্দও এই সঙ্গে তৈয়ার করিবার আদেশ হইয়া গেল। নায়েব কহিল,—"যে আজ্ঞে! সব হয়ে যাবে; কিন্তু এত শীঘ্র কেন? আগে কনে দেখাই হোক্, তারপর পত্র—"

ক্ষোভের সহিত হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন,—"ওগো, না, না, সে সব ভাবনায় তোমার কাজ নেই। সে যে ভাববার সে-ই ভাবচে। পরশু বে'র [illegible] হওয়া চাই, নৈলে লোকে ব'ল্‌বে কি?"

"আঁা, পরশু বে! দাদাবাবুর বে পরশু! পত্র-টত্র হল না?"

"সে সব হয়ে গেছে, বল্‌লুম যে। এখন যাও, যা বল্‌লুম কর। হরি পোদ্দারকে একবার ডেকে পাঠাও দেখি, যদি বৌভাতনাগাত দু-একখানা কিছু গ'ড়ে দিতে পারে।"

কল্যাণী মায়ের গম্ভীর মুখে তাঁহার বিরক্তির লেখা পাঠ করিলেও এ সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিল না। তাহার ভালবাসাভরা প্রাণটি দাদার সুখের অংশ ভাগ করিয়া লইয়াই বিভোর ছিল। পরশ্ব তারিখটা যদি নেত্রপল্লবকম্পনে অতীত হইয়া যায়, তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই! কমলাকে সে কতক্ষণে দেখিবে, সেই ঔৎসুক্য লইয়াই মনে মনে সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

গায় হলুদের ব্যাপার সংক্ষেপ। বরের ইচ্ছায় কেবল হরিদ্রাটুকু প্রেরিত হইয়াছে। তত্ত্ব-তাবাসের সাধ মনে মারিয়া গৃহিণী গম্ভীর মুখে একটা রূপার বাটীতে করিয়া খানিকটা হলুদ নাপিতের হাতে পাঠাইয়া দিলেন। শচীকান্ত যাত্রাকালে তাহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া গোপনে কি বলিয়া দিল!

বিবাহের বেশ পরিয়া বর কনকাঞ্জলি গ্রহণ করিল। বাহিরে হরচন্দ্র সময়ের অল্পতায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামের প্রান্ত অবধি বাজনার দল। দেশের বালকগণ বরানুগমন করিবে বলিয়া ভিড় করিতেছিল। সিম্পান, পাল্কি, সালুমোড়া চতুর্দ্দোল কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। অভিমান ভুলিয়া গিরিজাসুন্দরী পুত্রের চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে চুম্বন করিয়া ছল-ছল নেত্রে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, —দিদি আজ কোথায়? এমন সময় সে যদি থাকতো! সহসা বর স্খলিত কণ্ঠে ডাকিল,—"মাসিমা!"

মাসিমা মুখ ফিরাইলেন,—"বাবা।"

"আমি বিয়ে ক'র্‌ব না। ওদের সব সরে যেতে বল।"

"কি বলিস্, শচী!"

"সত্যি ব'ল্‌চি, আমি যাব না। না মাসিমা, এখন সব ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না, পরে ব'ল্‌বো,—আমি বিয়ে ক'র্‌বো না—"

সে কলাতলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপর সিঁড়ির দিকে ফিরিল। কি যেন একটা ঘোর সংশয়ে তাহার কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিতেছিল! বেশ বুঝা যাইতেছে, চিত্ত তাহার সুখলেশহীন। গিরিজা অনুতপ্ত হইয়া ভাবিলেন,—তিনি রাগ করিয়া আছেন বুঝিয়া শচী অভিমান করিতেছে! মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"পাগল ছেলে! বলিস্ কি?"

"না মাসিমা, থাক্। আমি যাব না।"

"তুই সময়ে না পৌঁছুলে সেখানে কি কাণ্ডটা হবে, তা ভাব্‌চিস্? রাত্রির মধ্যে যাকে পাবে, তাকে ধ'রেই মেয়ে সম্প্রদান ক'র্‌তে হবে! হয়ত কোন্ থুড়থুড়ে বুড়োর হাতে পড়ে মেয়েটি আজন্ম জলে খুন হবে! বাপরে! এমন শত্রুও হ'তে আছে!"

বর মুহূর্ত্তে সচেতন হইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে ফিরিল!

জমিদার বাড়ীর বিবাহ, তাহাতে গিরিজাসুন্দরীর ঘরে কখনও বধূ-আগমন ঘটে নাই।—পল্লীগ্রামে উৎসবের গন্ধে একেই ফুলবনে মধুমক্ষিকাবৎ পাড়া মাতিয়া উঠে, তাহার উপর এমন একটা সুযোগ! বড় বড় চুলা বানাইয়া অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। সকলের জন্যই এ গৃহের দ্বার অবারিত। গরীব, গৃহস্থ, যে আসিতেছে, গিরিজার নিয়োজিত লোকেরা পাত পাতিয়া পরিতোষ-পূর্ব্বক [illegible] ভোজন করাইতেছে। পরিবেষণের ঘটায়

উঠান দধি-কর্দ্দমে পিচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। "দেরে, আয়রে" শব্দের সহিত জয়জয়কার মিশিয়া সর্ব্বক্ষণই একটা কোলাহল জাগাইয়া রাখিয়াছিল। দাসী, চাকর, প্রজা, পড়সী রঙ্গিন কাপড়ে সাজিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে ত্রুটি করিতেছিল না! গিরিজার গৃহ অন্নদার যজ্ঞশালা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শারীরিক মানসিক সকল চিন্তা ভুলিয়া বর-বধূর কল্যাণার্থ অকাতরে সকলকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, বাঁধিয়া দিয়া, যে যাহাতে সুখী, তাহাই সম্পন্ন করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

রান্নাবাড়ীর একদিকে যশোহর হইতে ভিয়ানকর আসিয়া রাশি রাশি মিঠাই মুড়কি ফেনি বাতাসা প্রস্তুত করিতেছে, পাঁচ সাতজনে তাহা ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া পিতলের হাঁড়ি ভরিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। পল্লীগ্রামের প্রথামত বধূর মুখ দেখিয়া মিষ্টমুখ করিতে প্রতিজনে একটি করিয়া সমিষ্টান্ন হাঁড়ি ঘরে লইয়া যাইবেন। এই দিকেই পাড়ার ছেলেগুলা ও রাজ্যের মাছি ঝাঁক বাঁধিয়া ছ। গৃহিণী কর্ম্মব্যস্তভাবে এদিক ওদিক করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে আদেশ দিতেছিলেন,—"ওরে ছেলেদের হাতে দুটো দুটো মিষ্টি দিস্। ভিয়েন বন্ধ রেখে বামুন ঠাকুরদের একটু জল খেতে দে'না। মতে মাছ এনেছে, ওকে এক সরা মুড়কির ওপর গণ্ডা-দুই মেঠাই দিয়ে বিদায় কর্।"

গ্রামের শেষে ষ্টেশনের নিকট বাজন্‌দারগণ অপেক্ষা করিতেছে। চতুর্দ্দোল, মহাপায়া, পাল্কি, লোক লস্কর সবই সেইখানে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হঠাৎ বাজনা বাজিয়া উঠিল। উৎকীর্ণ পুরবাসী মহারোলে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ বর, ঐ বর আসছে" [illegible] দিকে

একটা হৈ-চৈ সোরগোল পড়িয়া গেল। মলের ঝম্ ঝম্, বাজুর ও খোঁপার গুঁজিকাঠির ঘুঙ্গুরের ঝিন্‌ঝিনানি তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল। শশব্যস্ত বাটীর গৃহিণী হাঁকিলেন,—"পূর্ণকুম্ভ ঠিক আছে ত? দুধের কড়ায় ভাল করে জ্বাল দিতে থাক্। ওরে ও কল্যাণি, ধানের কাঠাটা? ধানের কাঠা বরণ-পিঁড়ির কাছে দেখ্‌চিনে কেন? নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। ন্যাটা মাছটা কোথায় রেখেছিস রে?" মহাশব্দে যুগল শঙ্খ দেবদত্ত ও পাঞ্চজন্য একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। লাজবর্ষিত গন্ধহীন পদ্ম, ও জীবন-শূন্য ভ্রমর-অঙ্কিত পথের দুইপার্শ্বে নারীবাহিনী উন্মুখ হইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। ছেলেরা অসহিষ্ণু হইয়া রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিল।

বর-কন্যার যান আসিয়া দ্বারে থামিল! "ওমা, এ কি গো! এ কি ক'নে! এ যে সাত ব্যাটার মা, ধেড়ে মাগী! সর্ব্বনাশ—!" "হরি বল! কে এই ক'নে তুলে কোমর ভাঙ্গবে? ওলো ও কল্যাণি! হাত ধ'রে নে আয়, ক'নে তোর মত সাতটাকে চেপে মেরে ফেলতে পারে!" "একে ত এই বুড় ক'নে, তার ওপর হাঁটু ঢেকে একখানা বস্তরও জোটেনি! পায়ে দুগাছা মলও দ্যায়'ন গা, অবাক্—!"

গিরিজাসুন্দরী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই বধূ ঘরে আসিল! কাহার মুখে তিনি হাত চাপা দিয়া বেড়াইবেন? শচী করিল কি? শুধু কল্যাণীই কেন বাধা মানিল না। একেবারে দ্বিধাহীন চিত্তে সে গিয়া বধূর হাত ধরিল। বিলম্ব সহিতে না পারিয়া সেইখানেই সে বধূর মুখের আবরণ তুলি[illegible] মুখে সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্মিত

হাস্যে কহিল,—"এসো, লক্ষ্মী এসো"! কিন্তু গিরিজা সেই উন্মোচিতাবগুণ্ঠন বধূর মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, কবর খনন করিয়া শচীকান্ত একটা বহুদিনের মৃতা নারীকে কোন যাদুমন্ত্রপ্রভাবে তাহার পার্শ্বে উত্তোলন করিয়া আনিয়াছে! কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি সভয়ে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, মুহূর্ত্তে দৃষ্টি নামাইয়া ফেলিলেন। সুযোগমত শিশির কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল,—"এ বিয়ের সবই যেন হেঁয়ালি দেখ্‌চি বউ কেমন দেখলে ?"

কল্যাণী অকপটে উত্তর দিল,—"কেন! চমৎকার ত! দাদা সাধে পাগল হয়েছিল !"

শিশির এই সরলতার প্রতিমাকে তাহার সংশয়াকুল চিত্তের বৃথা ভারে, আক্রান্ত করিতে চাহিল না। সে শুধু কহিল,—"কে জানে, এ-সব কি রকম!"

"কি রকম আবার ?"

"না, এমন কিছু নয়। যদিও ওরা বল্লে হিষ্টিরিয়া, কিন্তু আমার মনে হয়, তা নয়, মৃগী রোগ আছে। সাবধানে রেখো। সম্প্রদান-টম্প্রদান সমস্তই মূর্চ্ছার মধ্যে হয়েচে।"

এদিকে গিরিজাসুন্দরীও কন্যাকে ডাকিয়া গোপনে কহিলেন, "শচী কি কাণ্ডই ক'র্‌লে! দেখ্‌দেখিনি, এখন লোকের কাছে মুখ পাওয়া দায়। তার ওপোর এত সৃষ্টি করে একটা বদ্ধ পাগল জোটালে! আমার মাথামুড় খুঁড়ে ম'র্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে !"

কমলার অসামান্য সৌন্দর্য্য কল্যাণীর সংসার-অ[illegible]শিশোর

চিত্তের উপর মায়া-যষ্টি স্পর্শ করাইয়াছিল। সে ব্যথিত হইয়া কেবলমাত্র কহিল,—"না মা, বউ খুব ভাল হয়েচে। পথের কষ্টে নিশ্চয় আজ ও রকম হয়ে আছে। ক'াল দেখো, বেশ সহজ লোকের মতই হয়ে যাবে।"

কিন্তু সে রাত্রির অবসানে পূর্ণ একটা দিন চলিয়া গেল, তথাপি নববধূর মধ্যে পরিবর্ত্তনের লেশ দেখা গেল না। সেই একই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, অর্থহীন দৃষ্টি! বর্ণ-লালিত্য ঘুচিয়া গিয়া একটা শুভ্র বিবর্ণতা যে ক্রমেই তাহার ললাটে গণ্ডে বিস্তৃত হইতেছিল, তাহা ক্রমশই বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। পাড়ার ছোট ছোট বধূ ও কন্যাগণ বিবিধ উপায়-অবলম্বনেও যখন সেই পাংশু ওষ্ঠ হইতে এক্‌-বর্ণাত্মক একটি শব্দও সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন সকলেই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইল। কেহ বা সেখান হইতে চলিয়া গেল! দেখিতে দেখিতে বাড়ীময়, পাড়াময়, দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, জমীদার-গৃহিণীর বোনপো রূপসী দেখিয়া এক বিংশ-বর্ষীয়া মূক উন্মাদকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। একালের ছেলেদের রূপ-তৃষ্ণায় শত ধিক্ দিয়া দেশ জুড়িয়া একটা তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। শিশির জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যি কল্যাণী?"

কল্যাণী কহিল,—"হতেও পারে।"

"তোমার দাদাও এবার বুঝেচেন! তিনিও ত এদিকে শয্যাগত। বেচারা ঐ জন্যই বিয়ে ক'র্‌তে বসেও সাত বার পেচিয়েছিল! আহা, তখন কি জানি, এই কাণ্ড!"

কল্যাণী কহিল,—"কে জানে, এ আবার কি হল! কিন্তু

আমার এখনও মনে হচ্চে যে, বউ নিশ্চয় কথা কইবে! অমন সুন্দর যার চেহারা, সে কখনও বোবা হতে পারে না!”

৪৭

অত্যন্ত উত্তেজনার পরই একটা সুগভীর অবসাদের আক্রমণ অনিবার্য্য। যুদ্ধের সময় যতটুকু উদ্দীপনা সৈনিক হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া যুদ্ধে তাহাকে প্রবৃত্ত রাখে, যুদ্ধ-জয়ের পর তাহা আর তেমনটি থাকে না। তখন হয়ত শোণিত-প্লাবিত রণভূমির ভয়ানক দৃশ্য তাহার আকাঙ্ক্ষিত জয়োল্লাসের মধ্যে একটা অতি তীব্র অনুশোচনা জাগাইয়া তুলে। শচীকান্তর অবস্থাও প্রায় এইরূপ দাঁড়াইল।

বর-বেশে গাড়ীতে বসিয়া সে কেবল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে গতিশীল বহির্জগতের দিকে চাহিয়া রহিল। পৃথিবীটা যেন প্রলয়ের সূচনা লইয়া মহাবেগে ছুটিতেছে! পথ, ঘাট, গাছ, ধূমাস্পষ্ট জলাভূমি, সমস্তই সেই বেগের সহিত ছুটিয়া চলিয়াছে! চমকিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। নিজে যেন সে কাহার কঠিন মুষ্টি-মধ্যে ধৃত হইয়া তেমনি বেগে আকৃষ্ট হইতেছিল,—থামিবার শক্তি নাই! নিজেকে তাহার আজ বড় অসহায় মনে হইল। এ কি! এ কে এমন করিয়া মানুষকে তাহার ইচ্ছায় বিরুদ্ধে পরিচালিত করে? এই কি মানবের অদৃষ্ট-নামধেয় ভাগ্যচক্র? কে ইহার অদৃষ্ট চালক? সেই কি ঈশ্বর! এত-বড় প্রবল শক্তি-সম্পন্ন হস্ত তদ্ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে? সব যেন একটা হেঁয়ালির মতই বোধ হইতেছে! সে যেন কোন্ [illegible] ধৃত

একটা কলের পুতুলমাত্র, ইহাই সে অনুভব করিতে লাগিল। কল টেপা হইয়া গিয়াছে, আর থামিবার জো নাই! ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সে চলিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার সময় দুইটা পুলিশের লোককে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সে সহসা কাঁপিয়া উঠিল,—তাহারা যেন তাহাকেই ধরিবার জন্য কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে! এ কথা মনে করিবার কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও এইরূপ যেন সহসা তাহার মনে হইল। গো-শকটমাত্র বরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল —গাড়ীতে না উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে সরিয়া আসিয়া ষ্টেশনের একটা থাম ধরিয়া দাঁড়াইল। হিমে থামটা শীতল হইয়া রহিয়াছে। সেটা স্পর্শ করিবামাত্র তাহার ললাটের ঘর্ম্ম যেন অকস্মাৎ সেই শীতল স্পর্শে জমিয়া আসিল। শিশির প্রফুল্লমনে যান-বাহন দৃষ্টে গান ধরিল, অশ্ব গজ পলাইল, চতুর্দ্দোল নাহি এল, গরুর গাড়ী দিল দরশন, ভূপতি আরোহি' কর সার্থক্ জীবন!…পালাও কেন? এসো হে বর!" শচীকান্ত আপনার অসহায় দৃষ্টি কোনমতে তাহার দিকে ফিরাইল, কহিল,—"এখনও এ বিয়ে বন্ধ করা যায় না, শিশির?"

"পাগল! এখন ঘাব্‌ড়ালে চল্‌বে কেন? জানই ত, তারা গরিব।"

"আহা, সে কথা নয়। শোন শিশির,—না ভাই, চেষ্টা কর। কি জানি, কি উচিত ঠিক বুঝতে পার্‌চিনে।"

শিশির একটা তামাসা করিতে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভি[illegible], বিস্ময়ে শুধু তাহার হস্তাকর্ষণ করিয়া

বলিল,—"অসুস্থ বোধ কর ত এসে গাড়ীতে একটু শুয়ে পড়— সেরে যাবে। কবি-মানুষদের বিরহও যেমন, মিলনও তথৈবচ! কিছুতে সুখ নেই!"

দুর্ব্বল শিশুর মত সে নীরবে আজ্ঞা পালন করিল। শরীরে বা মনে এতটুকু এমন বল ছিল না, যদ্দ্বারা সে ইহার বিপরীত কিছু করিতে পারে।

শিশির পাশে বসিয়া কত কথা বলিল, সভয় প্রশ্নে বারবার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। সে কোন জবাব দিতে সক্ষম হইল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, কে যেন তাহাকে সেই অন্ধকারের ছায়ায় ছায়ায় অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে! সেই অদৃশ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার অন্তস্তল ভেদ করিতে লাগিল এবং একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে থাকিয়া থাকিয়া সে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

তারপর সমুদয় বাধা-বিপত্তি এক দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টি হয় নাই। কন্যার সলজ্জ নেত্র বরের পিপাসু নেত্রে তড়িৎ স্ফুরণ করিল না। এতই বুঝি সে আত্মহারা হইয়াছিল যে, পাছে তাহার আনন্দ ব্যক্ত হইয়া যায়, তাই সাহস করিয়া চাহিতে পারে নাই! কিন্তু বিবাহের মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হইতেই সর্পদষ্টাবৎ কন্যা অকস্মাৎ ধড়মড়িয়া অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিল; পার্শ্ববর্ত্তীর পানে দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। তারপর সহসা তাহার মস্তক সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল,—সে পতনোন্মুখ হইল।

যখন বিবাহ হইল, তখন লগ্নের কোন চিহ্নই ছিল না। শুক্রতারা তখন নিবিয়া গিয়াছে, এবং [illegible] শ্বেত

বসনের ঘোমটাপরা উষা তাহার বিস্মিত চক্ষু মেলিয়া রক্তবসনা কন্যার চন্দন-চর্চ্চিত মুখের মৃত্যু-বিবর্ণতা সন্দর্শন করিয়া সহানুভূতির শিশিরাশ্রু মোচন করিতেছিল! যখন করালীচরণ বীতসংজ্ঞা কমলার হিম হস্ত টানিয়া আনিয়া বরের শিথিল করে স্থাপন পূর্ব্বক সম্প্রদান মন্ত্র পাঠ করিল, তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ শিহরিয়া বর সেই হাতখানা নিজের হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল,—"শিশির!"

"ছিঃ, কি ক'রচো শচী?"

"না ভাই, না। আমায় রক্ষা কর, তোমরা জানো না, আমি—

"ক্ষেপে গেলে না কি! ব'সো, ব'সো, আর সময় নেই, সূর্য্য ওঠে ব'লে।" প্রায় তাহাকে চাপিয়া বসাইয়া শিশির তাহার পার্শ্বে বসিল। অস্ফুট স্বরে সে আত্মগতভাবে কহিল,- "কি পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেছে! মেয়ের চিরকেলে হিষ্টিরিয়া আছে শুন্‌চো,—তবু এত ভয় পাচ্চো কেন?"

গৃহে ফিরিয়াও সে দ্বিধা সে সঙ্কোচ কাটিল না। নববধূর কথা ভাবিতে গেলে কেবলই সেই রক্তহীন অচেতন মুখ ও তাহার হিম-শীতল স্পর্শ মনে উদয় হইয়া একটা অশান্তির সঞ্চার করে। তথাপি মনের নিভৃত কোণে একটু সুখের আলোও ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সাধনার ধন আজ প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে!

সেদিন ফাল্গুনের ঈষৎ-শীতোষ্ণ বাতাসে মুকুলদাম শিহরিয়া উঠিয়াছে৷ আম্রমুকুলের মদগন্ধলুব্ধ মধুকর গুন্‌গুনিয়া ফিরিতেছিল; বসন্তের চির[illegible]ন নীরব ছিল না; উদ্যানের সর্ব্বত্র একটা হাসি-খে[illegible]তামাতিরই চিহ্ন! আকাশের নীলটাও সেদিন রূপালি

কাজ করা পুঞ্জ মেঘে বারাণসী সাড়ীর মত দেখাইতেছিল। জানালার নিকট বসিয়া শচীকান্ত এক দৃষ্টে-সেই শোভাময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়াছিল। বহুদিন পরে আজ যেন আবার প্রাণের মধ্যে এই কুহকিনীর উন্মাদ-কারী মূর্ত্তি ছায়াপাত করিয়াছে। বাহিরে মাঠে মাঠে ফসল পাকিয়া উঠিতেছে,—বাতাসে বিবিধ ফল-ফুলের গন্ধ ভাসিতেছে। অন্য মনে গুন্‌গুন্ করিয়া সে একটা সঙ্গীতের একটা চরণ ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল,—"জনম অবধি হম্ রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল!"

ক্রমে জানালার মধ্য দিয়া তরল রজত-ধারা ঢালিয়া চাঁদ উঠিল। জানালার ঠিক সম্মুখেই একটা বড় নক্ষত্র কাহার দীপ্ত নেত্রের মতই জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল! অল্প শীত অনুভব করিয়া শচী-কান্ত একখানা র‍্যাপার টানিয়া গা'য় দিল,—তারপর আবার সেই জানালাটার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবর্ণোজ্জল হরিৎক্ষেত্র জ্যোৎস্না-তরঙ্গে ঈষৎ তরঙ্গিত হইতেছে,—চাঁপা গাছের ডাল নাড়া দিয়া মৃদু বাতাস বহিতেছে,—অগণ্য নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রালোকে ম্লান, ম্রিয়মাণ—প্রলোভন আজ অদম্য হইল।

সে ধীরে ধীরে দুইটা ঘর পার হইল; সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিতে নামিতে দেখিল, কল্যাণী উপরে উঠিতেছে। সে দাঁড়াইল, দ্বিধা-কুণ্ঠিতভাবে নতমুখে কহিল,—"তোকেই খুঁজছিলাম!"

"ওঃ—" কল্যাণী যেন আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান। এইমাত্র সে [illegible] কতকগুলা বকুনি খাইয়া আসিয়াছে। আজকাল গিরিজাসুন্দরী বড়ই চটিয়া

আছেন। কাজেই কারণে অকারণে তিরস্কৃত হওয়া এখন এ বাড়ীতে অনিবার্য্য, বিশেষতঃ কল্যাণীর পক্ষে।

শচীকান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। তাই সে নিজে হইতে কিছু বলিতে পারিল না, দাঁড়াইয়া রহিল। তখন হঠাৎ কল্যাণীর মনে হইল, হয়ত দাদার কিছু ব'লবার আছে। সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দাদা?"

"এমন কিছু না। ফুলশয্যার দিন বদলানোর জন্য মাসিমা চটেচেন—না?"

"তা একটু চটেচেন বৈ কি। সে ভুলে যাবেন এখন—"

"কেন তা হ'লে আর তাঁকে বিরক্ত করা—আজই না হয়—"

কল্যাণী গাল-ভরা হাসির সহিত তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল,—"বেশ ত! মাকে বলিগে।"

শচীকান্ত জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে চাহিল। এই পাঁচ দিন ধরিয়া কেবলই সে মনে মনে পিছাইয়াছে! কেবলই তাহার মনে হইয়াছে, সে যেন কোন একটা মারণ-মন্ত্রদ্বারা কোন গূঢ় অভিচার-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া শবসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সিদ্ধির শবটা মাত্র তাহার লাভ হইয়াছে, ষড়ৈশ্বর্য্যের কোন খবরই নাই! আজ সবলে সমস্ত বাধা কাটাইয়া নিজের চিত্তকে সে উন্মুখ করিয়া তুলিল। সেই হিম-হস্ত আর তেমন করিয়া তাহার পা দুইখানা চাপিয়া ধরিল না। সহজভাবেই সে জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে অগ্রসর হইয়া গিয়া নববধূর সম্মুখে দাঁড়াইল। নূতন ভাবের আলোড়নে তাহা[illegible] ব[illegible]ু তখন ঈষৎ কাঁপিতেছিল।

কমলা কোনদিকে চাহিয়া দেখে নাই। যে অবস্থায় তাহাকে কল্যাণী ফুলসাজ পরাইয়া বসাইয়া দিয়া গিয়াছে, মাটির গড়া প্রতিমার মত সেইখানে সেই অবস্থাতেই সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল।

জানালার ঠিক সম্মুখেই সবুজ বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া শিশু চন্দ্র প্রসন্ন মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেই আলো কমলার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে যেন দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছিল। যাহার নিজের মন নিজের কাছে পাথর হইয়া গিয়াছে, অপরে তাহার প্রতি কেন এত সহানুভূতি দেখাইতে আসে, কে জানে!

শচীকান্ত অগ্রসর হইয়া মৃদু স্বরে ডাকিল,—"কমলা!"

কমলা তড়িতাহতের মত একবার মাত্র চমকিয়া আশাপূর্ণ যুগল নেত্র পূর্ণ বিকশিত করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। পরক্ষণে ঘোর হতাশার বজ্র যেন তাহার মাথার উপর আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এমনি তাহাকে অসহায় দেখাইল। বুঝি, শেষ সংশয়টুকুরও এই সঙ্গে সমাধি হইয়া গেল।

সেই দৃষ্টিটুকুর মধ্যে কি ছিল, সে-ই শুধু বলিতে পারে। সেই চোখের বিদ্যুৎ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শচীকান্তর গুরুভার-গ্রস্ত অপরাধী চিত্ত বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘের মত একেবারে লঘু হইয়া গেল। দূর অতীত নিকট হইয়া নিকটকে যেন কোন সুদূরে ঠেলিয়া দিল। সে নিকটে আসিয়া বসিয়া পড়িয়া হাস্যমুখে কহিল,—"কমলা, এ জীবনে যে এ দিন [illegible] পাব, সে আশা আমার ফুরিয়েই ছিল। এ সুখের ঋণ কার [illegible]ছে শোধ

করবো ? কখনও ঈশ্বর মানিনি, কিন্তু আজ তাঁর কথা ভাব্‌তে ইচ্ছে ক'চ্ছে। বোধ হয়, তাঁরই অসীম দয়া তোমাকে আমার পাশে এনে দিলে। তিন বৎসর প্রায় কেটে গেল,—কত খুঁজেচি,—কত কেঁদেছি,—কোন্ অতলে তুমি তলিয়ে ছিলে,—কোথাও—তোমায় খুঁজে পাইনি—"

আবেগ-ভরে সে আরও কত কথাই বলিয়া গেল, কিন্তু নববধূ বোধ হয় ইহার একটাও বুঝিতে পারিল না। সে যেমন তেমনই নিস্পন্দ-লোচনে চাহিয়া রহিল। তাহার শরীরের মধ্যে বুঝি কোনরূপ ইন্দ্রিয়-শক্তির কার্য্য চলিতেছিল না। চলিলে সে চোখদুটায় কোন কিছুর একটা ভাবও অঙ্কিত থাকিত !

রাত্রি বর্দ্ধিত হইতেছিল। কর্ম্মগৃহের কোলাহল মন্দীভূত হইতে লাগিল। বাতাস শীতল হইয়া আসিল। বিশ্ব-বিস্মৃত শচীকান্ত মুগ্ধ নেত্রে অনবগুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল—কোথায় ক্ষোভ,—কিসের লজ্জা ! এ মুখের যে তুলনা নাই। ইহার জন্য বন্ধু বিচ্ছেদ অনায়াসেই সহ্য করা যায় !

চেতনা-লাভে আর একটু সরিয়া গিয়া মুগ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল, —"কমলা !" পরে সাদরে কমলার হাতখানি হাতে তুলিয়া লইল, ডাকিল, —"আমার কমল !"

আগ্নেয়-গিরির ধাতু-নিঃস্রাব-বৎ জ্বালাদিগ্ধ কঠিন স্বরে কমলা সহসা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"তুমি আমার কেউ নও !" সবেগে হাত টানিয়া লইয়া বিদ্যুৎ বেগে সে সরিয়া গেল।

ভোরের বেলা বাহিরে আসিতেই কৌতুকময়ী কল্যাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা [illegible] কথা কয়েচে, দাদা ?" সে এতক্ষণ

দ্বারের ফুটায় চোখ রাখিয়া কাণ পাতিয়া নিঃসাড়া কক্ষে আড়ি পাতিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। শচীকান্ত এ প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল,—“তোদের বউকে জিজ্ঞাসা করিস্।” বলিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কাহারও কাছে তাহার যেন মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। মনে হইতেছিল, কোথাও কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া গলা ছাড়িয়া মেয়েমানুষের মত খানিক কাঁদিতে পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

কল্যাণী অনেক অনুসন্ধানে পাশের স্নানাগার হইতে বধুকে টানিয়া বাহির করিল। সেই দৃষ্টি, সেই একই ভাব! বুঝিল, তাহার দাদা এইজন্যই তেমন বিষাদের হাসি হাসিয়াছিলেন, একটু ক্ষুব্ধ হইয়া সে বলিল,—“কি তোমার রকম ভাই?”

কমলা অর্থহীন দৃষ্টিতে কেবল একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র। সে দৃষ্টিতে কিছুই ছিল না—তথাপি যেন অনেক ছিল! কল্যাণী সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গেল।

মনের ঝাল মনে মারিয়া গিরিজাসুন্দরী যথাকৃত্য সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এইজন্যই শচী বাপ-ভাইকে কিছু জানিতে দেয় নাই! একে তো ডোমের চুপড়ি ধুইয়া তোলা,—তায় অমন ধেড়ে মেয়ে। উঁহারা কি এ অনাচার ঘটিতে দিতে পারেন? তা যাই হোক, যাহা হইবার হইয়া গেছে। তাই বলিয়া আমি কেন উহাদের একটা খবর অবধি না দিই? মনেই বা করিবে কি? ভক্তিনাথকে পত্রে যথাসম্ভব সংবাদ পাঠাইয়া, বৌভাতের মধ্যে সপরিবারে আসিতে লিখিলেন। বলিলেন,—“আমার ত দুজনেই সমান। আমি কেন তার সঙ্গে [illegible] করিব?”

বড় বধূ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। মাসির এতখানি দৌলত ভোগ করিতে লাগিল ছোটবাবু, আর তাহাদের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথাপরম্। মনে মনে গস্‌গসিয়া কাহারও সহিত ভালরূপে একটা কথাও তিনি কহিতে পারিলেন না। ভাবিলেন,—"একেই বলে কলিকাল! যে দেবতা বামুন মান্‌লে না, সেই হলো রাজ্যেশ্বর, আর আমরা যে ভিটেয় সাঁজ জ্বাল্‌চি,—বার মাসে তের পার্ব্বণটি বাদ দিচ্চিনে,—একচোখো ঠাকুর কি চোখের মাথা খেয়েছে যে, এ সব দেখ্‌তে পায় না?"

কল্যাণীর কাছে পরিচয়ের আবশ্যক করে না। সে হাসিমুখে ভ্রাতৃজায়াকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল,—"কেমন জা' হয়েচে দেখসে? বৌদি, এমন কখনও দেখনি।"

বড় বধূর কাণে শচীকান্তর স্ত্রীর এতটা প্রশংসা সহিল না। তিনি মুখ ঘুরাইয়া একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"রূপ যদি বল্লে ত বলি, আমাদের ওখানে মণীশ ঠাকুরপোর বাগ্‌দত্তা একটি মেয়ের যেমন রূপ দেখেছি, আর কোথাও তেমনটি দেখব না। মেয়েটির নাম কমলা। তা নামেও যা, কর্ত্তব্যেও তাই! একেবারে যেন লক্ষ্মীর—ও মা, এ কে? এই বউ নাকি? অ্যাঁ! সে কি? এই ত সেই কমলা!"

৪৮

মস্ত বড় একটা ফাঁড়া আসিয়া কাটিয়া গেলে, মনের মধ্যে কিছুক্ষণ বড় [illegible] নিরতার হাওয়া বহিতে থাকে। ছোট

খাট অশান্তি সেই বড় বিপদের মধ্যে লীন হইয়া যায়। নূতন স্বাস্থ্য লাভের মত হৃদয়ে নবীন শান্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া নবজীবন গঠিত করে। কোন বিক্ষোভ যেন আর সে চিত্তে স্থান পায় না।

নন্দকিশোর প্রবল ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পূর্ব্বের সকল আঘাত ভুলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে ইন্দুভূষণের সহিত বোঝা পড়া চুকাইয়া বিন্ধ্যবাসিনীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"ইন্দু ছেলেটির জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। বড় চমৎকার ছেলেটি! যাহোক, যা হবার নয়, তার জন্য আপ্‌শোষ করাই বৃথা। তা আমি তাকে একেবারে ছেড়ে দেবো না। তার সকল ভার নেবো। এখন তুমি কি বল, বিন্ধ্য? গৌরীর বিবাহ বন্ধ হবে—না, এই সময়েই দিয়ে ফেলা যাবে?"

বিন্ধ্যবাসিনী এ কথাটা বার বার ভাবিয়াছিলেন, তাই শীঘ্রই উত্তর করিলেন,—"এখনি এখনি বর কোথায় পাবেন?"

নন্দকিশোর কহিলেন,—"বর ঠিকই আছে। তোমায় একটি কাজ ক'র্‌তে হবে। সত্যর মাকে একখানি চিঠি লিখে সব কথা জানাও। তাঁদের মত কি, জিজ্ঞাসা কর। এই দিনেই বিয়ে হ'লে বাইরে আর অতটা গোল হবে না, আর দিতেই ত হবে এক দিন।"

এ ইচ্ছাটা বিন্ধ্যর মনেও একবার উঁকি মারিয়াছিল; কিন্তু তিনি ইহাকে আমল দিতে সাহস পান নাই। এখন ভগিনীপতির কথার উত্তরে কহিলেন,—"সত্যর সঙ্গে বিয়ে দেবে?"

"ক্ষতি কি? তারা যদি দেয়।"

"তা দিতে পারে। শিবনারায়ণ বাবু চমৎকার লোক,—ধ'র্‌লে 'না' ব'ল্‌তে পা'র্‌বেন বোধ হয় না। [illegible]

"কি ?"

"তাঁরা যে বউকে বাপের বাড়ী বারমাস রাখেন, এমন ত মনে হয় না, অবস্থাপন্ন লোক তাঁরা—তাতে পাঁচটা নয়।"

"বেশ ত, কার না সাধ, মেয়ে শ্বশুর ঘর করে ?"

বিন্ধ্যবাসিনী একটু বিস্ময় বোধ করিলেন; কহিলেন,—"আপনার যখন আর কোন অবলম্বন নেই, তখন—"

অন্ধকার রাত্রে ঘন মেঘের বুক চিরিয়া ক্ষণপ্রভা যেমন চমকিত হয়, তেমনি এক ফোঁটা শুষ্ক হাসি নন্দকিশোরের ওষ্ঠ প্রান্তে ফুটিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন,—"আমি কে, বিন্ধ্য! চির আবর্ত্তনশীল সংসারচক্রের আবর্ত্তন-বেগের বিরুদ্ধে বাধা দেবার আমার কি শক্তি আছে? দেখ, কোথা থেকে কোথায় ব্যাপার গড়াল! বিধাতার খেলা, তুমি আমি উপলক্ষ্য হয়ে খেলে যাই বই ত নয়। কেন খেলি? ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন যাই? কে নিয়ে যায়? আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হাত আমাদের টেনে নিয়ে যায়, তবে না যাই। তবে? কি হবে সে বেগবান তরঙ্গের বেগে বাধা দিয়ে? যা বিধাতার বিধান, তারই সাহায্য চেষ্টা করা ভাল। ঈশ্বরের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালে নিজের ধ্বংস অনিবার্য্য। আর কিছুই ফল নাই।"

নন্দকিশোর চুপ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠের মৃদু কম্পনে মনের আঘাত ব্যক্ত হইল। গৌরী যে তাঁহার কন্যা নয়,—এ আকস্মিক সংবাদের বিহ্বলতা ও ব্যথা এখনও তাঁহার মন হইতে ঠিক কাটিয়া যায় নাই। নিজের মনকে তিনি নিজেই কতবার প্রশ্ন করিতেছেন, আমি যে তার মুখে কাদম্বিনীর পূর্ণ সাদৃশ্য

দেখিতে পাই, তাহাও কি আমার ভ্রান্তি? হইবে।—ইহাই বোধ হয় মরীচিকা! গৌরীর মনে যে তাঁহার প্রতি ভালবাসার কোথায় একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে, আর তাহার প্রকৃত কারণ তাঁহাদের নিঃসম্পর্কতা, ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত দ্বিগুণ বেদনা বোধ করিল। তাই শেষে নিজেকে তাহার সুখের কাছে উৎসর্গ করাই তিনি যুক্তিযুক্ত স্থির করিলেন। বিন্ধ্যাও কি এ ঘটনায় ব্যথা পান নাই? পাইয়াছিলেন বৈ কি। কিন্তু তথাপি এই অনাথার জন্য তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যপূত নিষ্কাম চিত্তে যে বাৎসল্য আজীবন সঞ্চিত রহিয়াছে, সেখানে তিনি কোন দিনই কোন প্রতিদানের আশা রাখেন নাই; তাই তাঁহার স্নেহ-উৎসের বেগ যেমন তেমনই রহিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"নাই হউক সে আমার বোন্‌ঝি, তবু সে আমার সেই গৌরীই ত!"

একটু নীরব থাকিয়া নন্দকিশোর পুনরায় বিষণ্ণ-স্বরে কহিলেন,—"অন্তর্য্যামী বুঝি অন্তরের অপরাধের এই দণ্ড পাঠিয়ে ছিলেন। আমার ব'লে আমি একেবারে মোহে অন্ধ হ'চ্ছিলাম, তাই বুঝিয়ে দিলেন, যাকে নিজের ব'লে কাছ-ছাড়া ক'রতে ভয় পাচ্ছ, সে তোমারই নয়। আর না বিন্ধ্য, যা জড়িয়ে ফেলেচি, তা আর খুল্‌তে পা'র্‌বো না। কিন্তু এর বেশী আর কাজ নেই! আমি কে? আমার সুখ-দুঃখ এ জগতের নিয়মের কাছে কতটুকু? নিজেকে আর বাড়া'তে চাইনে।"

কথা কয়টার মধ্যে ত্যাগশীল পিতৃ-হৃদয়ের যে মর্ম্মব্যথাটুকু ছিল, স্নেহময়ী বিধবার বক্ষে তাহা বাজিল। তিনি একটা অছিলায় নিজেকে দমনের প্রয়াসে উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু গৌরী খবরটা পাইয়া তেমন সুখী হইতে পারিল কি না, তাহা সেও ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, এ কি রকম! সত্যদা আমার—ওমা, সে যে বড় বিশ্রী! ছি, ছি, না,—সে ভাল হবে না। বরকে সবাই লজ্জা করে,—ঘোমটা দেয়,—আমি ত সে সব কিছুই পারব না; আমার ওরকম কর্‌তেই লজ্জা ক'র্‌বে, আর হাসি পাবে। কি যে ওঁরা সব ঠিক করেন! মাসিমাকে গিয়া সে বলিল,—"বিয়ে না হলেই ত হয় মাসিমা,—হয় না?"

বিন্ধ্য তাহাকে কোলে টানিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া মনের ঈষৎ ভারটুকু লঘু করিয়া ফেলিলেন; হাসিয়া কহিলেন,—"তা কি হয় রে পাগলি? হিন্দুর ঘরে বিয়ে না হলে যে হয় না।" গৌরীর পক্ষে আর কিছু বলা যেন কঠিন হইয়া উঠিল। বিশেষ সত্যর নামটা তাহার মুখে বড়ই বাধিতেছিল।

৪৯

পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; দেড় বৎসরে শিবনারায়ণের সংসারে বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে পরিবর্ত্তন শিবনারায়ণকে বৃদ্ধ ও করুণাময়ীকে পেষিত এবং সত্যকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল। কেবল একমাত্র মণীশের কোমল চিত্তের উপরই বুঝি সেই ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল নির্ম্মম কাল আপনার বর্ণতুলিকার টান টানিতে কাতর ছিল; তাই সে এখনও তেমনই অপরিবর্ত্তিত। সেই পঠন, পাঠন, সেই গুরুসেবা, স্নেহাস্পদে প্রীতি, সেই হাসিমুখ, সবই যেন সেই! এত বড় [illegible] ভাগ্য-পরিবর্ত্তন তাহাকে যেন এতটুকু বদল

করিতে পারে নাই। তাহাকে দেখিয়া শিবনারায়ণ নিজের অনুতাপ-লাঞ্ছিত জর্জ্জর হৃদয়ে গভীর বিস্ময় অনুভব করিতে করিতে মুগ্ধ চিত্তে ভাবিতেন,—"ধন্য তুমি মণীশ, দুঃখেষনু দ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ,—সে তোমাতেই দেখিলাম!"

কমলার দুইদিনের স্মৃতি করুণাময়ীকে সব চেয়ে কাতর করিয়াছিল। কোন কোন মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে, যাহা তাহাকে দুইটা দিনেই একজনের কাছে চিরপরিচিত করিয়া তুলে; আবার দুইজন চিরপরিচিতের মধ্যেও এমন একটা কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়, যদ্দ্বারা আজন্মের সহবাসেও তাহাদের পরস্পরের নৈকট্য অনুভূত হয় না! ইহাকেও প্রাচ্য জ্ঞানিগণ কর্ম্মবন্ধন কহিয়া থাকেন। পতি-পত্নীর সম্বন্ধে বহু স্থলে এ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোথাও পিতা পুত্রে, মাতায় কন্যায়, সহোদরে সহোদরায় এই ভাব সুব্যক্ত। করুণাময়ী অনাথা সখীপুত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বধূরূপে কন্যাহীন গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া এমনই সুখ পাইয়াছিলেন; সন্তান অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহাস্পদ মণীশের বধূরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে এতখানি ভালবাসিয়াছিলেন যে, করালীচরণের হীনতায় স্বামীর উচিত কোপকেও তিনি সে জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, গোপনে তাহার সহিত রফা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মেয়েমানুষের কথা বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব কানেও কেহ তুলিল না। কমলা তাঁহার কক্ষচ্যুত হইয়া চলিয়া গেল। রমণীর আর সাধ্য কি! ক্রন্দনের বন্যায় বুক ভাসিল মাত্র।

শিবনারায়ণ নিজেও বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া [illegible]ছিলেন।

হীনচিত্ততার সংস্রব মহৎ হৃদয় সহিতে পারে না ; তাই এত-বড় একটা ঘৃণিত অভিনয়ের অভিঘাত তাঁহাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সাধু লোকের ক্রোধ কাগজে লাগা আগুনের মতই ; দপ্ করিয়া যেমন জ্বলে, তেমনই শীঘ্র নিবিয়া যায়। তাহার আঁচে একটা ফোস্কা লাগিতে পারে, কিন্তু দগ্ধ করে না। ঘণ্টা দুই চা'র পরেই ঠাণ্ডা হইয়া তিনি বলিলেন,—"মেয়েটাকে যথার্থই নিয়ে যেতে দিলুম,—এ'ত ভাল হ'ল না। একবার যাব না কি ?" করুণাময়ীর প্রাণ ত ইহাই চাহিতেছিল। তিনি সহর্ষে কহিয়া উঠিলেন,—"গেলে হত না ! কি জানি, যে রকম লোক হয় ত টাকা পেলে আর কোথাও মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেবে।"

"সে ভয় আমি করিনে, তাতে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বংশজের অত বড় খাঁই কে মেটাতে পা'র্‌বে ? অবস্থাপন্ন ঘরে কেউ আর টাকা দিয়ে ছেলের বিয়ে দেয় না ; যত সুন্দরী মেয়েই হোক, তারা টাকাটাই খোঁজে ! তা ছাড়া মেয়েও ত ছোট নয় ! আর বোধ হয়, খুব সেয়ানাও আছে। সে কি সে-রকম দেখ্‌লে তোমায় খবর না দেবে, ভেবেচ ?"

পরদিন শিবনারায়ণ ত্রিবেণী গিয়া করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; বলিলেন,—"যাহা চাহিয়াছিলে, দিব, কমলাকে পাঠাইয়া দাও !"

করালীচরণের ক্রমেই চোখ ফুটিতেছিল। লোভই লোভ বাড়াইয়া চলে। সে তৎক্ষণাৎ কহিল,—"তিনটি হাজার টাকা চাই, তা-ছাড়া আমার বাড়ীতেই বিয়ে হবে। খরচাটাও আগাম দেবেন, এর এক ক[illegible] চলবে না।"

অতি ক্রোধে আবার শিবনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বুঝিলেন,—দর ক্রমে বাড়িতেই থাকিবে; মনে মনে বলিলেন,—"তবে দেখ, আমিও তোমায় জব্দ ক'র্‌ব, দিন কতক চুপ চাপ থাক্‌বো—গরজ না দেখ্‌লে তখন যা ব'ল্‌বো সেধে এসে তাই নিয়েই মেয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

শ্বশুর বাড়ীর লোকদের তিনি বলিয়া আসিলেন, সেখান হইতে সর্ব্বদাই কমলার তত্ত্ব লইয়া যেন সংবাদ পাঠায়। কিন্তু একদিন যখন খবর আসিল,—করালীচরণ সপরিবারে হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। প্রথম কয়দিন করুণাময়ীকে সংবাদটা তিনি জানাইতে পারিলেন না। নিজেই চারিদিকে সংবাদ লইতে লাগিলেন; শেষে ভক্তিনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল,—কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। করালী আসিল না। শিবনারায়ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে সহসা একেবারে সকল সংবাদই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভক্তিনাথ মর্ম্মাহত-চিত্তে রত্নপুকুর হইতে ফিরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের তক্তাপোষে অধোমুখে বসিয়া পড়িলেন। আর বড়বধূ ছেলে-কাঁখে পাড়ার প্রতিগৃহে ঘুরিয়া ছোট কর্ত্তার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেশময় রাষ্ট্র করিয়া মনের ঝাল মিটাইতে লাগিলেন। শেষে যোগ করিলেন,—"কেমন, এখন মুখে চুণকালী প'ড়েচে ত? ভাই ব'ল্‌তে ঠাকুর একেবারে দিশেহারা হন যে! মনে করেন, কুঁদুলে মাগীরই যত দোষ; ওঁর লক্ষ্মণ ভাই পাকা ফলটি ধরেই থাকেন,—মুখে ছোঁয়ান না। দর্পহারী মধুসূদন কেমন দর্প চূর্ণ করেচেন! ভাই কত বড় ভাল, [illegible] ছিাখুন!"

সংবাদটা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই গাঙ্গুলি-পরিবারের উপর পড়িয়াছিল! করুণাময়ী এ দুর্দ্দৈবে এককালে স্তম্ভিত হইলেন। শিবনারায়ণ যেন মরমে মরিয়া গেলেন! এ কি হইল! সহস্রবার তাঁহার মন নীরব বিস্ময়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল,—কাহার দোষে এমন হইল? মণীশের প্রতি কমলার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বুঝিয়া আত্মধিক্কারে তাঁহার চিত্ত পীড়িত হইয়া উঠিল। কেন, তিনি করালীচরণের উপর রাগ করিয়া কমলাকে ছাড়িয়া দিলেন? মণীশ যদি ভাবে—যদি সে পলকের জন্যও মনে করে টাকাটাই কাকার বড় হইল?

সাপে ছুঁচা ধরার যে উপমাটা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, এ পরিবারের অবস্থা এখন ঠিক সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে সবটাই চাপা থাকিল। 'উগরাইবার বা ফুক্‌রাইবার' সাধ্য যেন কাহারও ছিল না। এই অভূতপূর্ব্ব- অদ্ভুত নাটকের নায়ক এ পরিবারের ইষ্ট-গুরু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আত্মজ!

তাই চাকদার প্রতি গৃহে যে সময় সেই ঋষি-সন্তানের উদ্দেশ্যে কুৎসা-গ্লানি বিদ্রূপ-অভিসম্পাত-বর্ষণ চলিতেছিল, এ গৃহে তখন ঝটিকা পূর্ব্বেকার স্তব্ধ সমুদ্রের মত একটা ভীতি-সঞ্চারিণী স্তব্ধতা মাত্র বিরাজ করিতেছিল। সত্য শুদ্ধ এ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছে।

যেদিন নন্দকিশোর কন্যার বিবাহের উমেদারী লইয়া গাঙ্গুলি গৃহে আগমন করিলেন, সেদিন সদ্যো-বর্ষণের সজীতায় দেশটা যেন তাজা [illegible] উঠিতেছিল। মেঘমুক্ত আকাশখানা অনন্তের বিপুল

বক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। ফুল বাগানের জল-ধৌত শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল, কে যেন এখনই রং ফলাইয়া ইহা চিত্রিত করিয়া গেল। সার্শির উপর মুক্তা-বিন্দুর মত বারিবিন্দু শোভমান, আম-বাগানের ছায়াস্নিগ্ধ স্নেহরাশি মাখিয়া সজল শীতল বাতাস ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এবং সেই চির-পরিচিত গৃহে শাদা আস্তরণ বিছানো টেবিলটির নিকট কেদারাখানি দখল করিয়া পূর্ব্বের মতই প্রীতিপূর্ণ কৌতূহলে মণীশ সেই ধৌত-ধূলি গৃহোদ্যানের দিকে চাহিয়াছিল। আজ ইহার প্রতি ধূসর কাণ্ডটি হইতে গাঢ় সবুজ পত্ররাজি পর্য্যন্ত যেন একটি নয়ন-লোভন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সারি সারি জুঁই গাছের আপ্রান্ত আধফোটা শ্বেত মুকুলে খচিত; ভক্ত-হৃদয়ের রক্তরাগে রাঙ্গা জবা বিশ্ব-লক্ষ্মীর পদতলে যেন আত্ম-নিবেদন করিয়াছে। মণীশ সেইদিকে চাহিতেই একটা অতি সুন্দর উপমা তাহার মনে পড়িল। একদিন এমনই বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘের স্তিমিত আলোকে বসিয়া এক মহাকবি লিখিয়া গিয়াছেন, "বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বন নদীতীরজাতানি সিঞ্চন্ উদ্যানানাং নবজলকণৈ-র্যূথিকাজালকানি।"

বিশ্ব-রচনার আগাগোড়াই সৌন্দর্য্যপূর্ণ; ইহার কোথাও যেন দৈন্য নাই! তবে যত অভাব দিয়াই কি বিধাতা মানব-চিত্ত গড়িয়াছেন! এই সামান্য বৃষ্টিটুকু জগতের কতখানি তৃপ্তি সাধন করিয়া গেল,—কতখানি শোভা-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিল! কিন্তু এ জীবনের মধ্যে উহার ক্ষীণধারা ত কই কোন পরিতৃপ্তিই দিয়া গেল না। মণীশ আপনার মধ্যে অন্বেষণ করিল, [illegible] তাহার

কোন ক্ষোভ নাই সত্য, কিন্তু আনন্দই বা কোথায়? ওই ছোট পাখীটির মত, ওই জলধারাধৌত সবুজ লতাটির মত নম্র শান্ত চিত্ত তাঁহারই জয়-গানে ত আগাগোড়া ভরিয়া নাই! কেন থাকে না? কিসের এ অতৃপ্তি? অমনই নির্ম্মল অম্লান হৃদয় লইয়া সে ত এ সংসারে এত দিন কাটাইয়া দিয়াছে, তবে এত দিনে মনের মধ্যে এই কুয়াশার সূক্ষ্ম জাল কোন্ সুযোগে প্রবেশ করিতে আসে? সে মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কপিশবর্ণ আকাশের পানে চাহিল। অসীম বিশ্বেশ্বরের সন্তান হইয়া হৃদয়ে এই সসীম সঙ্কীর্ণতা বহন করিয়া বেড়ানো, মানব জীবের পক্ষে একান্তই লজ্জাস্কর! কিসের দৈন্য! আপনার সত্তাকে সেই সত্য মঙ্গলে, শান্ত সুন্দরে নিমজ্জিত করিতে পারিলেই ত সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে, ক্ষুদ্র স্ব বিশাল হইয়া উঠিবে। তবে কেন মুহূর্ত্তের জন্যও মনে সঙ্কীর্ণ চিন্তার বিষণ্ণতা স্থান পায়? না, না, এ ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সে তৃপ্ত হইবে,—আনন্দপূর্ণ রহিবে,—মনের কোণেও অভাবকে স্থান দিবে না।

ধীর পদে কে কক্ষে প্রবেশ করিল; ডাকিল,—"মণীশ!"

"আজ্ঞে!" মণীশ ব্যস্ত-সমস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া খুল্লতাতের সম্মুখীন হইল। শিবনারায়ণের মুখ অত্যন্ত ম্লান, মনের মধ্যে বোধ হয় একটা তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। প্রথম কথাটি উচ্চারণ করিতে বাধিয়া গেল; শেষে ঈষৎ আত্মদমন করিয়া তিনি কহিলেন,—"নন্দবাবুর পালিত কন্যার সঙ্গে সত্যর বিয়েতে তুমি মত দিলে মণীশ? তুমি যাতে খুসী হবে, তাতে বাধা দিতে আমার সাধ্য নেই [illegible] ত এ আমার মহা প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, জেনো মণীশ!

তোমার চিরকৌমার্য্যে আমার বুকে শেল বিঁধবে,—সতুর বউয়ের দিকে আমি চেয়ে দেখ্‌তে পা'র্‌ব না।"

মণীশ কাতর কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"কাকাবাবু!"

"না মণীশ, তুমি আমায় কি বলবে? আমি কি জানিনে, আমি কি করেছি! তোমার বাগ্‌দত্তা বধূকে কেন আমি তুচ্ছ মানে গর্ব্বে অন্ধ হয়ে পাষণ্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় ক'র্‌তে হবে না? তুমি ব'ল্‌বে, তোমার মনে তার জন্য এক বিন্দু ক্ষোভ নেই! তাতেই কি আমি কিছু সান্ত্বনা পাবো? না, না—সে আরও যন্ত্রণা! তোমায় আমি নিখুঁত দেখ্‌তে চাই যে! মণীশের হৃদয় মমতাহীন,—এ কথা আমায় কে বিশ্বাস করাবে? আমার এ যন্ত্রণা যাবার নয়—এ পাপের ফল আমাকে ভুগ্‌তে হবেই।"

মণীশ কি বলিবে কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না। কমলার জন্য তাহার যে ক্ষোভ, কাকার মানসিক অবস্থার জন্য তাহা প্রায় চাপাই পড়িয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সুযোগ পাইলে একবার উঁকি দিতে চাহে মাত্র! কিন্তু এ কথা সে কেমন করিয়া এই স্নেহময় পিতৃব্যকে বুঝাইবে? নারী, বালক ও অজ্ঞকে কতকগুলা কথা সাজাইয়া বুঝান যায়; কিন্তু প্রবীণকে কে বুঝাইবে? সে কতবার খুড়িমাকে বলিয়াছে, হয় ত ইহা ভালই হইয়াছে! শচীর বাগ্‌দত্তার তাহারই সহিত সংযুক্ত হওয়াই উচিত ছিল। সে নিখিলনাথের নাম যদি শুনিত, তাহা হইলে গোড়া হইতে এত বড় ভুলটা ঘটিতে পারিত না! এই কথাটা দিয়া নিজের মনকেও সে ভাল করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল; নিজেকে বলিতেছিল, তুমি [illegible]বাতকতা-

করিতেছিলে, সে নয়,—সে ঠিকই করিয়াছে! কিন্তু তথাপি কি যেন একটা সংশয় জাগিয়া থাকে। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেই জন্মান্তর-রহস্যভেদ-সংবাদ মনে পড়ে। সেই মণিকর্ণিকার দৃশ্য চোখের সম্মুখে ভাস্বররূপে ফুটিয়া উঠে! নিজের কঠোর শপথ নিজের কর্ণ-পটহে তীব্র আঘাত করে। কিন্তু তাহার এ সব কথা বেশীক্ষণ ভাবিবার অবসর নাই। যে চারিটি চোখের অনিমেষ স্নেহ-সজাগ দৃষ্টি তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে, তাহারা তাহার হাসি মুখে এতটুকু ছায়াপাত দেখিলে এখনই শিহরিয়া উঠিবেন; তাই নিজেকে সে এতটুকু আমল দিতে সাহস করে না। তথাপি হায়, প্রকৃত স্নেহের কাছে কণামাত্র ফাঁকিও চলে না যে।

সে কহিল,—"আমায় কি আদেশ ক'রবেন, বলুন? আমি ত কখনও আপনার অবাধ্য হই নি।"

শিবনারায়ণ আর্ত্ত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিলেন,—"সেইজন্যই ত এত কষ্ট আমার, মণীশ! যদি তুমি আধুনিক কালের ছেলেদের মত হ'তে, যদি আমার 'পরে তোমার বিরক্তির ভাব দেখতেম, তাহ'লে হয়ত আমার পক্ষেও কৈফিয়ৎ খুঁজে পাবার থাকৃত; কিন্তু তা নও ব'লেই যে এ কষ্ট আমার অসহ্য হয়েচে। তুমি সংসারী হবে না,—ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাবে, কেমন ক'রে আমি তা দেখ্‌ব, মণীশ?"

"তবে আমায় আদেশ করুন—যাতে আপনি সুখী হন, তাই বলুন!"

শিবনারায়ণ এতক্ষণে এ কথায় যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আসন গ্রহণ [illegible] হইলেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তার পর

একটা সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঈষৎ শান্ত স্বরে কহিলেন,—“তাই বা কেমন করে বল্‌বো, মণীশ? সেদিন কাশীতে সার্ব্বভৌম মশায় যা বল্লেন, তার উপর তোমায় আর আমি কি বল্‌ব? একবার আমাদেরই জন্য তুমি নিজের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়েছিলে, তার ফলে এই মনস্তাপ! আবার জোর করে পাছে তোমায় অধিক অসুখের মধ্যে টেনে আনি, তাই ভয় হয়। তাঁর কাছে তুমি বলেছ, তুমি আমাদের আদেশে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ, কিন্তু যদি সে আদেশ না পেতে হয়, তাহলেই প্রকৃত সুখী হও! বিবাহে তোমার সুখের আশা মাত্র নাই।—আমি তোমায় প্রকৃত সুখী দেখতে চাই। আমার সুখ কিসে, সে কথায় কাজ কি! তুমি কিসে সুখী হবে, তাই আমার প্রয়োজন! লোকে এতে আমায় আরও নিন্দা করবে, জানি, কিন্তু লোকের কথা বড় নয়, তোমার সুখই আমার সব চেয়ে বড়। সত্যই কি মণীশ, বিবাহে তুমি সুখী হবে না? কৌমার ব্রত গ্রহণেই সুখী হবে, মনে কর? ভাল করে ভেবে বুঝেই কি এই স্থির করেছ? বল, আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাতে ত কেউ কারুকে কোন দিন সঙ্কোচ করিনি, শুধু তুমি আমার সন্তান নও, উপযুক্ত সন্তান, শাস্ত্রমতে বন্ধু—”

মণীশ নত নেত্র তুলিয়া চাহিল। তাহার সমস্ত হৃদয় স্থির গাম্ভীর্য্যে অকস্মাৎ যেন সম্মোহিত হইয়া পড়িল। সে সুদৃঢ়ভাবে অকপটে কহিল,—“যখন অনুমতি করচেন, তখন বলাই সঙ্গত। যদি আপনি আর খুড়িমা মনে কোনও ক্ষোভ না রাখেন, তা হলে আমি চিরকৌমার ব্রতই নিতে চাই। সত্যর সন্তান আমাদের বংশ রক্ষা করবে। শুনেছি, শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মচারী বা অবিবাহিত যদি সন্তান

স্থানীয় বহু শিষ্যের শিক্ষকতা দ্বারা তাদের উন্নত করতে পারেন, তাহ'লে তাঁদের গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালনও ঘটে। আমার ইচ্ছা, আমি এইরূপে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করব, বিবাহে আমার যথার্থই বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। তবে আপনার ইচ্ছাই আমার সব।"

"তবে তাই হোক, তোমার সুখে ব্যাঘাত দেব না। কিন্তু তোমার খুড়িমা যে কখনও এ দুঃখ ভুলতে পারবেন, তা মনে হয় না। সত্যর বিয়ের কথা শুনে অবধি তিনি আরও কাতর হয়ে উঠেচেন। আমার কথা স্বতন্ত্র।"

শিবনারায়ণ চলিয়া যাইতে না যাইতে সত্য আসিয়া কহিল,— "দাদা, আমার উপর এ কি অবিচার করচ তুমি—সে হবে না।"

মণীশ মুখ ফিরাইল, কহিল,—"কি করেছি?"

"এই, এই,—তুমি ত জানো? সে হবে টবে না, বলে রাখলাম! বেশ মজা ত! নিজে আইবুড় থাকবে, আর আমায় বুঝি এম্‌নি করে,—না যাও, কথ্‌খনো আমি তা শুন্‌চি নে।"

মণীশ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া সত্যকে কাছে টানিয়া লইল হাসিতে হাসিতে বলিল,—"বলিস্ কিরে! গৌরী যে, সেই গৌঃ—গাবৌ—"

"হোক্‌গে, হোক্‌গে আমার দরকার নেই তাকে। আমি বিয়ে করবো না। তুমি যা করবে, আমি কি জন্যে তা করতে পাব না, বল ত?"

সত্যর চোখ দুইটা আর্দ্র হইল, ও ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। সহসা সে মুখ ফি[illegible] লইল। মণীশের দুই চোখে সহসা হু হু করিয়া একটা বন্যার বেগ ছুটিয়া আসিতে চাহিল, সে

তাড়াতাড়ি সেটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়া ভাইয়ের আরক্ত মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"আমরা বল্‌চি বলে।"

"তোমায় কি কেউ কিছু বলেনি?—বেশ ত, আমি ত আর তোমায় বিয়ে করতে বলচিনে! তুমি আমি দুজনেই এক রকমে জীবন কাটাব। আমি কি এখন তেমনি অবাধ্য অমনোযোগী আছি যে তোমার কোন কাজেই লাগতে পারিনে?"

আর সামলানো গেল না। এবার দুইজনের রুদ্ধ অশ্রুই দুই দিক হইতে ঝরঝর করিয়া এক-সঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। অবরুদ্ধবাক্ সত্য কাঁদিয়া দাদার কোলে মুখ গুঁজিল; কহিল,—"দাদা, আমি কি শুধু তোমার পড়ানোর ছাত্র! দুঃখের অংশী কি নই? তবে কেন তুমি যে পথ নিজের জন্য ঠিক করেচ, সে পথে আমায় স্থান দিচ্ছ না?"

গভীর আনন্দে মণীশের চিত্ত জোয়ারের সমুদ্রের মতই স্ফীত হইয়া উঠিল। সে পরমানন্দে ভাইটীর মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া সকরুণ স্নেহে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল,—"তা যে হ'তে পারে না, সতি! তুমি যদি এ দায়িত্ব বহন কর, তবেই আমার মুক্তি হয়। কেন না, পিতৃপুরুষের কথা ত ভুললে চল্‌বে না, নিজেই ত সবটা নই। তুমি তোমার দাদাকে সুখী করবার জন্য তার আদেশ পালন করবে,—কি বল?"

ক্ষণপরে অস্ফুটস্বরে সেই উদ্ধত অবাধ্য বালক উত্তর দিল,—"তুমি যদি তাতেই সুখী হও দাদা,-ত[illegible]কি আমি না বলতে পারি?"

৫০

সত্যর বিবাহ। বিবাহে সমারোহ যথেষ্ট হইল; কিন্তু সুখ হইল না। শিবনারায়ণ চেষ্টা করিয়াও মানসিক গ্লানির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কমলার প্রত্যেক স্মৃতি আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়া করুণাময়ীকেও যেন দগ্ধাইতে লাগিল। সকল উদ্যোগ-আয়োজন যেন শোভাহীন নিরানন্দ ঠেকিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতেছিল, কাহাকে না আনিয়া এ কাহাকে আনা হইতেছে! উঠিতে বসিতে গভীর নিশ্বাস বুকের মধ্য হইতে যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনি করিয়া বলিতেছিল,—"মা কমল, আমার এ কি করে গেলি, মা! আমায় এ কি শাস্তি দিতে এসেছিলি?"

কিন্তু যাহার জন্য এ পরিবারের সকলে অসুখী, তাহার আজ সুখের সীমা নাই। সে আজ যেন দশটা হইয়া খাটিতেছে। যেখানকার যত চাষা-ভূষা, দরিদ্র, আতুর, আজ সে তাহাদের সকলেরই অভিভাবক। কলিকাতা হইতে নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আসিয়াছে। পায়রা-ডাঙ্গার ছেলেগুলি জড় হইয়াছে, এখানকার পাড়া-প্রতিবাসীদের ত কথাই নাই। এই প্রকাণ্ড দলটি খাইতেছে যত, খাটিতেছেও ততোধিক। মণীশের একটি অঙ্গুলি-হেলনে ইহারা বোধ হয় আগুনে জলে ঝাঁপ দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। সকলেই কত বিষয়ে তাহার কাছে ঋণী, তাহার ঠিক নাই। বিবাহের বরটিও কোমর বাঁধিয়া সকলের পরিচর্য্যায় লাগিয়া গিয়াছিল। [illegible] তামাসা বিদ্রূপ করিলে সে বলিতেছিল,—"কি করব, দাদা খাটবেন, আর আমি বসে থাকবো?"

দাদার সুখ-দুঃখে সত্য এখন নিজের সকল সুখ-দুঃখ নিমজ্জিত করিয়াছে। নদী আসিয়া পারাপার মিলিয়াছে।

এ বিবাহে ব্রাহ্মণসজ্জন, অনাথ-অতিথের উপর যতটা খরচ করা হইল, বাহ্যিক ধূমধাম ততটা কিছুই হইল না।

গাত্র হরিদ্রা হইয়া গেল। বরানুগমনের সকল উদ্যোগ প্রস্তুত, রাত্রি-শেষে নান্দীমুখ। সহসা অপরাহ্ণে নন্দকিশোর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার লজ্জা-কুণ্ঠিত মুখে ঘোর অপরাধ সূচিত হইতেছিল। আদর-আপ্যায়নের সহিত ভাবী বৈবাহিককে বসিতে আসন দিয়া শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যে এ সময় ?"

নন্দকিশোরের কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল। মৃদুস্বরে তিনি কোন মতে কহিলেন,—"কি আর বলবো! আপনাদের কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্চে—এই দেখুন আজই এই পত্র পেলাম—"

সে পত্র এইরূপ—

"মিরাট—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার নিকট হইতে আসিয়া আমি বৈদ্যনাথ, কাশী হইয়া কানপুরে দুই দিবস যাপন করিয়া অবশেষে এইখানে আসিয়াছি। প্রথমে মনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এখানে আসিবার পর সহসা একটা কৌতূহল জন্মিল। যে মেয়েটিকে আপনার নিকট দেখিলাম, সেটি অসামান্যা সুন্দরী; কিন্তু আমার স্ত্রী শ্যামাঙ্গিনী ছিলেন। হয়ত কিছু [illegible] দিতে পারে, এই সন্দেহে আমি আপনার গৃহের দাস দাসীগণের অনুসন্ধান আরম্ভ

করি। রুক্‌নিয়া নামে এক দাসীকে আমি চিনিতাম সে-ই আমার মেয়েটিকে পালন করিতেছিল। অনেক অনুসন্ধানে তাহার সংবাদ পাই। সে এখন কাজ ছাড়িয়া এখান হইতে সাত ক্রোশ দূরে দেহাতে ঘরে বসিয়া আছে। সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম. তাহা এখন লিখিতেও লজ্জা পাইতেছি, অথচ না জানাইলেও নয়। গৌরী বলিয়া আপনারা যাহাকে জানেন, সে যথার্থ গৌরী নয়। সে বাস্তবিক আপনারই কন্যা। আমার কন্যা গৌরী মারা গিয়াছিল। কাপড়গুলা বোধ হয় তাহারই। তাই এই ভয়ঙ্কর ভ্রমে আমি আপনার শান্তিপূর্ণ গৃহে বিপ্লব বাধাইয়া আসিলাম। কি আর বলিব? আপনি সুধী ব্যক্তি, এ ঘটনার নীর ত্যাগ করিবেন।

কুশলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষাল।"

পত্র পাঠান্তে শিবনারায়ণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কহিলেন,—"এখন উপায়?"

নন্দকিশোর নতশিরে বসিয়া রহিলেন। লজ্জায় তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। কি বিশ্রী কাণ্ডটাই তিনি হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় ঘটাইয়া বসিলেন! দুইদিন ভাল করিয়া ভাবিলেও হইত ত!

কিন্তু বিধাতা আপনি যেখানে ঘটক, সেখানে বিবাহ বন্ধ হয় না। ভোরের সময় যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট হইতে সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম আসিল, তখন কর্ত্তব্য-বিমূঢ় বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার মুখে রক্ত ফিরিয়া আসিল। তিনি লিখিয়াছেন,—"রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ চলিত না থাকায় সমাজের ক্ষতি ভিন্ন লাভ

হইতেছে না। আপনি প্রজাপতি সেই বাধা সমাজ হইতে দূরিত করিবার জন্যই এই নাট্যাভিনয় করিলেন। ইহা দেখিয়াও কি তোমরা এখনও ইহাতে দ্বিধা করিবে? ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া ঈশ্বরের আদেশ কোন্ বিষয়ে কবে প্রচারিত হইয়াছিল? গৌরী ও সত্য পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট। ইহাদের পবিত্র বন্ধনে সামাজিক অকল্যাণ দূর হইবে।”

এ যেন অলঙ্ঘ্য দেবাদেশ! শিবনারায়ণ কহিলেন,—“কি বল বৈবাহিক?”

“আমার মনে ত কোন দ্বিধাই নাই।”

নন্দকিশোরের উত্তরে প্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া শিবনারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; কহিলেন,—“আমারও বিন্দুমাত্র না। সার্ব্বভৌম মশায়ের চেয়ে শাস্ত্রাচার কি আমরা বেশী বুঝি? ঋষি-প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ধর্ম্ম ঋষিদ্বারা সংস্কৃত হইবে। আমরা ইহাকে গড়ি নাই, ভাঙ্গিবও না! তুমি সম্মত আছ, মণীশ?”

মণীশ সাগ্রহে উত্তর করিল,—“সর্ব্বান্তঃকরণে।”

বিবাহ হইয়া গেল। নন্দকিশোর অবশ্য তেমন করিয়া মেয়েলি কান্না কাঁদিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মন তেমনি সুখে দুঃখে একটা অব্যক্ত কান্না কাঁদিতেছিল। মণীশকে ডাকাইয়া তিনি বলিলেন,—“মেয়েটি আমার একটু চঞ্চল, তুমি ওর সব ত্রুটি শুধরে নিও।”

মণীশ মৃদু হাসিয়া কহিল,—“আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। আমরা ওঁকে আপনার চেয়েও বেশী চিনি।” কত দিন ছিপ কাড়িয়া লইয়া ভৎর্সনা করিয়াছে; কত দিন অপক্ক ফল হাত হইতে

ফেলিয়া দিয়াছে, সেই সব স্মরণ করিয়া, সে নবদম্পতীর পানে চাহিয়া একটু স্নেহের হাসি হাসিল। সেই দুরন্ত বাল্যসঙ্গী দুইটি আজ নম্র শিরে লজ্জাবনত মুখে চিরসঙ্গীরূপে আবদ্ধ-করে দাঁড়াইয়া। মণীশের দৃষ্টি গভীর আনন্দের জলে ঈষৎ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

ফুলশয্যার গভীর রাত্রে নিদ্রিতা বধূকে জাগাইয়া সত্য কহিল, "তোমায় একটা কথা বলি গৌরি, সব-চেয়ে দরকারী কথা,—তাই সব-আগেই বলচি। আমার দাদাকে তুমি খুব ভক্তি করো, তিনি যেন কখনও তোমার উপর এতটুকু অসন্তুষ্ট না হন।"

গৌরী অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু কথাগুলার ভাবে ও স্বরে যেন একটু থমকিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ অনুভব করিল, যে সত্যর জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া ফিরিতেছিল, এ সত্য যেন সে সত্য নয়। একটু ভীত হইয়া বিস্ময়ও সে বোধ করিল—মানুষ এত বদল হয়! নিজেও যে সে অনেকটা বদলাইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। এ গম্ভীর প্রতিজ্ঞার অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলেও ইহাদ্বারা সম্মোহিত হইয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিল,—"আচ্ছা!"

মণীশের ত্যাগ, মণীশের মহত্ত্ব, মণীশের স্নেহ, তাহার স্নেহাধার ভাইয়ের মনে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। পুত্রের মধ্যে শিব-নারায়ণই যেন পুনর্জাত হইয়াছিলেন। এমনই করিয়া মানুষ অমরত্ব লাভ করে, ইহাই বংশ-গৌরব!

৫১

বৃক্ষরোপণান্তে সারা বৎসর ধরিয়া জলসেকাদি দ্বারা তাহাতে একটি দুইটি করিয়া কতকগুলি ফুল ফুটাইলে সেই ফুলে-গাঁথা মালাগাছি কণ্ঠে ধারণমাত্র যদি তাহার মধ্য হইতে একটা অতি বিষাক্ত কীট বাহির হইয়া বক্ষে দংশন করে, তাহা হইলে মনে যেমন একটা বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবের সহিত ক্ষোভের ধিক্কার উঠে, ফুলশয্যার রাত্রে নবপরিণীতার ব্যবহারে শচীকান্তর চিত্তেও ঠিক সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। বাহিরের ঘরে চৌকিতে বসিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া যতই সে এ ভাবনাকে প্রতিকূল যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন চেষ্টা করিতেছিল, ততই যেন সেগুলাকে ক্ষুরধারে কাটিয়া এই মর্ম্মদাহকারী দুশ্চিন্তা আপনাকে অক্ষয় কবচে আঁটিয়া তুলিতেছিল। পাষাণে প্রাণ সঁপিয়াছিল, এমন মূর্খ সে! এই কল্পনার স্বর্গ! এই কমলা! হায় সুন্দর, তোমার অন্তরে বাহিরে কি সকল সময়েই এমনি প্রভেদ?

মনকে বাঁধিবার কোন সূত্র ছিল না। তথাপি হাল ছাড়িলেও চলে না। অপ্রিয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখানা সংবাদ-পত্র টানিয়া লইল এবং তাহারই উপর সে চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু হায়, মনকে কে ফিরাইবে! সে যে দেশের ছোটলাট, বড়লাট, এমন কি মন্ত্রিসভা, সসাগরা ভারতের একচ্ছত্রা অধীশ্বরীরও কোন সংবাদ আমলে না আনিয়া নিজের কান্নাই কাঁদিতে চাহে। সহসা—এ কি! এ কি সংবাদ! সে হাতের কাগজখানা তুলিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল। ইহাও একটা ইন্দ্রজাল, না, অপর সকল ঘটনারই মত বাস্তব! বড় বড় অক্ষরে ভিতর দিকে শেষ [illegible]মে একটা

বিজ্ঞাপন রহিয়াছে– "করালীচরণ,—কমলাকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনো। যাহা চাহ দিব, অঙ্গীকার করিলাম।" নীচে সাঙ্কেতিক অক্ষর যাহা আছে, তাহাতে 'শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' নামটি অনুমান করা অসঙ্গত হয় না।

কাগজখানা ভূমিতে ফেলিয়া শচীকান্ত আহত কাতর দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিল! একে একে সকল সান্ত্বনাই যে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে! মাথার উপর একটা অপরাধের গুরু ভার স্বতই যেন নামিয়া আসিতেছিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, মাঠাকুরাণী ডাকিতেছেন।

এখন? এ অসময়ে? কেন?

গিরিজাসুন্দরী গৃহমধ্যে একাই ছিলেন; প্রবেশ-পথে অধো-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া ভক্তিনাথ! বজ্রপাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াই শচী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এ সময় যে একদিন নিশ্চয় আসিবে, ইহা সে জানিত এবং এই সময়টা যত বিলম্বে আগমন করে ততই মঙ্গল, মনে মনে ক্রমাগত এইরূপ প্রার্থনা থাকিলেও যতক্ষণ না আসিতেছিল, ততক্ষণ সে মনের মধ্যেও শান্তি পাইতেছিল না।

ঝড়ের পূর্ব্বে আকাশে বাতাসে নদীতে যে ভাব ব্যক্ত হয়, মানুষের মনের মধ্যে ঝড় যখন আসন্ন, তখন তাহারও বাহিরটাকে ঠিক তেমনি নির্ব্বাত নিষ্কম্প দেখায়। মাসিমা কহিলেন,—"তুমি যাকে বিয়ে করেছ, সে মেয়ে চাকদায় থাকত?" তাঁহার স্বর স্থির, গম্ভীর, ধর্ম্মাধিকরণের বিচার-পতির স্বরের মতই। অপরাধী কহিল,—"হাঁ।"

"সে গাঙ্গুলীদের মণীশের বাগ্‌দত্তা ?"

"না, সে বাগ্‌দান যথার্থ বাগ্‌দান নয়, তার বহু পূর্ব্বে এর ভাই আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাগ্‌দত্ত হয়েছিলেন!"

"তবে যথার্থই ও মেয়ে রাঢ়ীশ্রেণীর, তুমি স্বীকার করলে ?"

পতনোন্মুখ অশনি এবার গর্জ্জিয়া উঠিল। মাসিমা কহিলেন, "হতভাগা ছেলে, এই করতে তুই আমার কাছে এসেছিলি! সভার মাঝখানে আমার মুখখানা একেবারে পুড়িয়ে দিলি!"

আত্মসম্মানে পূর্ণদৃষ্টি জমিদার-গৃহিণীর দুই নেত্রে আগুনের হলকা ছুটিয়া গেল। "কত বড় বংশের বংশধর তুই,—কি মহাপুরুষের সন্তান, তা একবার ভাবলি নে! এত বড় একটা দাগ,—মহাপাতক একটা ছেলেখেলার মত অনায়াসে করে গেলি! তুই আমাদের সেই শচী? দুধের ছেলে তুই, তোর মধ্যে এত বড় প্রবঞ্চনা, এ কি ভাবতে পারা যায়!"

রুদ্ধকণ্ঠে সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। মাতৃহৃদয়ের নারী-হৃদয়ের সমস্ত বেদনা হতাশা এককালে ব্যাকুল বেগে তাঁহার রোষানল-উত্তপ্ত বুকের মধ্যে আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। নির্ব্বাক্ অভিমানে তখন তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন রত্নপুকুরের অবস্থা বলিবার নহে। পল্লীগ্রামের দলাদলি যাঁহার জানা আছে, এমন একটা কাণ্ডে সেখানকার অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে, কেবল তাঁহারাই তাহা ধারণা করিতে পারিবেন। বৌভাতের যজ্ঞ দেখিতে দেখিতে দক্ষ যজ্ঞের

আকার ধারণ করিল। গৃহিণীর বহু যত্নেও এ ঘটন শত সহস্র কর্ণে ছুটিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই!

তখন ভোজন-রতগণ ভোজ্য দ্রব্য সকল চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া ঘোর রোলে উঠিয়া পড়িল। রান্না ঘরে বড় বড় হাণ্ডায় ডাল ভাত পুড়িয়া তীব্রগন্ধে দশদিক ভরাইয়া তুলিলেও তাহা নামাইবার প্রবৃত্তি কাহারও হইল না। অনেকে সহর্ষে লুণ্ঠন-কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিয়া গেল,—বারণ করিতে কেহ নাই। ভদ্র, অভদ্র, বালক, বৃদ্ধ, মেয়ে, পুরুষ একসঙ্গে সকলে মিলিয়া কেবল একই ঘোঁট, ঐ একই কথা। দেখিতে দেখিতে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে কমিটি বসিল, ছড়া বাঁধা হইল, রাস্তায় রাস্তায় এই অপূর্ব্ব মিলন সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল, জমিদার-বাড়ী ও সে বাড়ীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একঘরে করা এক-বাক্যে সাব্যস্ত হইয়া গেল।

দেশটা যখন হাস্যে রহস্যে কুৎসায় ভাসিতেছিল, কর্ম্মগৃহের মধ্যে তখন অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতার তালে এক মহাবিচ্ছেদের সূচনা জাগিয়া উঠিতেছিল। ক্ষীর, দধি, মৎস্য, পায়স, ব্যঞ্জন টকিয়া পচিয়া একটা অসহনীয় গন্ধে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত ভরিয়া তুলিতেছিল। যাদুমন্ত্রে পাষাণে পরিণতবৎ উৎসবানন্দময় গৃহ গম্ভীর নিস্তব্ধ। যে যেখানে আছে, যেন গঠিত মূর্ত্তিবৎ জমিয়া আছে। প্রাণের স্পন্দন চলিতেছে, অথচ শরীরে যেন প্রাণের কার্য্য নাই। সকলেই যেন রুদ্ধশ্বাসে কাহার মৃত্যুশয্যা ঘেরিয়া তাহার শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমনি ধরণ!

গিরিজাসুন্দরী হরচন্দ্রকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"দোষ সবারই! শুধু এখন ওকে দুষলেই না হবে কেন? বিয়ে দিয়ে আনলে

কোন্ বাড়ী থেকে, তার খবরটুকুও কেউ নিলে না! এইজন্যই বলে, বুড়ো হলে সংসারে থাকতে নেই। এখন এর বিহিত কি স্থির করলে কেউ?"

এই বিষয়েই এতক্ষণ পরামর্শ চলিতেছিল। উপায় স্থির না করিয়াও কেহ নিশ্চিন্ত ছিল না, কেবল মুখ ফুটিতেই যা একটু বাধিতেছিল। এখন ভরসা পাইয়া পুরাতন ভৃত্য মাথা চুলকাইয়া বলিল,—"ব্যাপারটি ত বড় সোজা নয়। গড়িয়েও গেল অনেকখানি—"

"ভূমিকার দরকার নেই, যা হয়েচে, তা তুমিও দেখছ, আমিও দেখতে পাচ্চি। যা হবে সেইটেই এখন সবাই ভাবো।"

"হবে,—হাঁা, তাই ত ভাবা হচ্চে—তা আমি ওঁদের ও ঘরে ডেকে আনচি।"

হরচন্দ্র সরিয়া পড়িল। বাড়ীর গৃহিণীর সম্মুখে উপস্থিত থাকা যে এখন তেমন নিরাপদ নহে, তাহা সে এতদিনের অভিজ্ঞতায় ভাল করিয়াই বুঝিত। পরক্ষণে বাসন্তীর মাতামহ, শিশিরের পিতা ও দেশের গণমান্য দলপতি ও পরামর্শদাতাগণ বিবিধ ছন্দোবন্ধে অন্তরালে সমাগতা গৃহিণীকে জানাইলেন যে তাঁহার ঘরের কলঙ্ক নিজেদেরই মনে করিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহারা চুপ করিয়া আছেন কিন্তু এত বড় কাণ্ডটাকে ত তাই বলিয়া চাপিয়া যাওয়া চলে না, তাহাতে সমাজ যে একেবারে উৎসন্ন যাইবে। এখন অবহিত হইয়া যত-শীঘ্র-সম্ভব এ কলঙ্কের দাগ ধইয়া নির্ম্মল হওয়া প্রয়োজন। বিধান-জিজ্ঞাসায় কহিলেন, "যা সব চেয়ে সোজা।

ঐ কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া শচীকান্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত-পূর্ব্বক স্বঘরে বিবাহ করুন, সকল গোল মিটিয়া যাইবে।"

গিরিজা একটু নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটার দশা কি হবে?"

"ঐ রাঢ়ীর মেয়ের! কি আর হবে? বাপের ঘরে গিয়ে থাকুক। কোন্ ভাল কুলীনের ঘরের মেয়ে রাঢ়ী-বারেন্দ্রের ঘরে শ্বশুর-ঘর করেছে!" মাসিমা ভাবিলেন, হায় শচি, অভাগিনীর জন্মটাই খোয়াইয়া দিলি! কি করিলি রে! কিন্তু এ-ভিন্ন উপায়ই বা কি? গোপনে উহার খোরপোষের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিব, কিন্তু ঘরে ত লওয়া চলে না, সমাজ যে আগে।

বাসন্তীর মাতামহ এ দলের অগ্রণী। শচীকান্তর উপর ক্রুদ্ধ হইবার তাঁহার কারণও আছে। মনের মত বর যখন স্বঘরে পাওয়া যাইতেছে না, তখন এই বর্জ্জন-কার্য্যটা সমাধা করাইয়া ছান্‌লা-তলার বন্দীশালায় এই অবাধ্য যুবককে বাঁধিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তিনি প্রস্তাব করিলেন, "এ সকল কার্য্যে বিলম্ব অবিধেয়। প্রত্যূষেই রাঢ়া কন্যাকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে শচীকে একবার ডাকাইয়া কথাবার্ত্তা স্থির করা হউক।"

এ যুক্তিতে সকলেই সায় দিলেন।

পাশের ঘরে পদশব্দ শুনা গেল। শচী প্রবেশ করিল। না জানি, ঘৃণায় লজ্জায় তাহার মনের মধ্যে কি রকমটাই হইতেছে! গিরিজা কবাটের কাছে একটু সরিয়া আসিলেন।

সে যে বড় অভিমানী! এত লোকের বিচার-দৃষ্টি সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

বিজ্ঞ বিচারপতিগণ যথেষ্ট ভূমিকা-সহ বক্তব্য বিষয়টি প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "তুমি যা করেছ, এমন কেউ কখনও করেনি, কানেও কখনও শোনা যায় নি! কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। হা-হতোস্মি করলেও আর যা হয়েছে, তার বদল হবে না। এখন এর একমাত্র উপায়—ভ্রান্তি মিটিয়ে নেওয়া। ঐ কন্যাটিকে পরিত্যাগ করে রীতিমত প্রায়শ্চিত্তের পর পুনর্ব্বার দার গ্রহণ করলেই সকল দোষ খণ্ডন হয়ে যায়। আর সে ঘটনা যত শীঘ্র ঘটে, ততই পাপ কম। এই ভোরের ট্রেণে হরচন্দ্র ঐ রাঢ়ী কন্যাকে যথাস্থানে রেখে আসুক। পঞ্জিকায় প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহের দিন দেখা যাক। এ পুণ্যাহ মাস, শুভদিনের অভাব হবে না। কি হবে! ছেলেমানুষ,— বয়সের গরমে একটা অন্যায় কাজ করেছে, তা এক রকম করে শুধরে দেওয়া যাবে। এত আর পরের ঘরের কথা নয়—।"

গিরিজা উত্তর শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন—সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, "না।"

চমকিয়া উঠিয়া তিনি গৃহভিত্তির উপর দেহভার রক্ষা করিলেন। সকলে কহিল, "কি! না! ত্যাগ করবে না?"

"না।" শচীকান্ত কহিল, কি অপরাধে ত্যাগ করব, বলে দিন।"

"অপরাধ? প্রথম সে রাঢ়ীশ্রেণী, দ্বিতীয় অন্যের বাগ্‌দত্তা, তৃতীয় উন্মাদগ্রস্তা, এর প্রত্যেকটিই ত্যাগের শ্রেষ্ঠ কারণ, শাস্ত্র আর আইন-সঙ্গত।"

শচী কহিল, "আমি জানি, সে উন্মাদ নয়। তারপর সে আমারই বাগ্‌দত্তা—এ প্রমাণ আমার বাবাকে পত্র লিখলেই জানবেন। প্রথম বাগ্‌দান আমার বাবার অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গেই হয়। তারপর রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। পথের দুর্গমতার ভেদ-বাধা ঘুচোবার সঙ্গে সঙ্গে এ ভেদবাধা কেন না দূর হবে!"

"তুমি চালাবে না কি! অত বড় ভট্টনারাণই পারলেন না, তুমি ত তুমি! শাস্ত্রে আর দেশাচারে সর্ব্বত্র মিল থাকে না। শাস্ত্রের চেয়েও কুলপ্রথাকে এ দেশে বড় করে দেখা হয়। রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিবাহ দোষের না হতে পারে, কিন্তু তা অপ্রচলিত।"

তর্ক চড়িতেছে দেখিয়া শচীর জিদও চড়িল। সে কহিল, "প্রথম ইংরেজি শিক্ষার আমলে ছেলেকে কেউ বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে চাইত না, ট্রেণে চাপত না, কলকাতায় যেত না, ডাক্তারী শিখত না, এখন এ সব দেশাচার হয়ে গিয়েছে। যা অন্যায় নয়, পাপ নয়, বরং সমাজের পক্ষে শুভ, তা প্রচলিত করবার জন্য প্রথমে দু-এক জনেই চেষ্টা করে, আর তার জন্য পীড়িতও হয়! এ অনিবার্য্য। আমি জানি, আমি ঠিকই করেচি। কমলা আমারই প্রথম বাগ্‌দত্তা।" কি নির্লজ্জ! হা রে শিক্ষাগর্ব্বিত আধুনিক ছেলে! গুরু লঘু জ্ঞানও বিধাতা তোদের নিকট হইতে হরিয়া লইয়াছেন! বুড়াদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতে সঙ্কোচও বোধ হয় না! বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ চিত্তে বিচারকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে তুমি তোমার এই অসিদ্ধ বিবাহের পত্নীকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নও?"

"সে আমার ধর্ম্মপত্নী।"

"বেশ, ধর্ম্মের অর্থটা ভালই হৃদয়ঙ্গম করেছে!" গৃহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল।

শচী কহিল, "আমাকে আর কিছু বলবার আছে?"

"তোমায় আর কি বলবো! তোমার মাসিমাকে এই বলবার আছে যে যদি তিনি তোমার 'ধর্ম্মপত্নী' সমেত তোমার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন, তাহলে এ ঘরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত! আমরা শাস্ত্র সমাজ লোকাচার সবই মেনে থাকি। এখনও ততদূর আলো পাই নি ত!"

অপরাধীর আহত বক্ষ ফাটিয়া স্বর বাহির হইল, "তাই হোক্।"

রাত্রি হইয়া আসিল। বাহির ও ভিতরের গোলমাল কিছুই কমিল না। আপন গৃহের মধ্যে বহুক্ষণ পদচারণা করিয়া শচীকান্ত এই কিছুক্ষণ-মাত্র বিছানায় আসিয়া শুইয়াছে। ঘুমাইবার ইচ্ছা ছিল না, চলিবার শক্তি হ্রাস হইয়াছিল মাত্র। যে প্রতীক্ষিত কালের জন্য প্রভাতে মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সে ব্যাকুলতা এখন আর নাই। মন এখন জ্যোৎস্নামধুরা যামিনীর সুখ-শয়ন ছাড়িয়া বন্ধুহীন প্রবাসের অসহায় অবস্থা-স্মরণে শুকাইয়া উঠিতেছে।

ইহার মধ্যে অনেকখানি ঘটিয়া গিয়াছে। মাসিমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কথাবার্ত্তাও হইয়াছে, উপসংহার ভালরূপ হয় নাই। কমলাকে গৃহে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, এ কথা সে-ও বুঝে। কিন্তু ইহার মীমাংসা মাসিমাও ঐ একই রূপে করিতে চাহেন! শুধু ভরণ পোষণ-ভার! হায়, তাঁহারা যদি বুঝিতেন! শেষকালে

তিনি কাঁদিয়া উঠিয়া গেলেন, বলিলেন, "তুই যদি এমন করে আমার মায়া কাটাতে পারিস্, তবে আমিই কি আর পারিনে? আমার এ পোড়া প্রাণে সবই সয়। যা তোর ধর্ম্ম হয়, কর্!"

সে এ বেদনা-দিগ্ধ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। প্রাণে কিন্তু বড়ই বাজিয়াছে। মাসিমার স্নেহ, তাঁহার অপরিসীম করুণা মঙ্গল-কবচের মতই এতদিন তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। এতখানি সে আর কোথায় পাইত? সেই মাসিমা আজ কাঁদিয়া তাহাকে বুকে টানিতে চাহিতেছেন, তবু সে বাহুপাশ কাটিতেই হইবে! বড় পাষাণের কাজ এ!

অতি ধীরে কে গৃহে প্রবেশ করিল। শচী চাহিয়া দেখিল, কল্যাণী! "দাদা"! মুহূর্ত্তে সে আসিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইল, কাঁদিয়া বলিল,—"দাদা, আমাদের সকলের মায়া কাটাবে, দাদা?"

এবার পাষাণ টলিল, বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া তাহার মস্তকে পতিত হইল। সহানুভূতিহীন এ সংসারে এই একটি করুণার উৎস, কঠোর বিচার-দৃষ্টির বাহিরে একটিমাত্র স্নেহশীতল দৃষ্টি। এ যে অপার্থিব ধন! ছোট বেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার চিরসৌহার্দ্দের কত কথা তাহার ঝটিকা-উদ্বেল বক্ষের মধ্যে উঠিতে পড়িতে লাগিল। ক্রন্দন-জড়িত স্বরে কল্যাণী কহিল,—"দাদা, সত্যি যাবে?"

"কি করি, কল্যাণ, বলে দে না?"

"দাদা!"

"কলি, তুইও কি ওই কথা বলবি? ও ছাড়া আর কোন দণ্ড তোরা আমায় দিতে পারিস্‌নে?"

কল্যাণী মুখ তুলিল কহিল,—"না দাদা, ও কথা আমি বলি না, কিন্তু কেন এমন হ'ল, দাদা! এ কি করলে?"

"আমায় আর বকিস্‌নে, কল্যাণি! আমি আর বরদাস্ত করতে পারচিনে। সবাই মিলে আর বলিস্‌নে, আমি পাপ করেচি। এর আর একটা দিকও ত আছে। সমাজের কুপ্রথা-চ্ছেদ, সত্যপালন, অনাথার প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতিকার, এগুলো কি সত্যই এত তুচ্ছ? সেই দিক দিয়েই না হয় কেন বিচার কর্‌ না তোরা? আর যে যা বলে, বলুক, শুধু তুই বল্‌ যে, না, তুমি পাপ করনি, তোমার বাগ্‌দত্তা বউ তোমারই।"

৫১

আকস্মিক বজ্রাঘাতে বিহ্বলতা জন্মায়, কিন্তু সেই বিদ্যুদগ্নি যখন লোল রসনা বিস্তৃত করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসে, তখন মুহূর্ত্তেই সে জড়তা ঘুচিয়া যায়। কমলা চুপ করিয়া বসিয়া সবই দেখিল, কানের কাছে যাহা পৌঁছিল, সে সকল কথাই শুনিল। কিন্তু ইহাতে তাহার মধ্যে বড় একটা ভাবান্তর ঘটিল না। সে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে! কোন বিষয়ে ভাল-মন্দ বুঝিবার শক্তি তাহার কোথায়? এ বাড়ীতে এই রহস্যময় অভিনয়ের অভিনেত্রীরূপে আজ সে সহস্র কৌতুক দৃষ্টি ও শত ব্যঙ্গপূর্ণ রসনার লক্ষ্য! বিদ্রূপ, কুৎসা, অভিশাপ ধারা কারে তাহার মস্তকোদ্দেশ্যে বর্ষিত হইতেছিল, তাহাতে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

কিন্তু যখন আশপাশের লোকেরা ঘটনার পরিচয় দান করিতেছিল, তখন সহসা সে চমকিয়া উঠিল। কি যে ঘটিয়া

গিয়াছে, এতদিনের পর সেই মুহূর্ত্তে সে যেন তাহা প্রথম অনুভব করিল। তাহার লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া বহু পূর্ব্বকার কি যেন একটা ঘটনাকে স্মৃতপথে টানিয়া আনিতেছিল। আবার ভক্তি-নাথের গৃহে, নৈহাটি ষ্টেশনে—সেই অর্দ্ধোচ্চারিত তাহারই নাম—এ সবই যেন একটা ধারাবাহিক ঘটনার সামঞ্জস্য রাখিয়া আসিয়াছে। আর কে এই তাহার জীবনের শনিগ্রহ! সে না কি কাশীর সেই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের—তাহার আরাধ্য দেবতার আত্মজ! ইহার চেয়ে অঘটন ঘটনা কি আর কিছু ছিল না!

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে কল্যাণী আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া গাঢ়স্বরে ডাকিল,—"বউ!" এ কি সম্বোধন! কমলার মনে হইল, এত বড় পরিহাস তাহাকে আর কেহ কখনও করে নাই। সে কোন্ গৃহের বধূ! উত্তর না পাইয়া ননন্দা অধিকতর স্নেহে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল, মুখখানা বুকের উপর চাপিয়া কহিল, —"বুঝেছি বউ, তুমি কেন যে অমন, আজ বুঝেছি। তোমার জন্য আমারও প্রাণ কাঁদচে, ভাই!"

এবার আর সহিল না। সেই সহানুভূতিপূর্ণ বক্ষে পড়িয়া সে প্রাণ-ফাটা কান্না কাঁদিল।

গভীর রজনীর অন্ধকারে উষ্ণ প্রস্রবণের বন্যা-ধারায় জড়তা কাটাইয়া লুপ্ত চেতনা সুপ্ত স্মৃতিকে লইয়া জীবন-ব্যাপী হাহাকার-মাত্র-সম্বল জীবন আবার জাগিয়া উঠিল।

দিনের আলো না জাগিতে বিজয়ার আয়োজন হইয়াছিল। নহবতের সানাই [illegible]দিন বন্ধ আছে। গাছের পাখী তখনও ডাকে নাই। কল্যাণী ডাকিল,—"বউ!" কি জানি, সহানুভূতিপূর্ণ

নারী-চিত্তে কি আছে, তাহা পাষাণকেও প্রাণ দিতে পারে!
পাষাণী কহিল,—"আর কিছু বল, আমি কমলা—"

"না, তুমি আমার বড় আদরের বউ। ভাই, অনেক ত বুঝলুম। হিন্দুর মেয়ের স্বামীই সব! স্বামিদ্বেষিণী হয়ো না। অতীত ভুলে যাও, ঈশ্বর-সাক্ষে যাকে বরণ করেছ, কায়মনে তাঁকে গ্রহণ কর।"

বিদায়ের অশুভ মুহূর্ত্ত দেখা দিল। কমলা যখন শুনিল, এখানেও সে স্থান পাইবে না, যাহার সঙ্গ তাহার পক্ষে হিংস্র শ্বাপদাপেক্ষা ভয়াবহ, একমাত্র তাহারই বাহু তাহার অবলম্বন, তখন তাহার বজ্রাহত প্রাণও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কল্যাণী অজস্র অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ঘুমন্ত পুরীর মধ্য দিয়া হাতে ধরিয়া যখন তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে লইয়া চলিল, সে তখন আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। সব ভুলিয়া তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল,—"তোমার মনে দয়া-মায়া আছে, আমায় এমন করে তোমরা তাড়িয়ে দিও না। তোমার মাকে ডাকো, তাঁর পায়ে ধরে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করবো, দেবেন না কি?"

কল্যাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরে স্তব্ধ গম্ভীর মুখে গিরিজা সুন্দরী আসিলেন। সে আর দেখা দিল না। কমলা তাঁহার পা ধরিয়া সকাতরে বলিল,—"আমায় আপনার এই বাড়ীর একটা কোণে পড়ে থাকতে দিন, আপনার পায়ে ধরচি, আমায় বিদায় করবেন না। আমার এ জগতে আর কোথাও স্থান নেই।"

গিরিজার স্ফীত নাসা, আরক্ত নেত্র, সজল জলদ-তুল্য মুখ তাঁহাকে যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কোন মতে পা সরাইয়া লইয়া পরুষ কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—"কেন বাছা, মায়া বাড়াও! তোমার স্থানের অভাব কি! মূর্খের হাতে ত পড়নি। আমারই যা হোক, সর্ব্বনাশটা করলে। বাছাকে আমার—" বলিতে বলিতে অশ্রুজলের কম্পনে গলা ধরিয়া ক্ষোভে ক্রোধে হতাশায় অধীর হইয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন,—"এমন করে তোকে বিদায় দিতে হলো, বাবা আমার!"

দাসী আসিয়া সহানুভূতিহীন কঠিন হস্তে একপ্রকার টানিয়াই গাড়ির মধ্যে তাহাকে পূরিয়া দিল। গাড়ির কবাট সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল ও সেই সঙ্গে রুদ্ধ কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে কমলার শ্রুতিশক্তিহীনপ্রায় কর্ণে প্রবেশ করিল, "তোমার ও কেউ নাই, আমিও আজ নির্ব্বান্ধব। আজ থেকে শুধু আমরা পরস্পরের, আর সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট!"

৫৩

বিবাহের এক বৎসর পরে শচীকান্ত ডেপুটি কলেক্টরের পদ লইয়া সদর হইতে দরিয়াপুর সবডিবিসনে বদলি হইয়া আসিল। এ পদটুকু পাইতে তাহাকে এ কয়মাস ধরিয়া বড় অল্প শ্রম করিতে হয় নাই। সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া সে খাটিয়াছে, নিজের প্রতি তিলমাত্র মমতা ছিল না। তাই সে শ্রমের ফলও ব্যর্থ হয় নাই; ইহারই বলে অতি অল্পদিনে সে একটা স্থান ও লাভ করিয়াছে।

এতদিনে অবসর মিলিল। এইবার আঃ,--রণশ্রান্ত জীবনকে অনাবিল শান্তি-বারি পান করাইয়া শুধু তাহাকে উপভোগ করিয়া যাওয়া! রত্নপুকুর ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় বন্ধু নলিনাক্ষের সাহায্য না পাইলে বোধ হয় তাহার এ উচ্চ পদ প্রাপ্তি ঘটিত না। এতদিন তাহার মায়ের কাছে কমলাকে রক্ষা করিয়া সে সংসার-ক্ষেত্রে যুঝিতে দাঁড়াইয়াছিল। আজ সফল প্রযত্ন হইয়া গচ্ছিত ধন ফিরাইয়া আনিল। এ পর্য্যন্ত কমলার সহিত তাহার দেখাসাক্ষাৎ ঘটে নাই। বন্ধুগৃহে কোনদিন সে তাহার সহিত দেখা করিতে সাহসও করে নাই, পাছে বন্ধুর সাক্ষাতে কমলার অনাগ্রহ প্রকাশ হইয়া পড়ে! কিন্তু ভক্ত বন্ধু ইহাকে খুব বৃহৎ করিয়াই দেখিয়াছিল। তাহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া সকলের কাছে সে বড়াই করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছিল, এত বড় মনের বল কাহার আছে? শচী একটা দৃষ্টান্ত-স্থল! কর্ত্তব্যের কাছে কমলাও কিছু নয়,—এমন মনের বল তার!

দরিয়াপুরের সবডিবিসন-অফিসারের বাংলোখানি ঠিক বাংলো নয়, তাহা একখানি অনতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। চারিদিকে সবুজ শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে শুভ্র গৃহটি চিত্র-হিসাবে অতি-সুন্দর। এ গৃহের সাজসজ্জাতেও কোন ত্রুটি ছিল না। সাধ্যাতীত ব্যয়ে গৃহস্বামী তাহার যে স্থলে যাহা থাকা উচিত, তাহা সেইরূপই সাজাইয়া ছিলেন। এই নূতন সজ্জিত নবীন সংসারে শচীকান্ত তাহার বধূ আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিল। তার পর এত দিনকার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল, "এই তোমার ঘর-সংসার। দেখে নাও, আর আজ থেকে আমাকেও তোমার কাছে টেনে

নাও,—কমল, কাছে নাও ; বড় দূরে রয়েছি, অনেক তফাতে রেখেছ ! আ[illegible]না, সরে এস ।”

তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া নবীন গৃহস্বামী গৃহে ফিরিল। সিঁড়ির পথে, বারান্দায়, ঘরে, কৈ ? কেহ কোথাও নাই ! ছাদে,—না ; ছাদের সিঁড়ি নাই ত ! ওই যে একটা ঘরের কবাট রুদ্ধ না ! কমল, দোর খোল । কমলা ! দোর ঘর নিঃসাড়, দ্বার ছিদ্র-হীন। তাহার শরীর-মন ভয়ে অবসন্ন হইয়া আসিল। নীচে আসিয়া নব-নিযুক্তা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, দ্বিপ্রহর হইতেই দ্বার রুদ্ধ, অভুক্ত আহার্য্য নীচেই পড়িয়া আছে। তবে ? দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বিহ্বল কণ্ঠে সে ডাকিতে লাগিল, —“কমলা, কমল, দোর খোল, শোন ।”

পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া দ্বারের খিল ভাঙ্গিয়া খুলিয়া গেল। উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকিয়া ভীত নেত্রে চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল, —ঐ না, কমল খাটের দাওা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ! ছুটিয়া সে কাছে আসিল—কই, কিছু ত পরিবর্ত্তন দেখা যায় না ! উদ্বেলিত বক্ষে শচী কহিল,—“কিছু করনি ত ?” উত্তর না পাইয়া সবলে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল ; কহিল,—“বল, বল, ভাবনায় আমি যে ম’রে যাচ্চি !”

হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া কমলা স্থিরকণ্ঠে কহিল,—“না ।”—যথেষ্ট ! “কমল ! এ রকম কেন করচ ?” কমলা স’রিয়া দাঁড়াইল। সে নেত্রে স্থূল না হোক্, একটা সূক্ষ্ম দাহিকা শক্তি বিদ্যমান ছিল। শচীকান্ত হাত ছাড়িয়া কিছু হটিয়া গেল। ক্ষোভের সহিত সে কহিল,—“কমলা, আমার সঙ্গে তুমি কিন্তু

অন্যায় ব্যবহার ক'র্‌চো। ব'লে দাও, তোমার কাছে আমার কি অপরাধ? নিষ্ঠুর মামার কাছ থেকে উদ্ধার করার কৃতজ্ঞতাও কি একটু নেই? একদিন ত তুমি এ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ক'রেছিলে?—সেদিন ওই জড় বালা জগাছা যে আদর টুকু পেয়েছিল তার একটু কণাও কি আজ আমি পেতে পারি না? শুধু অবহেলা ক'রবে? কেন, তোমার ত কোন ক্ষতি আমি করিনি!"

এ কথা বুঝি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সাপে কামড়াইলে যেমন অবস্থা হয়, কমলাকে ঠিক সেইরূপ দেখাইল। সে যে এতদিন কি ভুল স্বপ্ন দেখিতেছিল,—কি মন্ত্রে কাহাকে সে পূজা করিয়াছে, আজ তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তে সে হাতের কঙ্কণ দুইগাছা খুলিয়া সবেগে ভূমে নিক্ষেপ করিল। সেই সঙ্গে এমন করিয়া নিজেকেও আছড়াইয়া চূর্ণ করিবার প্রবল বাসনা তাহার মনে গর্জ্জিয়া উঠিল। হায় আশা! হায় প্রতীক্ষা! সকলই ব্যর্থ হইয়াছে! আড়াগোড়া সবই ভুল! মণীশের প্রতিও একটা অসহায় ক্রোধ বুকের মধ্যে ধূ-ধূ করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, এতটুকু শেষ স্মৃতির সুখও তুমি তাহাকে দিলে না!

শচীকান্ত এ ব্যবহার দেখিল—তাহার মর্ম্মে ঘা লাগিল। সে কিছুক্ষণ সেই অনাদৃত উপহারের পানে তাকাইয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিল; কহিল,—"বুঝেছি, তুমি ভুল বুঝেছিলে,—মনে ক'রেছিলে, এ মণীশের উপহার! তাই ত র অত সম্মান! তখন আমি নিজের স্বপ্নেই ভোর, তাই

ভাবিনি, এরও অপর অর্থ থাকা সম্ভব! হরি, হরি! মণীশ কি না সেই রকম! সে যাই হোক,—তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি, জিজ্ঞাসা করি? তোমার দাদা আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অন্যে না জেনে—ভুল ক'রে যদি অপর সম্বন্ধ ক'রে থাকে, সে ধর্ত্তব্য নয়। তারপর মণীশের কাকা তোমার মামার সঙ্গে ঝগড়ায় তাঁদের বাগ্‌দান ফিরিয়ে নেন,—তুমি এখন ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ আমারই কমলা! অতীত ডুবে যাক। ভুল-ভ্রান্তি মিটিয়ে ফেল, কমলা! বার বার আমায় আর আঘাত দিয়ো না। প্রাণে অনেক জ্বালা আছে, তুমি যদি একটা মিষ্ট কথা বল, সব জুড়িয়ে যায়। এ জগতে তুমি ভিন্ন আর আজ আমার নিজের ব'ল্‌তে কেউ নেই। তোমায় পাবার ফলেই আজ সমাজ আত্মীয়-স্বজন সকলে আমায় ত্যাগ করেছে। কিন্তু যদি তোমায় যথার্থই পাই, তাহলে সেজন্য আমার মনে এতটুকুও ক্ষোভ থাকবে না।"

কে কোথায়? পাষাণী উপেক্ষার বাণে সব ব্যাকুলতা কাটিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন শচীকান্ত কমলার সহিত দেখা করিয়া বলিল,—"আমায় দেখে ভয় পেয়ো না আমি তোমায় কোন অপ্রিয় কথা শোনাতে আসিনি। আমার মধ্যেও একটা মানুষের প্রাণ আছে,—তুমি সেইখানে আঘাত ক'রেছ। আমি বল্‌তে এসেছি, অনাহারে অনিদ্রায় তোমার কষ্ট পাবার দরকার নেই। আমি তোমার উপর সকল দাবী ছেড়ে দিলাম। যেদিন তুমি নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হবে, সেইদিন আবার তোমার কাছে এসে দাঁড়াব। সে

দিন যত দেরীতেই আসুক,—এক দিন আসবে, এ কথা আমি তোমায় বলে রাখচি। আর আমিও সে জন্য প্রতীক্ষা করতে অসহিষ্ণু হব না! একদিন তোমার এ ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে; সেদিন তুমি বুঝতে পারবে,—তুমি মণীশের নও, তুমি আমার।"

মানুষের সুখ দুঃখ দিয়া নিয়মের কোন ব্যত্যয় করা যায় না। এই আকর্ষণহীন, নিরানন্দ নির্ব্বান্ধব-গৃহ পিঞ্জরে কমলার দিন কাটিতে লাগিল। আশাহীন, প্রতীক্ষাহীন, কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসর যদিও কাটিতে বাকী থাকে না, তথাপি যেন ক্রমেই তাহা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল! মানুষের একটা কিছু চাই; কিন্তু তাহার কোথায় কি! ঘর-সংসার আছে, কাজ-কর্ম্মও যে নাই এমন নয়, করিলে সবই আছে, কিন্তু করিবার ইচ্ছাই যে নাই, তাই জগতে তাহার কিছুই নাই। আছে শুধু অসীম অনন্ত চিন্তা-সমুদ্র! সীমাহীন ভাবনায় আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া অব্যক্ত বুক-ফাটা যন্ত্রণায় কেবলমাত্র লুণ্ঠিত হওয়া ভিন্ন আর কিছু নাই। গম্ভীর অভিমানে সারা প্রাণ পুড়িতে থাকে, বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসে, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া বলে, এই তোমার দয়া! এই বিচার তোমার? কে বলে, তুমি দয়াময়! নিষ্ঠুর, পাষাণ তুমি! কি পাপে আমার এ দুর্গতি করিলে? এমন কি দোষ আমি করিয়াছিলাম? আবার মধ্যে মধ্যে কুহকিনী আশা আশাহীন চিত্তে কুহকের আলো জ্বালাইয়া তুলে, নিরাশার অন্ধকারে জড়িত বর্ত্তমানের মাঝখানে অতীত আসিয়া দেখা দেয়। সেই আশ্বাস-বাণী দেবাদেশেরই মত কানে বাজিয়া উঠে। মনের মধ্যে জোর

করিয়া সে আশাটাকে টানিয়া আনে, দৃঢ় চিত্তে ভাবে, নাই পাইলাম। এ জীবনের শেষে কি আর কিছুই নাই? সারা জীবনের পূজায় সেখানেও কি পাইব না? এসম্বন্ধ কখনও ভাঙ্গিবে না। আমাদের এ জন্মান্তরের সম্বন্ধ,—শুধু এক জন্মে সব শেষ হয় না। বিশেষ করিয়া একটা দিন আর গৃহিণীর কথা মনে পড়িয়া যায়। সেই একটি সাধনার সঙ্কেত মনে জাগে। আকুল অশ্রুজলের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে করযোড়ে সে বলে, যেন প ই ঠাকুর, আর যেন বঞ্চিত হইতে না হয়,—সেখানে যেন পাই। এমনই ভাবে তাহার দিনের পর দিন কাটিতে থাকে, রাত্রিও নীরবে চলিয়া যায়।

শচীকান্তরও দিন কাটে। সমস্ত দিন অফিসের কাজে হাঁফ ছাড়িবারও সে অবসর পায় না। চারিদিকের উদ্দীপনার মধ্যে সুখ-দুঃখ ডুবাইয়া কেবলই সে কাজ করিয়া যায়। টেবিলের উপর বাম বাহু স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে অবিশ্রাম কলম চালাইয়া গাদা গাদা তাড়া-বন্দি কাগজ লেখা হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিম্বা পরে সে যখন কেদারা ছাড়িয়া উঠে, তখন মাতালের মত পা দুইখানা তাহার টলিয়া পড়িতে থাকে। তার পর ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া টমটমে চড়িয়া যখন বাড়ীর দিকে ঘোড়ার রাশটা সে টানিয়া ধরে, তখন ঠিক তাহার মনের রাশখানাও তেমনি করিয়া সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। পরিশ্রমের সকল ক্লান্তি অপনীত হইয়া হৃদয় যেন একটা উৎসাহের হাওয়ায় তাজা হইয়া উঠে। কোনমতে সে পথটা কাটাইয়া বাড়ীর যত নিকটবর্ত্তী হয়, মনটা আবার ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে থাকে। প্রতিদিন নিরাশ হইবাও প্রত্যহ একবার উপকার ঝিলমিলের দিকে চাহিয়া দেখার লোভ-সম্বরণ

অনিবার্য্য হয়, কিন্তু সেখান হইতে কেবলমাত্র একটা তীব্র ব্যর্থতার লেখা চোখের উপর জলজ্বলিয়া উঠে, আর কিছুই না! নীচের ঘরে কাপর ছাড়িয়া একখানা আরাম-চৌকির উপর হাত পা মেলিয়া সে শুইয়া পড়ে। তার পর? হায়, তাহার বুঝি আর পর নাই। অজস্র চিন্তা, তীব্র অনুতাপ, আত্মগ্লানি, আর কত কি, তাহা বলিবার নহে। তবু সেখানে একটা আশা ছিল, একটা মুগ্ধ প্রতীক্ষা ছিল। একদিন যে তাহার নীরব সহিষ্ণুতা কমলার বিমুখ চিত্তকে তাহার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে, এ সম্বন্ধে সে দৃঢ় নিশ্চিন্ত। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে? ওগো কবে? কত দূরে—কত দূরে সে ভবিষ্যৎ? জীবনের এ পারে না, ও পারে? হে ঈপ্সিত, হে প্রার্থিত, এসো, এসো, আর যে পারা যায় না! দেখা দাও গো, দেখা দাও।

৫৩

সেদিন তাল-পল্লবে মর্ম্মর তুলিয়া ঝড়ের হাওয়া বহিতেছিল। আকাশের ইতস্ততঃ কোথাও খণ্ড মেঘগুলা অন্ধকারে চলন্ত পর্ব্বতের মত উদ্দেশ্যহীন-ভাবে পর্য্যটন করিয়া ফিরিতেছে। বর্ষণের আয়োজনে যে তাহারা তত ব্যস্ত নহে, তাহা তাহাদের অলস গতি হইতেই জানা যাইতেছিল। কমলা নিজের বদ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ খোলা ছাদে আসিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া ও পরিম্লান নক্ষত্র-পুঞ্জের পানে একবার তাহাদেরই ন্যায় নিষ্প্রভ দৃষ্টি উন্নমিত করিল, তারপর একটা ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধকারের দিকে অনির্দ্দেশ্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। অবসাদে হৃদয়-প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে, উঠিতে বসিতে বুকের মধ্য হইতে কে

যেন দারুণ নিপীড়নে নিপীড়িত হইয়া ক্রমাগত বলিতেছে, 'আর আমি পারি না, আর আমি পারি না।' এ প্রবল অস্বীকারের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই, সান্ত্বনা নাই, সমস্ত চিত্ত এ বিদ্রোহের তাপে তাতিয়া উঠিয়াছে, শরীর শুদ্ধ ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সমান তালে যেন কহিতেছিল. "আমিও আর এ ভার বহিতে পারিতেছি না।" নিদ্রাহীন কণ্টকশয্যা ত্যাগ করিয়া তাই সে এইখানে মুক্ত আকাশের তলে উদার প্রকৃতির মধ্যে একটু হাঁফ লইতে আসিয়াছে।

কিন্তু অভাগার ভাগ্যের মত এত বড় অভিশপ্ত বস্তু বুঝি জগতে আর কোথাও কিছু নাই। কমলা যে দুইদণ্ড জুড়াইতে আসিল, সেটুকু যেন তাহার ভাগ্য-বিধাতার প্রাণে সহিল না। সেই ঘন অন্ধকারের একটা প্রান্তকে বিদীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ ঊষা-প্রকাশের আলো বুঝি আকাশ-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল! নিশাচর প্রাণীর মত এ আলোর সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়ানো তাহার পক্ষে সুখের নহে। সে তখনই ফিরিতে গেল।

কিন্তু—না এ আলো ত দিবাগমনের সুসমাচার-ঘোষণা নহে! এ যেন ঘোরতর অমঙ্গল-বার্ত্তা-প্রেরণকারী বিপদ নিশানের মত সুলোহিত আভায় দক্ষিণে পশ্চিমে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আতসবাজির মত ইহার বিচিত্র ফুলঝুরি উর্দ্ধে তারকা ফুটাইয়া ঐ যে আবার কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের ন্যায় মুহূর্ত্তে মর্ত্ত্যের দিকে ঝরিয়া পড়িল! কমলা শিহরিয়া উঠিল। ঐ শ্মশান-চিতাবহ্নি না জানি এই নিসুতি রাত্রে কত দগ্ধ গৃহে চিতাশয্যা সাজাইয়া আসিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, হায়, সে যদি আজ ঐ ঘরগুলার একখানায় থাকিতে পারিত!

অগ্নি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অন্ধকার সভয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর হইতে দূরে সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল। বজ্র-শব্দে বাঁশ ফাটিতে লাগিল। অকস্মাৎ নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া সদ্য জাগরিত ভীত নরনারী, শিশু, পশুর, আর্ত্ত কণ্ঠের তীব্র হাহাকার আকাশে বাতাসে দিকে দিকে একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে 'আগুন' 'জল' হায় হায়' রবে ঘুমন্ত প্রকৃতি চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।

মানুষের সব দুঃখ উপেক্ষা করিয়া ঝড়ের বাতাস অট্টহাস্যে পুনঃপুনঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম একাকার করিয়া দাপাদাপি ছুটাছুটি করিতেছিল। গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা মাথা নাড়িয়া প্রলয়ের গর্জ্জন-গান গাহিতেছে। এতক্ষণকার সুষুপ্ত রাজপথ এক মুহূর্ত্তে বন্যা-তাড়িত জলস্রোতের মতই জনস্রোতে ভরিয়া গিয়াছে। কলরব-কোলাহলে সকলেই সেই সর্ব্বনাশিনী অগ্নিক্রীড়া দেখিতে ছুটিয়াছিল। সর্ব্বনাশের মধ্যে ও বোধ করি একটা সুতীব্র আনন্দের স্বাদ আছে! বজ্রধ্বনিতে মুহুর্ম্মুহু যখন বিদ্যুতের তীব্র আলো ঝলকিয়া উঠে, তখন গুরু কম্পিত গৃহের মধ্যে ভীত শিশু সভয় আনন্দে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া সেই ধ্বনির দিকেই কান পাতিয়া রাখে! কমলার অন্তরের মধ্যেও যেন নৈশ মৃত্যু-উৎসব তেমনি একটা সর্ব্বনাশী আনন্দের দোল দিতেছিল! মুগ্ধ পতঙ্গের মত তাহার সমস্ত হৃদয়টা সেই অনল পর্ব্বতের দিকে ক্ষণে ক্ষণে উভয় বাহু বিস্তৃত করিয়া দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। পিপাসী যেন

শীতল নির্ঝরের পানে তাকাইয়া আছে,—এমনি ভাবে তাহার দুই লুব্ধ লোচন সেই'দকে নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

নীচে রাজপথে লোকের ভিড় বর্দ্ধিত হইতেছিল। একজন লোক "তামাসা" দেখিয়া নিজের ঘর সামলাইতে ফিরিয়া যাইতেছে। যাত্রীর দল তাহার নিকট সংবাদ চাহিল। সে ঔদাস্যের সহিত কহিল, বাজারের প্রায় সকল ঘরই ধরিয়াছে, দ্বিতল ঘরেও অগ্নিদেবতার অকৃপা নাই! আর একটা খবর সে অতি সহজ কণ্ঠেই দিয়া গেল, যাহার নির্ঘাত ধ্বনি কমলাকেও বিঁধিতে ছাড়িল না। সে শুনিল, সেই দ্বিতল গৃহে ডাক্তার বাবুর নব-প্রসূত শিশু ও শিশু-জননী অনলবেষ্টিত। গৃহস্বামী গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছেন। দাস-দাসীরা কে কোথায়, কে বলিতে পারে? কাঠের সিঁড়ি প্রথমেই জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে, এতক্ষণে হয় ত ভস্মসাৎ হইয়া গেল। উপরের ঘরে অসহায়া জননীর আর্ত্ত-কণ্ঠধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকের তুমুল শব্দ ডুবাইয়া ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিতেছে। শিশুকে বুকে লইয়া পাশবদ্ধা কুরঙ্গিণীর মত তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন,—মুখে শুধু এক কথা, "আমার ছেলেটীকে বাঁচাও গো বাঁচাও।" কিন্তু কে এত বড় দুঃসাহসিক আছে যে মৃত্যুর রাজ্য হইতে মাতা পুত্রকে উদ্ধার, করিয়া আনিবে? আহা, একটা অবোলা জীব, আর একটা মেয়েমানুষ!

কমলার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। পুত্রস্নেহাতুরা মাতার ক্ষণ কম্পিত আর্ত্তনাদ যেন তাহার দুই কর্ণে সহস্র বজ্র-গর্জ্জনের চেয়েও প্রবল শব্দে জাগিয়া উঠিল,—ইহাদের রক্ষা করিতে কি কেহ নাই? ওগো, কেহ কি বাঁচাইতে পারে না? দূরে অগ্নি ও

বায়ুর আস্ফালন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বাহজ্ঞান-শূন্যাবৎ ছুটিয়া সে শচীকান্তর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল। তখন তাহার আর কোন কথাই মনে ছিল না। শুধু সেই অগ্নিবেষ্টিত গৃহে শিশু-কক্ষা জননীর মর্ম্মবিদারী যন্ত্রণায় তাহার নারী-চিত্তে করুণার হাহাকার উঠিয়াছিল। প্রতপ্ত সূর্য্যকিরণে অকস্মাৎ জমাট-বাধা বরফ গলিয়া প্রেমের মন্দাকিনী বহিয়াছে। সে যে চিরদিনই আর্ত্তের দুঃখ-হাহাকারে প্রাণের উত্তপ্ত সহানুভূতি ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছে! আজ তাহার সর্ব্বহারা হৃদয় এ করুণা ত ভুলিতে পারে না। এ যে যুগান্তরের তপোলব্ধ ধন, নিজের গড়া বস্তু ত নহে যে, ইচ্ছামত জমা-খরচ করিবে।

শব্দহীন রুদ্ধ কক্ষে অতল অন্ধকারের আশ্রয়ে শচীকান্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছিল। শান্তিহীনের পরমারাধ্যা নিদ্রাদেবী আজ যেন তাহাকে বহুদিন-প্রবাসিনী মায়ের মতই গভীর স্নেহে কোলে লইয়া শুইয়া আছেন। সুখস্বপ্নে অধর প্রান্ত ঈষৎ হাস্যে বিকশিত। এমন সুখে, এমন আরামে সে বুঝি রত্নপুকুর হইতে আসিবার পর আর একদিনও ঘুমায় নাই। দুশ্চিন্তাজড়িত জীবনে দুঃস্বপ্ন পূর্ণ নিশা-যাপন প্রায়ই অনিবার্য্য।

মনের আকস্মিক উত্তেজনার বশে কমলা যখন এই ঘরের দ্বার ঠেলিয়া স্বহস্তঘাতী আত্মার মত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন একবারের জন্য অর্দ্ধ অন্ধকারে সমস্ত ঘরখানার দৃশ্য তাহার চক্ষে মৃত্যুপুরীর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ অদূরে মরণের নির্দ্দয় ভেরী সঘনে বাজিয়া উঠিতেছে! ঐ বুঝি অভাগিনী জননীর সর্ব্বস্বধন তাঁহারই বক্ষতলে অসহায় ক্ষীণকণ্ঠের যন্ত্রণা-

রোদনে জ্বালা বাড়াইয়া জ্বলিয়া গেল! কমলার সর্ব্বশরীরের মধ্যে আগুনের শিখা ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই আগুনে পুড়িয়া মনটাও বুঝি লোহা হইয়া গিয়াছিল! সে সমুদয় দ্বিধা ভয় ভুলিয়া শয্যাতলে শায়িত শচীকান্তর নিকট ছুটিয়া আসিল, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "শোন, একবার ওঠো।" নিদ্রিত তখন বড় মধুর স্বপ্নে বিভোর ছিল। স্বপ্নে সে অপ্সরা-সেবিত নন্দনের চারু উপবনে দাঁড়াইয়া। অদূরে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র শোভা, পারিজাতের অপূর্ব্ব গন্ধ-সম্ভার! কিন্নরী ললিত রাগিণীতে চিরবসন্তের বন্দনা গাহিতেছিল। সার্থক প্রেমের পুলক আকাশে বাতাসে স্বর্ণসলিল-কম্পিত সরসীর বক্ষে এবং শচীকান্তর সর্ব্বশরীরের মধ্যে শিহরণ হানিতেছিল। মুগ্ধ চিত্তে প্রীতিবিহ্বল নেত্রে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। উদ্যানের দ্বার রুদ্ধ। ভিতরে সে প্রবেশ করিতে পারিল না, এমন সময় কোথা হইতে অপূর্ব্ব সুরে যেন কোন্ নারী-কণ্ঠ তাহার কর্ণকুহরে সমস্ত সঙ্গীতের তাল-মান খর্ব্ব করিয়া বাজিয়া উঠিল। পুলক-স্পন্দিত বক্ষে সে শুনিল, দিব্যাঙ্গনা বলিতেছে, "এসো, আমি তোমায় দ্বার খুলিয়া দিতেছি।" আর সে চাহিয়া দেখিল, সে দিব্যাঙ্গনা, কমলা! ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুক্ত দ্বার পথে নক্ষত্রালোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার বাহু ঠেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কে ডাকিতেছে,—"ওঠো, ওঠো শোন, একবার শোন!"

ও কে ডাকে! এ কাহার স্বর! দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া সে সেই অস্ফুট আলোকে চাহিয়া দেখিল, অমরালয় হইতে কি কোন দেবকন্যা এই অন্ধকার মর্ত্ত্যগৃহে সত্যই আবির্ভূতা

হইয়াছেন! গভীর বিস্ময়ে তাহার রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল, "কমলা!"

কমলা প্রতি মুহূর্ত্তে অধীরতর হইয়া উঠিতেছিল। পলে পলে মরণের রুদ্র হস্ত তাহাদের মধ্যকার পাশ কঠিনতর করিতেছিল। সে কহিয়া উঠিল, "হাঁা, আমি কমলা। ওদের তুমি রক্ষা কর।"

শচীকান্ত ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, কহিল, "কাদের? কাদের আমি রক্ষা করব, কমলা?"

কমলা জানালার নিকট ছুটিয়া গিয়া সশব্দে তাহার কবাট দুইখানা খুলিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল নেত্রে বাহিরে চাহিল, অন্ধকার ঘর মুহূর্ত্তে দিবালোকিত কক্ষের মতই তীব্র আলোকে ভরিয়া উঠিল। শচীকান্ত ইহার মধ্যে উঠিয়া জানালার নিকট কমলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সেই ভীষণ অগ্নি-পর্ব্বতের দিকে চাহিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল, কহিল, "বাজারে আগুন লেগেচে!"

কমলা তাহার কম্পিত অধরের মধ্য হইতে আর্ত্ত স্বরে কহিয়া উঠিল, "ওই আগুনে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তাঁর ছেলে নিয়ে উপরের ঘরে আছেন। ডাক্তার বাবু বাড়ী নেই। তাঁদের কি বাঁচানো যায় না?"

শচীকান্ত অগ্নির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িল, কহিল, "সম্ভব নয়।" বায়ু গর্জ্জিতেছিল। অগ্নি সাগর-তরঙ্গের মত লহরে লহরে গর্জ্জিয়া শূন্য পথে ছুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। কমলার বক্ষ-শোণিত শীতল হইয়া গেল। রুদ্ধশ্বাসে সে তাহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী শচীকান্তর একখানা হাত সবলে চাপিয়া ধরিল, এক নিশ্বাসে কহিল, "তুমি ওদের বাঁচাও, ওদের বাঁচাও, ওগো, বাঁচাও!"

এই যে ব্যাকুল আবেদনের নির্ভরতা-পূর্ণ আত্মনিবেদন, ইহার যে কত বড় তাড়িত শক্তি, তাহা সেই লাঞ্ছিত হৃদয়ই শুধু জানে। ব্যথা জড়তায় যে চিত্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুমূর্ষুর মত শীতল গৃহকোণের মলিন শয্যায় লুটাইয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই অস্তের সূর্য্যে যেন উদয়ের আলো আসিয়া পড়িল। বিস্ফারিত নেত্রে সে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় কমলার দিকে ফিরিল; তাহার সর্ব্বশরীরের মধ্যে পলকে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে কহিল, "তুমি যখন আদেশ করেচ, তখন যাবো না, কমলা! যে অধিকার এক মুহূর্ত্তের জন্যও গ্রহণ করেচ, যে দাবী এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার মনে আমার কথা জাগিয়ে দিয়েছে, সে অধিকার আমি রক্ষা করতে চেষ্টা করবো বৈ কি।" তাহার স্বর সঘনে কম্পিত হইতেছিল। একটা উদ্দাম আনন্দে যুদ্ধাভিমুখ বীরের ন্যায় তাহার সারা চিত্ত নাচিয়া উঠিতে লাগিল। কি আনন্দ! আজ এই নৈশ নরমেধ যজ্ঞে এ কি আনন্দ! মৃত্যুর এই আকস্মিক আহ্বানে আজ কি বিপুল পুলক! কি অসীম তৃপ্তি! সে সেই দহনের আলো দিয়া পূর্ণনেত্রে অকথ্য ভয়ে বিবর্ণ কমলার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। কমলাও সেই সময় অগ্নিরাশি সহিতে অসমর্থ চক্ষু সরাইয়া আনিয়া, তাহার দিকে চাহিল; চারি চক্ষে মিলিত হইয়া গেল। শচীকান্তর হস্ত ত্যাগ করিয়া মিনতি-পূর্ণ আদেশের সহিত কহিল, "তবে যাও—।"

"যাই কমলা"। শচীকান্ত কমলার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল। একটা গভীর সাধকে অতৃপ্ত রাখিয়াই নিজেকে সে সবলে টানিয়া সরাইয়া লইল না। ছিন্ন-পক্ষ ভীত পক্ষীটি আশ্রয়-

বোধে যখন তাহার বক্ষ-নীড়ে উড়িয়া আসিয়াছে, তখন তাহাকে পিঁজরায় পুরিবার কথা মনের কোণে আনাও যে কাপুরুষতা! সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। "কমলা, একটা কথা,—হয় ত এই শেষ কথা,—বলে যেতে চাই—"শচীকান্ত কমলার দিকে আবার দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। "আমি যাচ্চি, তুমি যাদের বাঁচাতে আদেশ দিয়েছ তাদের রক্ষা করবার জন্য ঐ আগুনের হাপরের মধ্যে ঢুকতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হব না জেনো, তবু যদি না পারি, ক্ষমা করো।—এই যে যাচ্চি, হয় ত আর ফিরে নাও আসতে পারি! যদি আসি? ফুরিয়ে গেলে—কিছুই বলবার নেই। কিন্তু যদি নাই আসি, যদি এই আমাদের শেষ হয়, আমায় একটু দয়ার সঙ্গে বিচার করো। ঐ অগ্নিবেষ্টিত গৃহের প্রাণীদের জন্য তোমার প্রাণে যে অসীম করুণা আছে. তারই একটি বিন্দুমাত্র আমার জন্য খরচ করো। এইটুকু শুধু মনে করো, আমি যা করেচি, যা সয়েচি, সব তোমার জন্য, তোমায় ভালবেসে, তোমায় আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী জেনে। তোমায় ভাল না বাসলে আমার আজ এ দশা হতো না। তুমি আমার নও, আমার হবে না জান্‌লে, এ পাপ আমি কর্‌তুম না। আমি বন্ধুর কাছে বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার বোঝবার ভুলই পাপ। আর একটা কথা বলে যাই, আমার দেবতুল্য পিতাকে না চিনে তাঁর ধর্ম্ম, তাঁর পথ না ধরেই আমার এই অবস্থা! কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ত বলো, তাঁকে আমি ভুল বুঝেছিলুম। আর তুমি—"অদূরে ভীষণ রবে গৃহ-প্রাচীর ভূমিসাৎ হইল। অগ্নি গর্জ্জিল, হু-হু-হু! শচীকান্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

৫৪

কমলার শরীরে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল—অর্থাৎ তাহার বোধ-শক্তি স্মৃতি ধৃতি প্রভৃতি মানসিক শক্তি স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন সর্ব্বপ্রথম তাহার মনে পড়িল, সে এই গৃহে কোন্ অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে! তারপর এ গৃহের অধিকারী নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছিল, তাহাকে কিসের অধিকারে সে ডাকিয়া তুলিয়া কঠিন কণ্ঠে মৃত্যু-গহনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আদেশ করিল! ঠেলিয়া পাঠাইল! এ ক্ষমতা তাহাকে কে দিল? কে দিয়াছে? কেন সে এমন কাজ করিল? যাহাকে এ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও সে নয়নেঙ্গিতের এতটুকু কম্পনে বিন্দুমাত্র করুণাও প্রদর্শন করে নাই, যাহার সাজানো অর্ঘ্য পা দিয়া ঘৃণায় সে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে, তাহার জীবনের উপর তাহার এত বড় জোর! একটা সম্বন্ধের দাবী পর্য্যন্ত যাহার সহিত সে কোনমতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়, তাহাকেই অনায়াসে সে নিতান্ত আপনার মত করিয়া মৃত্যুপণে বিদায় দিল! এ সে কি করিল? কেন এমন করিল? দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ডাকিল, "যেয়ো না। ফিরে এসো, শুনে যাও—" কিন্তু হায়! কাহাকে এ বৃথা আহ্বান! বহির্দ্বারের কবাট সজোরে বন্ধ হইবার শব্দ পাওয়া গেল। জনহীন গৃহ উচ্চ গম্ভীর নাদে প্রতিধ্বনি করিল, "ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে—"

কমলা পাগলের মত খোলা ছাদে ছুটিয়া গেল। এখনও হয় ত সে তাহাকে ফিরাইতে পারে! স্পন্দিত নর্ত্তিত আলোকে দূরে

চঞ্চল-গতি পরিচিত মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিল। এখন ডাকা বৃথা, ফিরাইবার আর উপায় নাই!

সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, পরক্ষণে সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া গেল, বহির্দ্বার খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল. ছুটিয়া গিয়া সে তাহাকে ফিরাইবে! কিন্তু পরক্ষণেই এ চেষ্টা বাতুলের চেষ্টা মাত্র বুঝিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। জানালায় দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ লোচনে কিছুক্ষণ সেই ভীষণ অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। স্বেদজলে অঙ্গ বস্ত্র ভিজিয়া গেল। সবেগে ভূমে বসিয়া পড়িয়া অধীর উচ্ছ্বাসে সে কহিল, "ওকে ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো, ওগো ঠাকুর, ফিরিয়ে আনো!"

সারারাত্রি প্রবল বেগে ঝড় বহিল। প্রকাণ্ড তালগাছগুলার প্রকাণ্ড মাথা সে বাতাসে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল। দূরে অগ্নির প্রচণ্ড মূর্ত্তি সে বাতাসে ভীষণতর রূপ ধারণ করিতেছিল। ঝড়ের যেন শেষ নাই! আকাশে সাঁ সাঁ করিয়া মেঘের দল ছুটিয়া চলিয়াছে। ধ্বংসালোকের পশ্চাতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ভীষণাকার যমদূতের মত উদ্যত দণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া। যেন কাহার সঙ্কেতের অপেক্ষা করিতেছে, আদেশ পাইলে এখনই সৃষ্টি-নাশে উদ্যত হয়। কমলার বুকের ভিতরেও এমনই প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল। আগুনের হল্কাগুলা এমনি বেগে হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। তাহার চারি দিকে যেন একটা প্রবল ভূমিকম্প হইতেছিল, আর্ত্তস্বরে তাহার সমুদয়

প্রাণটা কাঁদিয়া বলিতেছিল, "এ আমি কি করেছি, এ কি করেছি!"

ভোরের আলো না ফুটিতে চলন্ত মেঘ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আকাশ পথের কোনখানে ফাঁক নাই দেখিয়া বজ্রানল মেঘ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া দেখিতে দেখিতে ধরণী বক্ষে অজস্র ধারায় নামিয়া আসিল। ঊর্দ্ধশির অগ্নি বাধাপ্রাপ্ত অজগরের ন্যায় নিম্নমুখে মাথা নত করিল, ধূমরাশি সবেগে আকাশের মেঘে মিশিতে ছুটিয়া চলিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। বাতাসের কাতর আর্ত্তনাদ রহিয়া রহিয়া যন্ত্রণা কাতর চিত্তের হাহাকারের ন্যায় হা-হা করিয়া উঠিতেছিল। সহৃদয় দর্শকের অশ্রুধারা যেন অশ্রান্ত বর্ষণের আকারে পৃথিবীর তপ্ত গণ্ডে ঝরিতেছিল। কাল এই বর্ষণের গোটাকয়েক ধারা পাইলে হয় ত কত লোক বাঁচিয়া যাইত, কত হতভাগা গৃহহীন হইত না। কিন্তু জগতে সময়ে সহানুভূতি-লাভ বড় বিরল। কয়জনের ভাগ্যে তাহা ঘটে!

ঝিয়ের সঙ্গে নীচে রাঁধুনী বামুনের ঘোরতর কোন্দল বাধিয়া গিয়াছে। ভৃত্য মধ্যস্থতা করিতে গিয়া গালি খাইয়া তাহা প্রত্যর্পণের বৃথা চেষ্টায় কোলাহল বর্দ্ধিত করিতেছিল। কাহার পদশব্দ শুনিয়া সকলেই একসঙ্গে চুপ করিল। কমলার বক্ষ শোণিত নিশ্চল হইয়া আসিল—সে কি এইবার নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবে? কিন্তু উঠিতে গিয়া পা যেন উঠিল না! গতরাত্রির ঘটনা একটা বিরাট ভারের মত তাহার সর্ব্বশরীরকে যে এই ঘরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়াছিল! যেন এখান হইতে তাহার

নড়িবার শক্তি কে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে! হয় ত এতক্ষণ সে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, দালান পার হইল, এইবার বুঝি এই ঘরেই প্রবেশ করিতেছে,—এখনই সে শুনিবে, "কমলা, আমি এসেছি।"

সে কি করিবে,—ওগো, কেহ বলিয়া দাও, সে কি করিবে? বলিবে কি, "তুমি যাও, কেন তুমি এলে—তুমি যাও!" যদি সে তেমন করিয়া আজও বলিতে আসে, "আমার কমল!" উদ্যত রোষে বজ্র দৃষ্টি হানিয়া আজও সে বলিবে কি, "তুমি আমার কেউ নও!"—কিন্তু কেমন করিয়া আজ সে কথা বলা চলে! হে হরি! এ কি হইল?

বহুক্ষণ অতীত হইল, কেহ কক্ষে প্রবেশ করিল না। কেবল জল স্থল কম্পিত করিয়া বজ্র হাঁকিয়া উঠিল। বিদ্যুতের তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়া আকাশের বক্ষটাকে চিরিয়া দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল, বায়ু কাঁদিয়া উঠিয়া মহা শোকের নিশ্বাস ফেলিল, হা-হা-হা!

ঐ না কে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে! পাশের ঘরে ঐ না কে দাঁড়াইয়া! এখনই ত সে এই ঘরে ঢুকিবে! স্বেদ-জলে কমলার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া উঠিল। হৃৎপিণ্ডটা দম-ফুরানো ঘড়ির মতই অকস্মাৎ চলিতে গিয়া আর চলিল না। প্রাণবায়ুও বুঝি এই চাপে রুদ্ধ হইয়া যায়! ঘরে কেহ প্রবেশ করিল না। খোলা দরজার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র কক্ষ দৃষ্ট হইতেছিল। আলনায় ঝুলানো সার্ট, কোট, কলার, টাই বাতাসে ফুলিয়া দুলিয়া স্থানচ্যুত হইতেছিল। বস্ত্র-মধ্য হইতে একটা অস্ফুট চামেলি গন্ধ বাতাসের

দীর্ঘশ্বাসে হু-হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে ; কমলা অমনি অকস্মাৎ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

এইবার নীচে একসঙ্গে অনেক লোকের জুতার শব্দ শুনা গেল। কমলা চমকিয়া উঠিয়া পড়িল,—এবার নিশ্চয় সে ফিরিয়া আসিয়াছে। এবার আর তাহার মনের ভ্রান্তি হইতে পারে না। সে একবার অসহায় নেত্রে লৌহ-গরাদ ঘেরা জানালার দিকে চাহিল, পাশের ঘরের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল, আ র কি মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না, প্রতি মুহূর্ত্তেই যে সেখান দিয়া কেহ প্রবেশ করিতে পারে।

৫৫

মানুষ যখন জলের মধ্যে পড়িয়া ক্রমেই অতলে তলাইতে থাকে, তখন কখনও বা একটা বিপরীত মুখের ঢেউ আসিয়া তাহার চেষ্টাহীন বীতসংজ্ঞ দেহখানিকে সবলে ধাক্কা দিয়া যেন পাতালের দিক হইতে মর্ত্ত্যের পানে বারেক ঠেলিয়া তুলিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতির সে চেষ্টা প্রকৃত নয়, সে একটা ক্ষণিকের খেলা মাত্র। ক্ষণপরেই আবার সেই নিমজ্জমান হতভাগ্য উপরের আলোকময় পৃথিবীর বক্ষে আশ্রয় না পাইয়া অন্ধ তামস জলতলেই আকৃষ্ট হয়।

নীচে-তলার উত্তেজনাপূর্ণ বিলাপধ্বনি কমলার নিশ্চল হৃদয়-শোণিতে বারেকের জন্য সেইরূপ একটা প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিল। একবারের জন্য সে শুনিল, "ওরে বাবারে, এ কি সর্ব্বনেশে কথা! ওমা, এ কি বলে গো!"। "এ—কি কথা! কে' কি বলিতেছে?

কি হইল! বারেকের জন্য সন্দেহে আতঙ্কে তাহার সারা চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। দাসী আবার সাতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠিল; বলিল, "কিরে, তোরা বলিস কি? ওমা, আমি কি করব গো! এ যে একেবারে অভাবিনি অচিন্তিনি কাণ্ড!" আবার কমলার মন প্রাণ পাথারে তলাইয়া গিয়াছিল। সকল চিন্তা ছাড়িয়া কেবল মাত্র তাহার মনে হইল, যেন সে অতলে তলাইয়া যাইতেছে।

"মাইজি!" কমলা কবাটের অবলম্বন ছাড়িয়া এই সসঙ্কোচ আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়া চোখ তুলিল। বিষণ্ণ আর্দ্দালিটা যুক্ত-করে দাঁড়াইয়াছিল। সে সাশ্রুনেত্র নত করিয়া তেমনি স্বরে কহিল, "গাড়ী খাড়া রয়েছে, যেতে হবে মা-জী।"

সে কিছুই বলিল না, কোনরূপ দ্বিধামাত্র না করিয়াই নী বে তাহার অনুসরণ করিল। কেমন করিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিল, কখন নীচের উঠান ঘর দ্বার পার হইল, কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিল না। কেন যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে, তাহাও সে জানে না, ভাবে নাই, ভাবিবার ইচ্ছাও ছিল না। কেবল পরি-চালকের পশ্চাতে আসিয়া কলের পুতুলের মত সে গাড়ির ভিতর উঠিয়া বসিল। ঝি সঙ্গে আসিয়াছিল। সে তাহার সম্মুখের আসনে বসিয়া চোখ মুছিতেছে, বিলাপ-পূর্ণ স্বরে কত কি বকিতেছে, মধ্যে মধ্যে কহিতেছে, "ভালা মেয়ে তুমি যা হোক! এতটুকু যত্ন নেই, আত্তি নেই! রাজা সোয়ামি, তাকে এত হেনস্তা! ওরে বাবারে! এত তাচ্ছিল্য! কি করে ছেড়ে দিলে গো! আমরা হলে এমন পারতুম না। ধন্যি প্রাণ!"

কমলা শূন্যনেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। গাড়ী চলিতেছিল। পথের দুই পার্শ্বে ক্ষেত্রগুলা জলে ভরিয়া রহিয়াছে। রাস্তায় জন-প্রাণী নাই, জল কাদা ঠেলিয়া ঘোড়াগুলা অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। পুনঃ পুনঃ চাবুকের আঘাত তাহাদের কশাহত পৃষ্ঠের ব্যথা বাড়াইতেছিল। অন্য সময় হইলে সে আঘাত কমলার বক্ষে বাজিত। আজ কিন্তু সে কিছু জানিতেও পারে নাই। গত রাত্রির দগ্ধ স্তূপ দিনের আলোয় ভীষণতর দেখাইতেছে। কোথাও গুমিয়া গুমিয়া শস্যের বস্তা তখনও পুড়িতেছিল, কোথাও আবরণের নিম্নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধোঁয়াইয়া উঠিতেছিল, উর্দ্ধগামী সর্পের মত ধূমগুলা শূন্যমার্গে ঘুরিতেছিল; এবং সেই বিশাল ধ্বংস ভীষণ নরমেধ যজ্ঞকুণ্ডরূপে প্রাণের মধ্যে বিভীষিকা ও জগতের নশ্বরতার কথা একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিতেছিল। বৈশ্বানরের সেই লীলাক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া ঝঞ্ঝাবৃষ্টি মাথায় লইয়া অসংখ্য গৃহহীন ও দর্শকের দল চারিদিকে কোলাহল করিতেছে, হাহাকার করিতেছে, ভাগ্য, ভগবান ও অজ্ঞাত অগ্নিসংযোগ-কর্ত্তাকে অভিসম্পাত করিতেছে। প্রকৃতি নিজে যেটুকু রক্ষা করিয়াছেন, তা-ভিন্ন মানুষের হাত একখানি পাটের বস্তা বা চালের বোরা সরাইয়াও উপকার করে নাই; জনতা করিয়া মজা দেখিতেই তাহাদের আগমন। আগুনের মুখে কাঁচা প্রাণটা তুলিয়া দিতে কেহই রাজী হয় না। সকলেই বলে, "লোক পাইলে করিতাম! একা কি করিব?"

অনেকখানি পথ অতিক্রমান্তে গাড়ি আসিয়া একখানা বড়

বাড়ীর দ্বারে থামিল। বাড়ীখানায় কোন সময়ে হলদে রং করা হইয়াছিল ; বহু দিনের অসংস্কারে এবং বৃষ্টিজলের চিত্রে এখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। দ্বারের নিকট দুই তিন জন পুলিশের লোক ও সাধারণ লোকে বিষণ্ণভাবে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাহারা কমলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া সরিয়া গেল। বোধ হইল, সকলের কণ্ঠ হইতে একটা সহানুভূতির নিশ্বাস একসঙ্গে বহির্গত হইল। কমলা গাড়ি হইতে নামিয়া কোন দিকে না চাহিয়াই পথ-প্রদর্শকের অনুসরণে সেই গৃহের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া দ্বারের পিতলের বাঘমুখো হাতলটা ব্যাঘ্রনেত্রের মত দুর্ভেদ্য দৃষ্টিতে যেন তাহার দিকে জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া আছে এমনি মনে করিয়া হঠাৎ একবার সেইখানে সে দাঁড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তখনি মনে হইল, কে যেন তাহাকে ভিতরে সেই দিক পানেই টানিতেছে। দাঁড়াইয়া সে থামিতে পারিল না, এক পা এক পা করিয়া অবশেষে দ্বারের চৌকাটের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে অনেক লোক জড় হইয়া তাহার দিকে সকৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টি যেন এ অবস্থায় সহা যায় না। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই! সে স্থির কর্ণে একটা কোনরূপ শব্দ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল ; কিন্তু কিছুই শুনা গেল না। না, ঐ যে প্রেতপুরীর মত স্তব্ধ বাড়ীটা ক্ষণে ক্ষণে একটা বিলাপ মর্ম্মরে শিহরিয়া উঠিতেছে। সে ভিতরে প্রবেশ করিল। কোথা দিয়া কোথায় আসিল, তাহা সে অনুভব করিতেও পারিল না। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খট্টায় ছিন্ন মলিন শয্যায় শায়িত যন্ত্রণার্ত্ত লোকপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন গৃহে রুদ্ধ বায়ুর মধ্য

দিয়া সে যে অনেকটা স্থান অতিক্রম করিল, এইটুকু মাত্র বুঝিল। সারা বাড়ীখানা যেন কাতরতা ও বিষাদের আশ্রয়-স্থল। প্রতি পদক্ষেপে মলিনতার সংস্পর্শ, প্রতি মুহূর্ত্তে অস্ফুট বিলাপ প্রাণের মধ্যে বিষাদপূর্ণ আতঙ্ক জাগাইয়া তুলে। সম্মুখের একটা দ্বার অর্দ্ধমুক্ত ছিল। তাহার সঙ্গী সেই আর্দ্দালিটা সেই দ্বার আর একটু খুলিয়া দিয়া নিজে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল,—তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিবার ইঙ্গিত! যন্ত্রচালিত কমলা নিঃশব্দ চরণে অগ্রসর হইল। এক অনতিপ্রশস্ত হলঘর। ঘরে অনেক লোক। তাহার মধ্যে কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা চৌকিতে বসিয়াছিল। কমলা প্রবেশ করিতেই সকলে তাহার দিকে চাহিয়া সরিয়া গেল। দুইজন সাহেব একখানা খাটিয়ার নিকট চৌকিতে বসিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া স্থিরনেত্রে খট্টা-শায়িত ব্যক্তির দিকে চাহিয়াছিলেন, অপর জন একটু দূরে একটা কেদারা অধিকার করিয়াছিলেন,—উভয়েই উত্থিত হইয়া টুপি খুলিয়া নত মস্তকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত কমলাকে অভিবাদন করিলেন। কমলা কোন দিকে না চাহিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইল।

মলিন বিছানায় দীনহীনের ন্যায় এই সাধারণ দাতব্য হাঁসপাতালের পূতিগন্ধময় অন্ধকার-পূর্ণ কক্ষমধ্যে ও কে পড়িয়া! কে ও? কমলা শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শায়িতের পানে চাহিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া দুই হাতে আপনার দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিল।

রোগীর যন্ত্রণার সীমা ছিল না, বাহজ্ঞান নাই, অন্তর্জ্ঞানও বিলুপ্ত-প্রায়। অবর্ণনীয় যন্ত্রণার অব্যক্ত ধ্বনি পাষাণকেও বোধ হয় বিগলিত করিতে পারে। কঠোর-চিত্ত চিকিৎসক, পুলিশ

কর্ম্মচারী, শুশ্রূষাকারী, সকলের পক্ষেই এ দৃশ্য যেন সহনাতীত!

সহসা রোগী চমকিয়া উঠিল; দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া দৃষ্টিহীন দুই নেত্র বিস্ফারিত করিতে গেল, নিদারুণ যন্ত্রণা-ধ্বনি কণ্ঠ ভেদ করিয়া ঘরের স্তব্ধতাকে সহসা এমনি আঘাত করিল যে, অকস্মাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত হইতে টুপিটা গৃহতলে সশব্দে পড়িয়া গেল। কমলার সমস্ত শরীরের প্রতি শিরার একটা বরফের ধারা কিন্ কিন্ করিয়া বহিয়া গিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া দিল। সে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া খাটের গায়ে মাথা রাখিল।

রোগীর শরীরের স্পন্দন স্থির হইয়া আসিয়াছে। যন্ত্রণার অস্ফুট ধ্বনিটুকুও ক্রমে থামিয়া গেল। নিশ্বাসের দ্রুত তাল সমান হইল। সহসা শব্দহীন কণ্ঠ একটা পরিষ্কার স্বর উচ্চারণ করিল, "বল কমলা, আমি পাপী নই? বল, আমায় ক্ষমা করেছ! উঃ ভগবান!"

ডাক্তার বাবু মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। চেয়ার সরাইয়া সিরিল সার্জ্জন একটু হঠিয়া গেলেন; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টুপি কুড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমলা মুখের উপর হইতে করাচ্ছাদন খুলিয়া যে ব্যক্তি তাহার সম্মুখে নিস্পন্দ নিঃসাড় পড়িয়া আছে, তাহার বিভীষিকাপূর্ণ শোচনীয় মুখের দিকে চাহিল। সমস্ত পৃথিবী—এই জীবনের সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিচিত্র ঘটনা-জাল,—সমস্তই তাহার মন হইতে এককালে পুরাতন চিত্রের মতই নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল। কেবল মাত্র তাহার মনে ছিল এই অনাদৃত হতভাগ্য তাহার একটি অনুরোধে নিজের এই শত-আশা-উদ্দীপ্ত নবীন জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। তাহার মৌন বিবর্ণ অধর কোন

ভাষা কোন ধ্বনি উচ্চারণ করিল না, কিন্তু নীরব হৃদয়ের মধ্যে গভীর অনুতপ্ত চিত্ত এমন কোন ক্ষমার কথা সেই সদ্যোবিমুক্ত প্রাণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিল, যাহা অন্য কোন জাগরিত কর্ণ না শুনিলেও তাহার নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। এবং তাহার সমুদয় সংশয় উদ্বেগ দূর করিয়া ইহা তাহাকে যে শান্তি প্রদান করিয়াছিল, সেই পরিত্যক্ত দগ্ধ দেহেও তাহার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল।

৫৬

একটা মানুষে কত বড় বড় দুঃখের চাপের মধ্যে পড়িয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এই মহা-পরীক্ষা যেন কমলার সারা জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। দুঃখ,—তা সে যেমন তেমন দুঃখ নয়, দুঃখের মধ্যে সব চেয়ে বাছা বাছা তীব্রতম দুঃখগুলাই সে আজীবন ভোগ করিয়া আসিয়াছে। অভাব বিয়োগ অপমান সমস্তই তাহাদের পূর্ণ মূর্ত্তিতে তাহাকে দেখা দিয়াছে। আজ আবার তাহার অদৃষ্ট আর এক মূর্ত্তিতে তাহার নিকট প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু সংহার মূর্ত্তির প্রলয়বিষাণ-শব্দিত উন্মত্ত তাণ্ডবের চেয়ে এ রূপ যেন আরও অসহ্য! সকল দুঃখের অন্ধকারেই এতটুকু একটু জোনাকির টিপটিপানি আলো থাকে, তা না থাকিলে মানুষ কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না! আজ এ যে কি মহাপ্রলয়ের নিরালোক শূন্যতা ইহার যেন আর সীমা-সন্ধি নাই!

যে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করিতে শচীকান্ত প্রাণ

দিল, তাঁহার গৃহে কমলার সেবা-সান্ত্বনার অভাব ছিল না। গৃহিণী সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাকে মায়ের স্নেহে যেন কোলে টানিতেছিলেন, কিন্তু তাহার তাহাতে কি সুখ! কিসের সান্ত্বনা? যখন বাড়ীর দাসী আসিয়া তাহাকে বিধবার বেশে সাজাইল, তখন অন্তরে অন্তরে সে একবার হাহাকার করিয়া উঠিতে গিয়াছিল, কিন্তু হাত টানিয়া লয় নাই। আজ কাহার জন্য সে বৈধব্য গ্রহণ করিবে? যে তাহার স্বামী নয়, তাহার জন্য! কিন্তু এত বড় একটা প্রচণ্ড অস্বীকার করিবার বলই বা আজ কোথায়? তাহারই পণ রক্ষা করিয়া সে যেন তাহার পরে জয়ী হইয়া গিয়াছে। ইহলোক ত ফুরাইয়াই ছিল, পরলোক শুদ্ধ ফুরাইয়া গেল। নিজেও মরিল, এ জন্মের মরণ নয়, চিরজন্ম-জন্মান্তরের মত মহামৃত্যু ক্রয় করিল, আবার এ কি হইল,—এ যে নিষ্ঠুর মরণ!

সেই আত্মসুখী, স্বার্থপরায়ণ হৃদয়ের মাঝখানে যে কত বড় একটা ত্যাগশীল তপস্বীর প্রাণ লুকানো ছিল, সেটাকে কেহ কোনদিন খুঁজিয়া পায় নাই। কমলা হুতাশন-ভক্ষিত দগ্ধ দেহের সেই মহা অধিকারীকে হঠাৎ দেখিতে পাইল। কোন্ কর্ম্মসূত্রে এ বাল্মীকি রত্নাকরে পরিণত হইয়াছিল, সহসা যেন এক অমৃতময় রাম নামে সকল জড়তা কাটাইয়া তাহার দিব্য জীবন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এত বড় একটা জীবন কি ভুলে, কেমন করিয়া নষ্ট হইল, আর সে তাহার নিমিত্ত কারণ, এই মনে করিয়া ব্যাধ-বাণাহত ক্রৌঞ্চের মত তাহার প্রাণটা লুকাইতে চাহিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাক্তারবাবু স্ত্রীকে দিয়া জিজ্ঞাসা

করাইলেন, কমলা এখন কোথায় যাইতে চায়! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সরকারের তরফ হইতে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর বিধবার যাবজ্জীবন ভরণপোষণ ভার বহিতে প্রস্তুত। এই অল্পদিনেই সে যে কার্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল, তাহা অনন্যসাধারণ। কমলা সেই অর্থ লইয়া আত্মীয়-গৃহে কিম্বা যথেচ্ছ স্থানে বাস করিতে পারে। কমলাকে কথাটা দুই তিনবার বলিতে হইল, তাহার মনটা এমনই শূন্য হইয়া গিয়াছে যে বাহিরের রূপ-রস শব্দ-স্পর্শ কিছুই যেন সেখানে গিয়া পৌঁছায় না। শুনিয়া সে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল, "না।" ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এ ত মা তোমার জোরের টাকা। সংসার বড় বিষম ঠাঁই মা, নিজের নিজস্ব কিছু থাকা বড় ভাল। চারটে কাল এখন ত কাটাতে হবে।" কথাটা সে শুনিল না, শুনিলেও কিছুমাত্র বুঝিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার জানাইল। ডাক্তার বাবু বা তাঁহার স্ত্রী ক্ষুব্ধ হইলেও আর বেশী কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। পাছে সে মনে করে যে, ইহারা তাহাকে ভার বোধ করিতেছে!

এমন করিয়া কিছু দিন গত হইলে একদিন অতর্কিতে আপনা আপনি তাহার মনে হইল, কাজটা ভাল হইতেছে না। তাহাকে লইয়া এই গৃহস্থ-দম্পতী বড় বিব্রত হইয়া আছে। সে তাহাদের কে, যে এমন করিয়া গরীবের ঘাড়ে চড়িয়া থাকে? গৃহিণী গৃহকর্ম্মের অবসরে কাছে আসিয়া বসেন, দুই-একটা দুঃখের কথা পাড়েন, মৃতের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অশ্রু প্রেরণ করেন, আবার চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া যান। কমলা কেবলমাত্র অর্থহীন

দৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন কিছুই ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারে না। একমাত্র এই বিভীষিকার ছায়া সেই শূন্য তলে নগ্ন প্রেতের মত কেবল নাচিয়া নাচিয়া বলিয়া বেড়ায় যে, তাহার সব গিয়াছে।

অথচ কেন গেল? কি করিয়া গেল? ইহারও খুব স্পষ্ট একটা আভাষ তাহার অনুভূতির মধ্যে জাগ্রত নাই। মনের মধ্যে যখন বল থাকে, তখন মানুষের বিচার-শক্তি সজাগ আছে বুঝা যায়। কিন্তু সেইটার অভাবেই সকল ভীরুতা জড় হইয়া মানুষের মনকে ভূতগ্রস্ত করিয়া ফেলে। তখন যেন কি একটা আবছায়ার মত সঙ্গ লইয়া ঘুরিতেছে, এমনি ধারণায় গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে, কিন্তু পিছনে ফিরিয়া সন্দেহ মিটাইবার সাহসটুকুও থাকে না।

সেদিন ডাক্তার গৃহিণী আসিলে সে বলিল, "আমায় নিয়ে কি করবেন?"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এই প্রথম তাহার মুখে এতগুলা শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনিলেন এবং সেই সঙ্গে তাহাকে নিজের জন্য ভাবিতে দেখিয়া মনে মনে একটু আশ্বস্তও হইলেন। তিনি কহিলেন, "কেন মা, আমাদের মা হয়ে চিরদিন এইখানে থাকবে না?"

কমলা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

"থাকবে না? বল, কোথা যাবে? সেইখানেই আমরা রেখে আসব।"

কোথায় যাইবে? এ বিশাল বিশ্ব সাম্রাজ্যে তাহার এতটুকু

স্থানই বা কোথায় ? কোথায় সে যাইবে ? বহুক্ষণ পরে মৃদু স্বরে সংশয়জড়িত কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "কাশী।"

"কাশী !" তা বেশ। তাই যাবেন। সেখানে কে আছেন, মা ?" উত্তর না পাইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, "আমার দাদা মশাই থাকেন বুঝি ? তাঁর নাম ? বাসা জান ত ?" কমলা এবার একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "জানি।"

সেই ঘর। ঘরে কম্বলাসনে পুস্তক-বেষ্টনী মধ্যে সেই গৌর-কান্তি সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি সে দিনও সেইরূপ অধ্যাপনা-নিরত। কমলার জীবনে ষড়ঋতু সঞ্চরণ করিয়া গিয়াছে, স্থিতির পর প্রলয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই পৃথিবীর বাহিরে শিব-ত্রিশূলস্থ কাশীধামে কি কালের প্রবেশাধিকার নাই ? ডাক্তার বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কমলা দ্বারের বাহিরে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

অনাদি অনন্ত, এবং অনাদি সান্ত, ব্রহ্ম ও জীব, চৈতন্য স্বরূপ ও মায়ার বিষয়ে কথা হইতেছিল। ডাক্তার একপাশে বসিয়া থাকিয়া অবসরক্রমে কহিলেন, "আমি আপনার পুত্র স্বর্গীয় ডেপুটি বাবুর স্ত্রীকে আনিয়াছি।" ছাত্রটি চলিয়া গেল। সার্ব্বভৌম মহাশয় চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার পুত্র! শচী! স্বর্গীয় সে ? হিসাবকারী চিত্রগুপ্ত কি অন্ধ হইয়া গিয়াছে! না, ইহারা স্বর্গের অর্থ জানে না ?

ডাক্তার বাবু ধীরভাবে শোকপূর্ণ স্বরে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন, বলিতে বলিতে একবার উঠিয়া দ্বারের নিকট-বর্ত্তিনী কমলার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "ভিতরে এসো মা।"

কমলা কম্পিত চরণে প্রবেশ করিয়া অনতিদূরে বসিয়া পড়িল

প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে তাহার মনে রহিল না। দুরন্ত পূর্ব্বস্মৃতি তরঙ্গস্ফীত সমুদ্র তরঙ্গের-ন্যায় তাহার মূর্চ্ছিত হৃদয়বেলার উপর মুহুর্মুহু আঘাত করিতেছিল। প্রলয়াবসানের পর নব সৃষ্টির উন্মেষে উল্কাপিণ্ড সকলের প্রথম বিশৃঙ্খল বিত্রস্ত জাগরণের ন্যায় কোথা হইতে কি একটা রুদ্র তাণ্ডব জাগিয়া উঠিয়াছে! গৃহ স্তব্ধ গম্ভীর। গভীর নিস্তব্ধ গৃহে কেবলমাত্র বাতাসের অতি মৃদু বিলাপপূর্ণ নিশ্বাসমাত্র শুনা যাইতেছিল! কমলা অধোমুখে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া আছে। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শান্ত ললাটে গভীর চিন্তারেখা দেদীপ্যমান। ডাক্তার বাবু কি বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে, তিনি কহিলেন, "আপনাকে আর কি বলব! জীবনদাতা পিতা স্বর্গে গেছেন, মাকে এখানে রেখে গেলাম, গৃহ আমার শ্মশান হয়ে গেছে। এ হতভাগ্যের জন্যই মায়ের আজ এই অবস্থা, এ কথা এ-জন্মে ভুলতে পারবো না। প্রণাম। প্রণাম করি মা! অপরাধী ছেলে তবে বিদায় নিলে।"

ডাক্তার চলিয়া গেল। শোকের ছায়া এই কয়টা কথায় যেন সে নিবিড় করিয়া দিয়া গেল। তাহার পদশব্দ অস্ফুট মর্ম্মযাতনার বুকফাটা ক্রন্দনের মত মুহূর্ত্ত-কাল ঘরের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়া রহিল।

আবার কতক্ষণ চলিয়া গেল। সহসা কমলা শুনিল, কি অভয় মন্ত্রই সে শুনিল, "কমলা, কাছে এস। বড় দুঃখ পেয়েছ মা!" কমলার মাথাটা নিঃশব্দে সেই পা দুইখানার উপর নামিয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল। এমন একটি স্নেহের স্বর এখনও

তাহার শুনিবার ছিল। তাহার মুখ দিয়া আকুল মর্ম্মযাতনায় বিলাপধ্বনি বাহির হইল, "আমি খুন করে এসেছি তাঁকে, আমি খুন করেছি, খুনী আমি,—"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি ধীরে তাহার মাথার রাশীকৃত রুক্ষ চুলের উপর হাত রাখিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "না। তুমি তাকে রক্ষা করেছ! নরকের দ্বার হতে স্বর্গের দ্বারে পোঁছে দিয়েছে। একে হত্যা বলো না।"

"আপনি বল্‌চেন?" কমলা বড় আশ্বাসে সবেগে উঠিয়া বসিল। এ কি! সৌম্য সবল মূর্ত্তি দুর্ব্বল রুগ্ন বৃদ্ধের রূপে যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! মুখে চোখে সেই শান্তি, সেই দীপ্তি, তথাপি কি বিষন্ন সে মুখ!

"হ্যাঁ, আমি বলচি মা, তুমি তার ভাল করেচ। যে জীবনের পরিণামে অবনতি, হয় ত দুটো জীবনেরই ক্রমিক অধঃপতন, তার শেষ যদি এই রকম ত্যাগের মধ্য দিয়েই ঘটে, সে কি ভাল নয়?"

কমলা আবার তাঁহার পা দুই খানির উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা, আমার কি হবে?"

"তোমার ভাল হবে মা আমার! এস তুমি আমার কাছে এস। সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত পিতার দ্বারা যদি কিছু হয়, দেখি।"

৫৭

"আমার কি ভাল হবার কিছু আছে?" এ কথা কমলা মুখ ফুটিয়া বলিল না, কিন্তু দিনে রাত্রে এই একই কাতর প্রশ্ন তাহার

মনটাকে ঘিরিয়া বাজিতে লাগিল। যাহার আশা করিবার কিছুই নাই, তাহার আবার ভাল কি হইবে? তথাপি মন যেন আরও কি আশা করিতে চাহিতেছিল। তীব্র দুঃখের মধ্যেও বারেকের জন্য মন যেন বলিতেছিল, "তোমার ভাল হইবে। উনি যখন বলিয়াছেন, তখন ভাল হইবেই। উনি বেদজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, উঁহার কথা কি মিথ্যা হয়?"

তাহার উপর এতদিন পরে সে আবার একটা কাজও পাইয়াছে। সে যখন দেখিল, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেই প্রশান্ত দৃষ্টি ও সহাস্য মুখ তেমন থাকিলেও সে অটুট স্বাস্থ্য আর নাই। জরা অতি প্রবল বেগেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তখন সে নিজের জন্য ভীত হইল। এমনই ভাঙ্গা কপাল লইয়া সে এই জগতে আসিয়াছে যে, আশ্রয়টা সে অবলম্বন করিতে যায়, তাহাই তাহার হস্তস্পর্শে খসিয়া পড়ে। এ আশ্রয়হারা হইলে তাহার মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অথচ এখন এই মৃত্যুর মত বিভীষিকা তাহার পক্ষে আর কিছুই নয়। এই পৃথিবীতে বরং শতবর্ষ অন্ধ খঞ্জ হইয়া পড়িয়া থাকে সেও শ্রেয়ঃ, তথাপি মৃত্যু তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, এ অনিশ্চিততার মধ্যে ডুবিতে তাহার সাহস হয় না। হায়, এত বড় অভিশপ্ত জীবন লইয়াও কেহ জগতে জন্মগ্রহণ করে?

মধ্য রাত্রি। জ্যোৎস্নালোকে জন-মর্দ্দিত রাজপথ বিশ্বনাথের কণ্ঠভূষণ বিশ্রামশীল সুবৃহৎ অজগরের ন্যায় নিঃসাড়া পড়িয়া আছে। ওদিকে অন্নপূর্ণা মাতার রজতমেখলাসন্নিভ শুভ্র বারিরাশি জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তীরস্থ মন্দির, হর্ম্ম্যমালা

তদপেক্ষা সুষমাময়ী। কমলা ছাদে বসিয়াছিল! তখন চরাচর নিদ্রামগ্ন, কেবল বীতনিদ্রা প্রকৃতি, তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের ডালি সাজাইয়া বিশ্বনাথের চরণ-প্রান্তে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। দূরে অদূরে, ইতস্ততঃ কোথাও মন্দিরের উচ্চ চূড়া, কোথাও মসজিদের উচ্চ গম্বুজ, কোথাও সমুন্নত প্রাসাদ চূড়া স্ফুট জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত হইতে হইতে শত পৌরাণিক ঐতিহাসিক যুগের সাক্ষ্য দিতেছে। পরপারে ঘনবিন্যস্ত ধূসর বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে রাজদুর্গ রামনগরের আলোক-মালা প্রকাশ পাইতেছিল।

বহুক্ষণ কমলা অগণ্য নক্ষত্র-খচিত অসীমের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহারা প্রতিদিনকার মতই অবোধ্য! দৃষ্টি নামাইয়া সম্মুখে সলিল-রেখার দিকে চাহিয়া দেখিল, উন্মাদনা-হীন স্থির লক্ষ্যে সেই এক পথেই তাহা চিরপ্রবহমাণ। সে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "আমার মনে অমনই একনিষ্ঠা কেন থাকতে পেলে না?"

মুহূর্ত্তে সে একবার উত্তর অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে কে উত্তর দিলেন, "ক্ষুদ্র কামনা সেই এক পারাবারে ডুবাইয়া দাও; একনিষ্ঠ হবে। কেন হবে না!" এ কি দৈববাণী! কমলার দুর্ব্বল দেহ-মন বিস্ময়-পুলকে অকস্মাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া ঈষদুচ্চকণ্ঠে কহিল "কে সে এক? বলে দাও, ওগো, বলে দাও। আর এ সন্দেহ সহ্য হয় না। আমায় বল, আমি ইহ জন্মের সকল সম্বন্ধ কেমন করে মুছে ফেলব? আমার কি হবে?

জলেও যেমন স্থলেও তেমনি চন্দ্রছায়া থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সেই কম্পিত আলোকে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার

নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রে তিনি অধিকাংশ কাল ছাদেই কাটান, কমলা তাহা জানিত না, অথবা সে কথা তাহার মনে পড়ে নাই। তিনি কহিলেন, "মা কমলা! তোমার মনের সন্দেহ আমি জানি। যদি নিষ্ঠা দান করতে পার, তবে ক্ষুদ্র নশ্বর পদার্থের উপর এ ঐকান্তিকতার অপব্যয় কেন মা? যাঁহাকে পাইলে পাইবার কিছু বাকি থাকে না, যাঁহাকে একবার পাইলে আর হারাইবার ভয় নাই, যদি যথার্থ কিছু পাইতে চাও, কিছু দিতে পার, তবে তাঁকেই কেন চাও না, তাঁরি পায়ে দাও না মা!"

কমলা সেই হৈম জ্যোৎস্নায় তাঁহার পানে চাহিল। সেই সৌম্য শান্তমূর্ত্তি দুঃখীর দুঃখ-হরণ অশরণের শরণ দয়ালরূপ! যে সন্দেহে সংশয়ে তাহার পীড়িত চিত্ত কঠিন শীতল হিমশিলায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা যেন এই মুখের আদেশ-বাণী গলাইয়া দিল। সে কথা কহিল না, নীরবে দূরে সেই জ্যোৎস্না-জাল-জড়িত গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিল। ঐ সুশীতল পবিত্র সলিল কাহার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে? উর্দ্ধে চাহিল, সচন্দ্র তারকাদল নীলাম্বরে চিরহাস্যময়! সেই বা কাহার প্রেমে? এই দৃশ্য অদৃশ্য—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ছোট বড় জীবন সেই একজনের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া বাঁচিয়া আছে। কে বলে, তিনি নাই? তিনি আছেন—তিনি আছেন নই কি! ফুলের কলিটি যেমন উষার মৃত বাতাসে অত্যন্ত ধীরে ফুটিয়া উঠে, তেমনি করিয়া তাহার অন্ধকার হৃদয়-মধ্য হইতে একটি ক্ষীণ আলোক-রেখা সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে ডাকিল, "বাবা! আমি কিছু জানি না, আমায়

শেখান। কেমন করে ডাকতে হয় ভুলে গেছি। নিষ্ঠুর পাষাণ বলে, অবিচারক বলে তাঁকে ডাকাই ছেড়ে ছিলাম। তিনি কি সে পাপ ক্ষমা করবেন?"

"ক্ষমা করবেন না? তিনি যে ক্ষমাময়। ভুল, পাপ সবই তিনি ক্ষমা করে থাকেন। ক্ষমা করাই তাঁর ধর্ম্ম! শুধু ডাকতে হবে, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে ডাকতে হবে।"

"তিনি সবাইকে ক্ষমা করেন? আমিও ওঁকে ক্ষমা করেছি"

সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহার উদার দৃষ্টি সেই রজত জ্যোৎস্না-মণ্ডিতা সন্ন্যাসিনীর প্রতি স্থাপন করিলেন, কহিলেন, "ভালই করিয়াছ, বন্ধন-ভয় ঘুচিয়াছে।" কমলা দুই হাতে তাঁহার পা-দুইখানি জড়াইয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল, কহিল, "আপনার ক্ষমা চেয়ে গেছেন—আপনিও ক্ষমা করবেন কি?"

"আমি—আমার মনে ত তার প্রতি এতটুকু ক্রোধ নেই। জগতে কারও উপর ত কখনও আমার ক্রোধ আসেনি। তবে সন্তানের পাপে পিতারও অংশ আছে,—সেই আত্মগ্লানি মাত্র। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

কমলা আর কথা কহিল না। এক নিমেষে এই সুপ্ত যামিনীর মধ্যযামে আপনা ভুলিয়া সে আজ যাহা বলিবার, যাহা জানিবার, সব বলিয়া, সব জানিয়া লইয়াছে। আর বলার বা শোনার কিছু বাকি নাই। এখন শুধু কঠোর তপস্যায় নিজেকে দগ্ধ করিয়া সিদ্ধি লাভ। তারপর মরণে শান্তির আশা! এত বড় আশা আর যে কিছুই নাই। সে পলকহীন নেত্রে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া গড়া মূর্ত্তির মত খদ্যোতিকা-ঝলমলায়মান পরপারের

অন্ধকার তরুশ্রেণীর পানে চাহিয়া রহিল। গভীর হতাশার পর নূতন আশার উন্মেষে মনের মধ্যেও শত শত নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। "যাঁকে পেলে আর কারুকে পেতে হয় না, সেই তাঁকে পাবার কামনা ভিন্ন অন্য সকল বাসনা তাঁরই চরণে নিবেদন করে দিলাম। হে বিশ্বনাথ! তুমি গ্রহণ করো!"

৫৮

ত্রিপাদগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণে লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল।

রাজপথে কেবলই নরমুণ্ডের সারি। কমলা অসিঘাটে স্নান করিতে গিয়া অকস্মাৎ পাশবদ্ধা কুরঙ্গীর মত অস্থির হইয়া ফিরিয়া আসিল। শঙ্কিত ত্রস্ত হরিণীর মত সে প্রায় ছুটিয়া আসিয়া দুর্গাবাড়ীর গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। ধ্যান, জপ, মন্ত্র, তন্ত্র এক মুহূর্ত্তে যেন সকলই কেমন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল—এমনই অপ্রত্যাশিত, অতর্কিত এ আঘাত!

দুর্গামন্দিরে আজ মানুষ নাই, কেবল বানরের রাজত্ব। সে ঘুরিয়া পিছনের অশ্বথ-তলাটায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। আকস্মিক উত্তেজনায় একটা কাজ সে করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণে দারুণ একটা অবসাদে সর্ব্ব শরীর মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে। একবার মনে হইল, সেই মানব-তরঙ্গের মাঝখান হইতে আজ আর মাথাটাকে টানিয়া না তুলিলেই ত চুকিয়া যাইত! সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, এই যে মহান তেজোরাশি, জগতের প্রাণস্বরূপ সূর্য্য, ইঁহার শক্তিও ক্ষণেকের জন্য প্রতিহত হইয়া থাকে, কিছুই ত বাধাহীন নয়, তবেআমি কতটুকু!

এই সময় সহসা সে শিহরিয়া শুনিল, কে যেন তাহার পশ্চাতে বলিয়া উঠিল, "এ কি!"

কমলা মুখ ফিরাইল। দুর্গে! এ কি দৃশ্য আবার দেখাইলে? গঙ্গাতীরে তবে সে স্বপ্ন নয়? সত্যই সে তবে এখানে আসিয়াছে?

নিশ্চলপ্রায় চরণ বহু চেষ্টায় উঠাইয়া স্তম্ভিত মণীশ ঈষৎ অগ্রসর হইয়া সেই শুভ্রবসনা বিধবার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষণেক পরে বিস্ময়মথিত মৃদু স্বরে কহিল, "তুমি এখানে,—এ বেশে,—কমলা!"

কমলা উঠিয়া ছুটিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অবসন্ন শরীর মন তাহাতেও সায় দিল না। অনেকক্ষণ পরে মণীশ আবার তেমনি সন্দেহ-বিস্ময়ে মৃদুতর কণ্ঠে কহিল, "চিনতে পার ছা না; কমলা? আমি মণীশ! তোমার এ বেশ কেন?"

মণীশ তাহাকে এত সহজেই সম্বোধন করিতে পারিল! শচীকান্তর স্ত্রী বলিয়াই কি এ আত্মীয়-ভাব! সীসা গলিয়া অঙ্গে পড়িলে অসহ্য জ্বালায় দেহ যেমন জ্বলিয়া উঠে, নিজেরই অকস্মাৎ-পতিত অশ্রুবিন্দুতে তাহার কোমল গণ্ড তেমনই জ্বালা করিয়া উঠিল। সে বিন্দু দুইটি দ্রষ্টার চক্ষে অদৃশ্য রহিল না। কি ভাবিয়া লইয়া সে কহিল, "বুঝেছি, সে নাই। খবরের কাগজে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শচীকান্তর অসাধারণ আত্মোৎসর্গের কাহিনী পড়েছিলাম। বিশ্বাস করি নি যে, সেই সে;—আমার বন্ধু, চিরসুহৃদ, চিরসখা সে আর নাই—চলে গেছে!"

মণীশের কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার শোকপূর্ণ

কণ্ঠ কমলার বক্ষে অশনি প্রহার করিল। সে বারেক বিহ্বল নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিল! কে এ কথা বলিতেছে? বন্ধু! চির-সুহৃদ্! বন্ধুপ্রেমে একান্ত বিশ্বাসঘাতক -সেই তার বন্ধু? তাঁহার সুহৃদ? ওরে অভাগিনী কমলা! কাহার প্রতীক্ষায় তুই বসিয়াছিল? আজন্ত কার স্মৃতি তোর সত্য সঙ্কল্পে পদে পদে বাধা দিতেছে? সে কি এই তোর প্রতিআকর্ষণ হীন, বন্ধুপ্রেমিক মণীশ! দেখা হইয়াছে—বুঝি ভালই হইল!

বহুক্ষণ পরে মণীশ ব্যথাকাতর দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাহিয়া পরে বলিল, "তুমি হয়ত এখন আশ্রয়হীনা? কোথায় কার কাছে আছ? খুড়িমা এখানে, এসেছেন, তাঁর কাছে যাবে কি? আমরা এই কতক্ষণ মাত্র এখানে এসে পৌঁচেছি। আমি আজ পিতৃহীন, কাকাবাবু, আর এ জগতে নাই। খুড়িমা তোমায় পেলে সুখী হবেন।" কমলা এ কথা শুনিয়া বারেকের জন্য সকল বাধা ভুলিয়া সাগ্রহে মাথা তুলিল, তারপর সাশ্রুনেত্রে ঘাড় নাড়িল, কহিল, "না।"

"খুড়িমা বড় কাতর, তাঁর কাছে যাবে না?" এবার অশ্রুধারাপরিপ্লুত বেদনা-কাতর মুখ তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে ক্ষীণস্বরে সে কহিল, "সেখানে আমার স্থান নাই।"

"কেন, কমলা?" মানুষের কণ্ঠে এমন যন্ত্রণাপূর্ণ স্বর বোধ হয় কমলা আর পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই, কিন্তু তাহার মন তখন প্রতিঘাতে নিষ্ঠুর কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, নিজের প্রতি বা অন্যের উপর একবিন্দু মমতাও আর তাহার চিত্তের কোন প্রান্তে সঞ্চিত

ছিল না। সে মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের ন্যায় প্রাণপণ বলে তাই চক্ষুলজ্জা না রাখিয়াই বলিয়া ফেলিল, "সেখানে যে আপনি থাকবেন!"

মণীশকে কে যেন অগ্নিতপ্ত শেলে বিঁধিল। এত বড় অপমানের কথা তাহার মুখের উপর উচ্চারিত হইতে পারে, এ ধারণা তাহার কখনও ছিল না। সে মুহূর্ত্তকাল আর্ত্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস লইবার শক্তি ফিরিয়া আসিলে ক্ষীণ স্বরে কহিল,—"তবে নাহয় আমি থাকব না। তুমি গুরুদেবের কাছে যেও, তুলসী ঘাটের সেই বাড়ীতে, খুড়িমা সেই বাড়ীতে আছেন। আমি এখনি ফিরে বিদায় নেব, তুমি সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই আমি কাশী ছেড়ে চলে যাব।" মণীশ একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে মৃতের মুখের চেয়েও বোধ হয় অধিকতর বিবর্ণ। সে যে আজ কতখানি দিল, কমলা হয় ত তাহা বুঝিতেও পারিল না। জগতের একমাত্র সুখ খুড়িমার কোল শোকজর্জ্জরিতা করুণাময়ীর সেবার ভার, গুরুর সঙ্গ, এক নিমিষে জীবন হইতে সমস্ত সুখের অংশ নিঙড়াইয়া ফেলিয়া সে তাহাকে দান করিল। নিজের জন্য রাখিল শুধু সুখহীন আশাহীন—নিঃস্বত্ব শুষ্ক অংশটুকু। কিন্তু কমলার তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না। মর্ম্মবিদারী যন্ত্রণানলে তাহার সারা চিত্ত তখন ধূ ধূ করিয়া জলিয়া অঙ্গারে পরিণত হইতেছিল। সে তখন সমুদয় মানবীয় দুর্ব্বলতা-ভস্মকারী মহানলকে প্রাণপণ ফুৎকারে জ্বালিয়া রাখিয়া নিজেকে দাহ করিতেই নিযুক্ত ছিল। আর কিছুই ভাবে নাই।

মণীশ কহিল,—"তবে যাই কমলা। এ জগতে আর বোধ হয় দেখা হবে না।"

"শুধু এ জগতেই না, অন্য জগতের কোথাও যেন আর কখন দেখা না হয়, এই একমাত্র আশীর্ব্বাদ করুন!" মণীশ তড়িৎস্পৃষ্টের মত সর্ব্বাঙ্গে—দেহে মনে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ ক্রমেই অধিকতর অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। এই মুহূর্ত্ত তাহা যেন বিষ জর্জ্জরিত মুখের মৃত্যু নীলিমার ন্যায় কালো দেখাইল। "কোথায়ও না দেখা হয়?—যাই কমলা,—ক্ষমা করো—মুহূর্ত্তের এ দুর্ব্বলতা টুকু ক্ষমা করো—"স্খলিত জড়িত মত্ত চরণে মণীশ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন কমলা উঠিয়া মন্দিরের আড়ালে পাষাণে লুটাইয়া পড়িয়া সকাতরে ডাকিল,—"আমার মনে বল দাও। হে ঠাকুর, হে বিশ্বনাথ, আমায় ধ্বংস করো না। যে পথ দেখিয়েছ, যেন সেই আমি থাকতে পারি।"

৫৯

সম্মুখে পার্শ্বে পুস্তকের রাশি সজ্জিত, সুখাসনে সমাসীন সত্য পাঠ নিরত। মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া রাজধানীর বিচিত্র দৃশ্য চলন্ত চিত্রের ন্যায় ক্ষণ-পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। মহামূল্য গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত, আসনে বসনে আধারে ভিত্তিতলে প্রাচীরে, গৃহের সর্ব্বত্র সৌখীনতা, সুরুচি ও ধনশালিতা ব্যক্ত হইতেছে, কিন্তু পাঠশীল ছাত্রের এ সব দিকে লক্ষমাত্র নাই। গভীর মনোযোগের সহিত সে পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। যেন কোন ঋষি কুমার স্বধ্যায়তপে

নিযুক্ত। পিছন হইতে একটি অতি সুন্দর তরুণ মুখ হাসির আলোয় মাখামাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিল, কানের কাছে সেই হাসি-ভরা গোলাপী অধর দুইখানা নামিয়া আসিল, কিন্তু তাহার কৌতুক মধ্য-পথে বাধা প্রাপ্ত হইল। "ছি গৌরি—" বলিয়া সত্য মুখ তুলিল।

"ছি কিসে?" গৌরী কিন্তু ঈষৎ দমিয়া গিয়াছিল।

"পড়ার সময় কি বাধা দেয়?" বলিয়াই সত্য আবার পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

"ভারী ত পড়া! কত পড়বে?"

"দাদা যাবার দিন কি বলে গেছেন, মনে নেই? পড়লে মানুষ হবো,—হলে দাদা সুখী হবেন। তুমি কি চাও না, দাদা সুখী হন?"

গৌরীর হাসি-খুসী মিলাইয়া গেল। সে কহিল,—"হই।"

"তবে কেন বাধা দাও?"

"আর দেব না। তুমি দাদাকে বিয়ে কর্‌তে বলো না, কেন"?

সত্য এবার তাহার দিকে ফিরিল, কহিল,—"তাঁকে আমি কি বলবো গৌরি? কি দুঃখে তিনি আজীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিলেন, তা কি জানি নে যে, বল্‌তে যাবো? জলের দাগ ত নয় যে মুছে যাবে, এ সোনার খোদাই যে।" সত্যর কেদারার হাতটার উপর গৌরী বসিল, কহিল,—"তাঁর জন্য আমার মধ্যে মধ্যে যেন কান্না পায়। কমলা যদি এখন থাকতেন,—কত আহ্লাদ হত, বল দেখি?"

সত্যেন্দ্র সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কহিল,—"তা আর

বল্‌তে, গৌরি! বাবা কেবল সেই দুঃখ বুকে করেই যে চলে গেলেন। মৃত্যুকালেও দাদার মাথায় হাত দিয়ে বলে গেলেন, তোমায় শুধু কর্ম্ম দিয়ে গেলাম, যাদু আমার! এতটুকু বিশ্রাম দিতে পারলাম না।”

সত্যর দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। সে আবার গভীর নিশ্বাস ফেলিল।

“ছি, তুমি এত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলো না। আমার শুতে বড় কষ্ট হয়—” এই সময়ে বাহিরে কে ডাকিল,—“সতু—”

“এ কি, দাদা! এমন সময় হঠাৎ ফিরে এলে যে!”

সত্য ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। গৌরী সলজ্জ মুখে দ্বারান্তর-পথে ছুটিয়াই পলাইল। ভাসুরকে সে যে খুব লজ্জা করে, তা নয়, পাছে তিনি এ সময় সত্যর পাঠগৃহে তাহাকে দেখিয়া মনে করেন, সে তাঁহার ভাইয়ের পড়া-শুনায় ব্যাঘাত ঘটায়, অতএব ভাইটিকে ইহার কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া যাই! এই একটা মস্ত ভয় ছিল।

মণীশের আকস্মিক প্রত্যাগমনে বিস্মিত নন্দকিশোর তাহার কুশল বার্ত্তা লইতে আসিলেন। সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, খুড়িমা গুরু-গৃহে কতকটা শান্তিতেই থাকিবেন, ইহা বুঝিয়াই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানকার নৈশ বিদ্যালয়গুলি পাছে তাহার অভাব বোধ করে,—তা-ভিন্ন সতুকে ছাড়িয়া অতটা দূরে থাকা। নন্দকিশোর ইহার ভিতরকার তথ্য জানেন না, খুসী হইয়া চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে শিবনারায়ণ তাঁহাকে ডাকিয়া জানাইয়া ছিলেন

যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমুদয় সম্পত্তি তিনি মণীশকে দান করিতেছেন। সে ইহা ইচ্ছানুরূপ লোকহিতকর কার্য্যাদিতে ব্যয় করিতে পারিবে। ইহাতে তাঁহার বলিবার কিছু আছে কি না? নন্দকিশোর প্রসন্ন চিত্তে উত্তর দিয়াছিলেন,—"কিছু না।" তিনিও ইতিমধ্যে তাঁহার বিপুল অর্থ, কন্যা জামাতা উভয়কে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়া উইল-পত্র লিখিয়াছিলেন। সত্যর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। শিবনারায়ণ কহিলেন,—"তাহা জানি বলিয়াই আমি তাহার অংশ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। মণীশের সন্তান সাধারণ লোকেই ইহার উপ-স্বত্ব ভোগ করিয়া সতূর বংশের কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে।"

করুণাময়ী সংসারে বীতস্পৃহা হইয়া যখন কাশী চলিয়া গেলেন, তখন নন্দকিশোর নিজের স্বার্থ ভুলিয়া গৌরীকে তাঁহার সঙ্গে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পতিহীনা সর্ব্বত্যাগিনী সতী পুত্র পুত্র-বধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অবিচল কণ্ঠে কহিয়া গেলেন,—"সতি! তোরা আর আমায় জড়াতে চাসনে। তোরা সুখে ঘর কর্, তা হলেই আমি সুখী হব। এ শুধু আমাদের সন্ন্যাসী মায়ে-পোয়ের ঘর বাঁধা। তোরা কোথা যাবি?"

সকলেই বুঝিয়াছিল, সাধ্বী করুণাময়ীর হৃদয় তাঁহার মহানুভব স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছে। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যপূত দেহ-খানা যে কয়দিন এ পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ করে, শান্তির স্থলেই তাহা আশ্রয় পাক্। সত্য বুক ফাটিয়া কাঁদিল, বাধা দিল না। সে জানিত, তাহার দাদাকে লইয়া মা আরামেই থাকিবেন।

নন্দকিশোর চলিয়া গেলে মণীশ চাহিয়া দেখিল, সত্য তাহার

মুখের দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া আছে। মুহূর্ত্তে তাহার কর্ণমূল হইতে ললাট অবধি লাল হইয়া উঠিল। সত্য আর একটু কাছে আসিয়া ডাকিল, "দাদা!"

"সতি!—" মণীশ মুখ নত করিল।

"দাদা, কি হয়েছে? মা, মা আছেন ত?"

নত মস্তকেই মণীশ বলিল, "হ্যাঁ সতি, মা ভালই আছেন।"

উদ্বিগ্ন চক্ষে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে সত্য কহিয়া উঠিল, "তবে কি হয়েচে, আমায় বলবে না, দাদা? নিশ্চয় কিছু একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটেচে, যাতে তোমার তেমন মুখকেও এ রকম করে দিতে পারে। দাদা, আমায় বলবে না?"

মণীশ সহসা মুখ তুলিল, কহিল, "তোকে কেন বৃথা কষ্ট দেব, সতু? শুধু জীবনের মধ্যে এই একটা দিন আমায় মাপ কর ভাই, দ্বিতীয় বার আর কখনও তোর দাদাকে এমন দেখতে হবে না—জানিস্।"

"দাদা, আমি কি তোমার দুঃখের সঙ্গী নই? শুধু তুমি আমায় দেবে, কিছুই নেবে না? আমায়ও লুকোবে?"

মণীশ তাহার ব্যথা কাতর মুখখানা কম্পিত হস্তে বুকে টানিয়া লইল, ততোধিক কম্পিত স্বরে কহিল, "তবে শোন,–" তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, গলা ঝাড়িয়া সে বলিল, আমার এ জগতের শেষ সুখ যা ছিল, সব আজ তাকে দিয়ে এসেছি। যে কোলে একা আমারই স্থান ছিল,—তোরও যেখানে জায়গা হয়নি, সেখানে আমি আর যাব না সতি, সেখান থেকে আমার চিরনির্ব্বাসন হয়ে গেছে।"

সত্যেন্দ্র অনেকক্ষণ কিছু বুঝিল না, তাই নির্ব্বাক্‌ হইয়া সেই যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে একটা সম্ভাবনার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে কহিল, "কাকে? তিনি—বৌদি, কমলা—কি সেখানে?"

"হাঁ, সে বিধবা, অনাথা। জানি না, কোথায় সে আছে,—বোধ হয়, নিরাশ্রয়া।"

"দাদা!"

অকস্মাৎ নিবিড় অন্ধকারে যেন একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্রর মুখ আশায় সন্দেহে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "একটা কথা বলবো দাদা,—বল,—রাগ করবে না?"

সর্পদষ্টের মত মণীশ এ কথায় যেন চমকিয়া উঠিল। বাধা দিয়া আকুল স্বরে সে কহিল, "না, না, সতু! না, না, কিছু বলতে চেষ্টা করো না। তুমি কি বলবে, তা কি আমি বুঝি নি? না, না, তাকে আমি বলে এসেছি, এ জন্মে আর কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। এ জন্মের সব দেনা-পাওনা আজ মিটিয়ে দিয়ে এসেছি। সে আশীর্ব্বাদ চেয়েছিল, যেন অনন্ত কালেও আর দেখা না হয়। সে আশীর্ব্বাদ কিন্তু তাকে আমি করতে পারিনি। আর একবার তার সঙ্গে দেখা হবে না, এ কথা আমার মুখ থেকে বেরোয়নি। আমি জানি, আবার আমাদের দেখা হবে, তাঁর পাদপদ্মে আবার আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত, হবো—এ আশা আমার এখনও আছে। সেখানকার সম্বন্ধ ত এক জন্মে ফুরায়ও এবং সেখানে কোন পার্থিব সম্বন্ধেরও প্রয়োজন হয় না।

সমাপ্ত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

মন্ত্রশক্তি (চতুর্থ সংস্করন)	...	২৲
পোষ্যপুত্র ঐ	...	২॥০
মহানিশা ঐ	...	২৲
জ্যোতিহারা (দ্বিতীয় সংস্করন)	...	২৲
মা ... ঐ	...	৩৲
রামগড়	...	২৲
পথহারা	...	২॥৵০
চক্র (নূতন উপন্যাস)	...	২॥০
উল্কা	...	১॥০
চিত্রদীপ	...	১৲
রাঙ্গাশাঁখা	...	১৲
মধুমল্লী	...	॥০
বিদ্যারণ্য (নাটক)	...	১৲
কুমারিল ভট্ট ঐ		১৲
সোণার খনি ১ম	...	১৲
সোণার খনি ২য়	...	১৲

কলিকাতার সমুদয় প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও ৪৪নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্, পোঃ বিডন স্কোয়ার কলিকাতা এডুকেশন গেজেট অফিসে পাওয়া যায়।

৺ ইন্দিরাদেবী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

স্পর্শমনি	(দ্বিতীয় সংস্করন)	...	২॥০
প্রত্যাবর্ত্তন	নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস	...	২॥০
সৌধ রহস্য	ঐ	...	১৲
পরাজিতা	ঐ	...	১৲
শ্রোতের গতি	ঐ	...	১॥০
নির্ম্মাল্য	(দ্বিতীয় সংস্করন)	...	১।০
কেতকী		...	১৲
ফুলের তোড়া		...	॥০
মাতৃহীন		...	॥০

স্পর্শমনি লেখিকার শেষ উপহার "শেষদান" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।